হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম

কাজী আবদুল ওদুদ

পরিবেশক ঃ ভারতী লাইব্রেরী
৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৭১

প্রকাশক ঃ
কাজী খুরশীদ বখ্‌ত্‌
৮বি, তারক দত্ত রোড্‌
কলিকাতা—১৯

মুদ্রাকর ঃ
কে, সরকার
নিউ ইম্‌প্রেশন
২০-এ, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
গৌরাঙ্গ পণ্ডিত

মূল্য আট টাকা

ঢাকা মুসলিম সাহিত্যসমাজের
সহকর্মীদের
স্মরণে

Hazarat Muhammad-O-Islam

By Kazi Abdul Wadud.

Price Rs. 8·00

মুখবন্ধ

অশেষ শক্তিমান আর অশেষ প্রেমিক হযরত মোহম্মদের একটি জীবনচরিত লিখবার সংকল্প করি বহু দিন পূর্বে—১৯২৮ সালে। সেই দিনেই সেটি আরম্ভও করেছিলাম। কিন্তু তাতে বাধা পড়ে। কাজ অবশ্য চলতে থাকে। তবে সেই চরিত্র-চিত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে হাত দিতে পারি ১৯৬৪ সালের শেষে। ১৯৬৪ সালের সূচনাতেও বলা যেতে পারে, কেননা, সমগ্র কোরআনের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করি সেই সময়ে—এই অনুবাদের কাজটি আমি গ্রহণ করি হযরতের চরিতকথার ভূমিকা রচনা হিসাবেই। হযরতের পত্নী হযরত আয়েশা বলেছিলেন: কোরআন হযরতের চরিত্র। —হযরতের মানস ও চরিত্র সম্বন্ধে এর চাইতে সারগর্ভ কথা আর কেউ বলতে পারেন নি।

সংকল্প গ্রহণ আর তার রূপদান এই দুয়ের মধ্যে এমন দীর্ঘ ব্যবধানের কারণ প্রস্তুতিই। প্রস্তুতি কথাটা অবশ্য ভুল বুঝবার সম্ভাবনা আছে। প্রস্তুতি বলতে বোঝা যেতে পারে হযরতের জীবনের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য আয়োজন। সেই কাজটিও লোভনীয়। কিন্তু সেটি আংশিকভাবেই আমার বিষয়। আমার সত্যকার বিষয়: একালে আমরা, অর্থাৎ প্রধানত মুসলমান সমাজের লোকেরা, কি ভাবে হযরতের দিকে তাকাব—তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝবো, একালের মানুষের সামনে যে সব চিন্তা-ভাবনা ও গুরু সমস্যা এসে পড়েছে সেসব সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা আমাদের জন্য কি নির্দেশ অথবা ইঙ্গিত বহন করে—এইসব সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা। এই ধরনের চিন্তা একালের মুসলমানদের মধ্যে স্বতঃই দেখা দিয়েছে। তবে সেসব এখনো তাদের জন্য হয় পুরাতনের দুর্বল ওকালতি, না হয় তার পাশ কাটাবার চেষ্টা। বলা বাহুল্য চিন্তার এমন কুণ্ঠিত রূপ অসার্থক রূপ। চিন্তা সার্থক রূপ নেয় যখন তা প্রকাশ পায় নতুন চেতনা ও নতুন প্রত্যয়ের রূপে। অবশ্য সার্থক নতুন খাপছাড়া নতুন নয় কখনো। তার জন্ম হয় অতীতের বিচিত্র জীবন-রস থেকেই, কিন্তু নতুন পরিস্থিতির তাগিদে,—যেমন পুরাতন গাছে নতুন পাতা ও ডাল গজায় নতুন বসন্তের তাগিদে, তা অকুণ্ঠিতভাবে নতুন আর অকুণ্ঠিতভাবে পুরাতনও।

চিন্তার সেই অনেকটা অকুণ্ঠিত পরিচয় এই বইটিতে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে পাওয়া যাবে আশা করি। তার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির হয়ত প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে' স্বভাবত মারমুখো নতুনের প্রেমপরায়ণ নতুন হতে সময় লাগে। অবশ্য নতুন প্রেমপরায়ণ হলেও সমাদর যে পাবেই এমন কথা নেই। তবে প্রেমপরায়ণ নতুন সার্থকতর নতুন, বিশেষ করে বহু-বিরুদ্ধতা-কণ্টকিত ও ব্যর্থতাময় আমাদের এই পুরাতন পৃথিবীতে, একথা হয়ত মিথ্যা নয়।

যাই হোক এই বইতে নতুনকে পাওয়া যাবে রূঢ়-আঘাত-অনিচ্ছু, বিচারবান, প্রেমপরায়ণ রূপেই। কোরআনে বলা হয়েছে: ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ; আরো বলা হয়েছে: আল্লাহ্ নিজের জন্য বিধান করেছেন করুণা; অন্য কথায় মানুষরা পরস্পরের প্রতি করুণা ও প্রেম-পূর্ণ আচরণ করবে এই তাঁর অভিপ্রেত; আরো বলা হয়েছে: প্রযত্ন কর যা ভালো তার জন্য, আর নিষেধ কর যা মন্দ। এই তিন জীবন-বর্ধক চিন্তাই আমরা শিরোধার্য করেছি। আমরা আশা করবো, যে গুরু বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি তাতে আমাদের সঙ্গে যেসব বন্ধুর মতভেদ হবার সম্ভাবনা আছে, তাঁরাও এই নির্দেশত্রয় অবশ্যপালনীয় জ্ঞান করবেন।

কোরআন, হাদিস, ইতিহাস, এই তিনেরই সাহায্য আমরা নিয়েছি—এই শ্রেণীর রচনায় যেমন সবাই নিয়ে থাকেন। কোরআন্ আল্লাহ্‌র বাণী, সেই বাণী স্বর্গীয় দূত জিব্রিল বহন করে' এনেছিল ও হযরতের অন্তরে অবতীর্ণ করেছিল একথা কোরআনে বহুবার বহুভাবে বলা হয়েছে। (এসব সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা আমরা করতে চেষ্টা করেছি)। এমন বাণী হযরত তাঁর আনুমানিক চল্লিশ বৎসর বয়স থেকে আনুমানিক ৬৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত নানা সময়ে নানা অবস্থায় লাভ করেছিলেন। সেইসব বাণী সেই সময়েই হযরতের বহু অনুবর্তী কণ্ঠস্থ করতেন —আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ—খেজুরের পাতা, পাথর, চামড়া, এসবের উপরে লিখেও রাখতেন। সেইসব যত্নে সংগৃহীত হয় ও একটি সুসম্বদ্ধ রূপ পায় প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের শাসনকালে, আর পাঠান্তর-বর্জিত একক গ্রন্থের রূপ পায় তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের শাসনকালে। সেই রূপেই কোরআন অবিকৃত আছে। কোরআনের অবিকৃততা সম্বন্ধে স্যর উইলিয়ম মুয়র বলেছেন: We have now the Koran as it was left by Muhammad.

হাদিস হচ্ছে হযরতের আলাপ আলোচনা ও উপদেশ নির্দেশ, অথবা হযরতের সম্পর্কে মুখ্যতঃ তাঁর সমসাময়িকদের উক্তি। নির্ভরযোগ্য

হাদিস সংগ্রহ করতে হাদিস-সংগ্রাহকরা কত যত্ন নিয়েছিলেন তা বোঝা যায় কত হাদিস তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি তা থেকে। স্বনামখ্যাত হাদিস-সংগ্রাহক আল-বুখারী তাঁর সময়ে প্রচলিত ছয় লক্ষ হাদিসের মধ্যে চার হাজার হাদিস নির্ভরযোগ্য জ্ঞান করেছিলেন। ইয়োরোপীয় ইসলামতত্ত্ববিদেরা 'নির্ভরযোগ্য' হাদিসেরও একটা বড় অংশ অনির্ভরযোগ্য মনে করেন। যেসব হাদিস 'বিশ্বস্ত' বলে' পরিচিত সেসবের বিশ্বস্ততাও যে নতুন করে বিচার করে' দেখবার আছে সে-সম্বন্ধে আমাদের একালের কোনো কোনো মুসলমান জীবনীকারও উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন।

অনেকটা কোরআনের মতো হাদিসও হযরতের সময় থেকেই সংগৃহীত হয়ে আসছিল, তবে তা স্থায়ী রূপ পায় আল্‌মামুন প্রমুখ আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকালে। হযরতের যুদ্ধাবলীর ইতিহাস আর তাঁর চরিত-কথাও সেই কালের কিঞ্চিৎ পূর্বে থেকে সুসংবদ্ধ রূপ পেতে থাকে। বলা বাহুল্য ইতিহাস আর চরিত-কথাও হাদিস, তবে বিশ্বস্ত হাদিসকে ইতিহাস ও চরিত-কথার চাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য জ্ঞান করা হয়।

এই তিন সূত্র সম্বন্ধেই পরে পরে আরো বহু কথা আসবে। এই তিনের মধ্যে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি কোরআনের উপরে; আর অনেকটা কাণ্ডজ্ঞানের উপরে। ইবনে ইসহাকের চরিত-কথা থেকে আমরা যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেছি, * কেন না তিনি সুপ্রাচীন, আর ইতিহাসবেত্তা হিসাবে নির্ভরযোগ্যও। আশ্‌-শাফিই, আল্‌-বুখারী তাঁর ইতিহাস-বর্ণনা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান করেছেন।

বইখানির নাম আমরা দিয়েছি "হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম"। একে ভাগ করা হয়েছে চার ভাগে: পরিবেশ ও প্রযত্ন, সংগ্রাম; বিজয়, পরিণতি। হযরতের সুপরিচিত জীবন-কথা বিবৃত করা হয়েছে এর প্রথম তিন ভাগে—অবশ্য কিছু কাটছাঁট করে'। চতুর্থ ভাগটিও ইসলামের সুপরিচিত ইতিহাসের সংক্ষেপ; তবে সেই সঙ্গে তাতে, আর প্রথম তিন খণ্ডের অন্তর্ভুক্তিতে, কিছু নতুন ভাবনাও স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছে। বলা বাহুল্য নতুন চিন্তা-ভাবনার দাবি যদি স্বীকার না করতাম তবে নতুন কালে এই বই লেখা অর্থহীন হতো।

কাজী আবদুল ওদুদ

* ইবনে ইস্‌হাকের একটি ভাল ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন A. Guillaume,-Oxford University Press.

বিঃ দ্রঃ আরবী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে একটি সহজ পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করেছি: S-ধ্বনিগুলো ব্যক্ত করেছি স-এর দ্বারা, আর Z-ধ্বনিগুলো ব্যক্ত করেছি য-এর দ্বারা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

যখন হযরতের জীবনী লিখবার সংকল্প গ্রহণ করি সেই দিনে ঢাকা জেলার বলিয়াদির জমিদার চৌধুরী কাজেমুদ্দীন আহ্‌মদ সিদ্দিকী হাদিস-আদি থেকে উপকরণ সংগ্রহের জন্য আমাকে ২৫০৲ টাকা কি তার কিছু বেশী দিয়েছিলেন। জীবনী লিখতে দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে এক সময়ে চৌধুরী সাহেবের পুত্রকে টাকাটা ফেরৎ দিতে চাই, কিন্তু তিনি ফেরৎ নেন না। চৌধুরী সাহেবের সেই সাহায্যের স্মরণে ৪০ খণ্ড "হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম" বিতরণ করা হবে।

বন্ধুবর মঈন-উদ্‌দীন হোসায়েন তাঁর নিজের সংগ্রহ থেকে মৌলানা ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের "মহাপুরুষ-চরিত" ও মৌলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁর "মোস্তফা-চরিত" ব্যবহারের জন্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করতেও তিনি সাহায্য করেছেন।

নবীন গবেষক মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ও কয়েকখানি বই দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। এঁদের দুজনকেই অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার শেষ বয়সের কয়েকখানি গ্রন্থের মধ্যে এটিরও পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন আমার কন্যাস্থানীয়া কল্যাণীয়া সন্ধ্যা। তাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কলিকাতা:
অক্টোবর, ১৯৬৫

দুর্ভাগ্যক্রমে ছাপার ভুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়নি। বড় রকমের ভুলগুলোর জন্য একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া গেল।

সূচী

প্রথম খণ্ড

পরিবেশ ও প্রযত্ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাসে হযরত মোহম্মদের পরিচয় ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক রূপে। কিন্তু ইসলামের মহাগ্রন্থ কোরআনের মতে ইসলামের অর্থ বিশ্বপাতায় আত্মসমর্পণ, আর সেই আত্মসমর্পণ হচ্ছে মানব-আত্মার শাশ্বত ধর্ম---জগৎপাতার মনোনীত ধর্ম ব্যবস্থা। এই ধর্ম সংস্থাপনের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ঐশ্বরিক প্রেরণা প্রাপ্ত বাণী-বাহকরা যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন; হযরত মোহম্মদ সেই বাণী-বাহকদের অন্যতম—এই আত্মসমর্পণ-ধর্ম তাতে এসে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে।

বলা বাহুল্য এই সব চিন্তার সঙ্গে এই গ্রন্থে নানা ভাবে আমাদের পরিচয় হবে।

আরব দেশ

এই মহা-ধর্মস্থাপয়িতার আবির্ভাব হয়েছিল আরব দেশে। সেই দেশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় হযরত মোহম্মদের প্রথম বিশিষ্ট চরিতকার মৌলানা ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে এই বর্ণনা দেন :

"আরব আসিয়া মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে স্থিত। ইহা একটি বৃহৎ উপদ্বীপ। এই দেশের উত্তরে তুরস্ক দেশ, পূর্ব্বদিকে পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সুয়েজ যোজক। ইহার পরিমাণ ফল দুই লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র বর্গ ক্রোশ, লোকসংখ্যা এক কোটি। আরব দেশে প্রকৃতির অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, এ দেশের অধিকাংশ স্থান নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময়, তরুলতা তৃণ গুল্মাদির

চিহ্নও নাই, স্থানে স্থানে বৃক্ষলতাদিশূন্য উপশৈল বিদ্যমান, প্রায় কোথাও নদ নদী নাই। দিবাভাগে প্রচণ্ড রৌদ্র হয়, তাহাতে বালুকারাশি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। একমাত্র উষ্ট্রের সাহায্যে এই ভীষণ মরুক্ষেত্র দিয়া লোক গমনাগমন করে। এখানকার বায়ু শুষ্ক, দিবাভাগে অত্যন্ত উষ্ণ থাকে, সময়ে সময়ে স্থান বিশেষে, 'সমুম' নামক প্রাণনাশক বিষাক্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। কখন কখন ঝটিকা সমুত্থিত হইয়া পর্ব্বতাকার বালুকা-রাশি উড্ডীয়মান করে। সেই বালুকাপুঞ্জের চাপে পড়িয়া জীব জন্তু মারা পড়ে। এ দেশে দিবা ভাগে যেমন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, রাত্রিতে তেমনই দুরন্ত শীত। বৃষ্টি কদাচিৎ হয়।"

এই দেশের লোকদের জীবনযাত্রা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ

"এদেশবাসীদিগের জীবন ধারণোপযোগী শস্য এ দেশে উৎপন্ন হয় না। বিদেশ হইতে বিশেষতঃ তুরস্ক দেশ হইতে পণ্য জাতের আমদানি না হইলে আরবীয় লোকের প্রাণ রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে। আরবের উপকূলভাগ বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন রমণীয়, তথায় খর্জ্জুর কমলালেবু আকরট বাদাম প্রভৃতি সুরস ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপকূল ভাগে ও অভ্যন্তরের যে যে স্থান কিঞ্চিৎ উর্ব্বরা ও বৃক্ষাদি জন্মে, তথায় লোকের বসতি। আরবীয় লোক যাযাবর, গ্রামবাসী ও নগরবাসী, এই তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। যাযাবর সম্প্রদায় মরুভূমির প্রান্ত ভাগে অথবা তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ব্বরা ভূমিখণ্ডে পটমণ্ডপে বাস করিয়া থাকে, তাহারা স্বেচ্ছানুসারে তৎসহ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইয়া বসতি করে। সেই দল বদওয়ি অর্থাৎ প্রান্তরনিবাসী বলিয়া আখ্যাত। বদওয়িগণ বহু সঙ্খ্যক ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত। সাধারণতঃ আরবেরা দীর্ঘকায়, পাটলবর্ণ, সুশ্রী ও বলবান, মুখমণ্ডল অণ্ডাকৃতি ও তাম্রবর্ণ, ললাটদেশ প্রসারিত ও উন্নত, দশনপঙ্‌ক্তি শুভ্র ও সুগঠিত, ভ্রূ ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু চঞ্চল, মগ্ন ও কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকা সরল ও মধ্যমাকার। ইহারা নির্ভয় সুবুদ্ধি চতুর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় অত্যন্ত উগ্রপ্রকৃতি তেজস্বী বীর

পুরুষ। পূর্ব্বকালে যুদ্ধবিগ্রহ লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড এই জাতির জীবনের প্রধান ব্যবসায় ছিল।"

এই রুক্ষ ও কঠিন মরুভূমির দেশে মরুদ্যানের যে শোভা ও সার্থকতা, আমরা দেখবো, সব দিক দিয়ে তাই যেন রূপ পেয়েছিল হযরত মোহম্মদের চরিত্রে ও সাধনায়।

মক্কার ঐতিহ্য

আরব দেশের মক্কা নগরে হযরতের জন্ম। এই নগর খুব প্রাচীন—সেই প্রাচীনকাল থেকেই এর খ্যাতি এর কাবা-মন্দিরের জন্য। সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের আদি ধর্মগুরু হযরত ইব্রাহিম থেকে এই এদেশের পরম্পরাগত চিন্তা ও প্রত্যয়। তাঁর কথা কোরআনে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বর্তমান কালে মেসোপোটেমিয়া নামে যে অঞ্চল পরিচিত সেই দেশে অন্যূন তিন হাজার বৎসর পূর্বে ইব্রাহিমের জন্ম হয়—এক পৌত্তলিক পরিবারে আর পৌত্তলিক পরিবেশে। অর্থাৎ তাঁকে বৈদিক ঋষিদের সমকালীন জ্ঞান করা যেতে পারে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পালয়িতা বহু দেবতা নন, একজন, এই চেতনা কেমন ভাবে তাঁর ভিতরে সঞ্চারিত হয় তার উল্লেখ কোরআনে কয়েক জায়গায় করা হয়েছে; একটি উল্লেখ এই :

> যখন রাত্রি তার (ইব্রাহিমের) উপরে আঁধার হলো সে দেখলে একটি তারা; সে বল্লে : এই আমার পালয়িতা। কিন্তু যখন তা অস্ত গেল তখন সে বল্লে : যারা অস্ত যায় তাদের আমি ভালোবাসি না।
>
> তারপর যখন সে দেখলে চন্দ্র উদিত হচ্ছে, সে বল্লে : এই আমার পালয়িতা। কিন্তু যখন তা অস্ত গেল সে বল্লে : যদি আমার পালয়িতা আমাকে পথ না দেখান তবে আমি নিঃসন্দেহে সেই দলের একজন হবো যারা বিপথগামী।

তারপর যখন সে দেখলে সূর্য উঠছে সে বল্লেঃ এই আমার পালয়িতা : এ সব চাইতে বড়। আর যখন তা অস্ত গেল, সে বল্লেঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি মুক্ত তোমরা যেসব অংশী (দেবতা) দাঁড় করাও সেসব থেকে,

নিঃসন্দেহ আমি সোজা হয়ে আমার মুখ ফিরিয়েছি তাঁর দিকে যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি বহুদেববাদীদের দলের নই। (৬ঃ ৭৭-৮০)

এই নতুন চেতনার ফলে ইব্রাহিম ও তাঁর স্বজন ও স্বদেশীয়দের মধ্যে কি ভাবে প্রবল বিরোধ দেখা দিল কোরআনে তারও বর্ণনা আছে।

এই বিরোধের ফলে ইব্রাহিম স্বদেশ ত্যাগ করে প্যালেস্টাইনে গিয়ে বসবাস করেন। সেখানে কালে কালে তাঁর পারিবারিক জীবনে যে সংকট দেখা দেয় সে সম্বন্ধে ভাই গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

"ইব্রাহিমের দুই স্ত্রী ছিলেন এক জনের নাম সারা অন্য জনের নাম হাজেরা ছিল। সারা প্রধানা পত্নী, হাজেরা সারার দাসী ছিলেন। সারার কথানুসারে পরে ইব্রাহিম হাজেরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভেই ইসমাইলের জন্ম হয়। একমাত্র পুত্র ইসমাইলের প্রতি ইব্রাহিমের স্নেহ অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহা দেখিয়া সারার ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। অসূয়া-প্রণোদিত হইয়া তিনি সপত্নী হাজেরাকে তাহার শিশুপুত্রসহ অরণ্যে নির্বাসন করিবার জন্য স্বামীকে দৃঢ় অনুরোধ করেন। ইব্রাহিম সারাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন ও তাহার একান্ত বশীভূত ছিলেন, তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হন। এ বিষয়ে ঈশ্বরেরও স্পষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন। তদনুসারে তিনি পুত্রসহ হাজেরাকে মক্কার প্রান্তরে বিসর্জন করিয়া আইসেন। তখন সেই স্থান জনশূন্য কণ্টকাকীর্ণ ভয়ঙ্কর ছিল। এইক্ষণ নগরের যে স্থানে জমজম্ কূপ ও কাবা মন্দির বিদ্যমান, সেই স্থানে ইব্রাহিম স্বীয় পত্নী ও পুত্রকে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের নিকটে কিছু খোর্মাফল ও কয়েক মশক জল রাখিয়া প্রস্থান করেন।

হাজেরা স্বামী প্রদত্ত সেই খোর্মাফল ভক্ষণ ও পানীয় পান করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছিলেন, ইসমাইল স্তন্য পান করিয়া জীবিত ছিলেন। কয়দিন পরে জল নিঃশেষিত হইল, হাজেরা প্রবল পিপাসায় অস্থির হইলেন। ইসমাইলকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া ইতস্ততঃ জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ সেই সময়ে একটি সুনির্মল শীতল জলের প্রস্রবণ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পরমেশ্বর সেই প্রস্রবণ হাজেরার জন্য সমুৎপন্ন করিয়াছিলেন, উহাই জমজম নামে আখ্যাত। তাহা কূপসদৃশ ছিল, উহার জল পুণ্য জল বলিয়া সমাদৃত। হাজেরা সেই উৎস দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার জল পান করিয়া তিনি ও শিশুটি পরিতৃপ্ত হন।"

প্রাচীন বিবরণ অনুসারে জমজমের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে লোকেরা সেখানে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে। তারপর কাবা মন্দির মক্কার আকর্ষণ ও তার গৌরব বাড়ায়।

কারো কারো মতে মক্কার প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব পূর্বেই ছিল, হযরত ইব্রাহিম তা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কোরআনের বর্ণনা থেকে মনে হয়, হযরত ইব্রাহিম* ও তাঁর পুত্র ইসমাইল এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

আর যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল গৃহের ভিত্তি গেঁথে তুললেন তখন (বল্লেন):

হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের থেকে গ্রহণ করো—নিঃসন্দেহ তুমি শ্রোতা জ্ঞাতা।

হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের তোমার অনুগত করো, আর আমাদের সন্তানদের থেকে তোমার প্রতি অনুগত মণ্ডলী সৃষ্টি করো, আর আমাদের উপাসনা প্রণালী দেখাও; আমাদের প্রতি ফের, নিঃসন্দেহ তুমি বারবার প্রত্যাবর্তনকারী—ফলদাতা।

হে আমাদের পালয়িতা, তাদের থেকে তাদের মধ্যে প্রেরিত পুরুষ

উত্থিত করো যাঁরা তাদের কাছে পাঠ করবেন তোমার প্রত্যাদেশ সমূহ, আর তাদের শিক্ষা দেবেন ধর্মগ্রন্থ ও জ্ঞান, আর তাদের পবিত্র করবেন· নিঃসন্দেহ তুমি মহাশক্তি জ্ঞানময়। (২ঃ ১২৭-২৯)

কোরআনের সূরা আল-ই-ইমরানের ৯৫ সংখ্যক আয়াতে উক্ত হয়েছে ঃ

নিঃসন্দেহ মানুষদের জন্য যে প্রথম ভজনালয় নির্মিত হয়েছিল তা মক্কায়– অশেষ কল্যাণময় আর বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক।

অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রথম ভজনালয় 'কাবা' এই এসবের সংগত ব্যাখ্যা মনে হয়।

ইসমাইল বড় হলে হজরত ইব্রাহিম স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁকে ইসমাইলকে কোরবানি দিতে হবে। এ সম্বন্ধে কোরআনে আছে ঃ

আর যখন সে তাঁর সঙ্গে কাজ করার যোগ্য হলো তিনি বল্লেন ঃ হে আমার পুত্র, নিঃসন্দেহ আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমাকে তোমাকে কোরবানি দিতে হবে। তবে করো তোমার ভাবনায় যা আসে। সে বল্লে ঃ হে পিতা, তাই করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আমাকে পাবেন ধৈর্যবান্।

তারপর যখন তাঁরা উভয়ে আত্মসমর্পিত হলেন, তিনি তাকে পাতিত করলেন তার কপালের উপরে।•

তখন আমি তাঁকে ডেকে বল্লাম ঃ হে ইব্রাহিম ঃ নিঃসন্দেহ তুমি স্বপ্নের সত্যতা দেখিয়েছ, নিশ্চয় এই ভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিই।

নিঃসন্দেহ এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

আর আমি তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম এক মহা কোরবানির পরিবর্তে······(৩৭ ঃ ১০২-১০৭)

ইব্রাহিম এমন একটা বড় আত্মসমর্পণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন আর পুত্রের পরিবর্তে একটি মেষ বা ছাগ কোরবানি দিতে তাঁকে বলা হল। এরু থেকেই কোরবানির অনুষ্ঠান। হযরত ইব্রাহিম প্রবর্তিত হজ আর কোরবানির অনুষ্ঠান কাবা-গৃহের মর্যাদা আরো বাড়ায়।

কিন্তু এই এক আল্লাহ্‌র ভজনালয়ে কালে কালে বিচিত্র আকৃতির আর বিচিত্র নামের সংখ্যাহীন দেবতার মূর্তি স্থান পায়। ইব্রাহিম-প্রবর্তিত হজ অবশ্য সেখানে চলতে থাকে; কিন্তু তা মিশ্রিত হয়ে যায় নানা বিসদৃশ পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে। কোরআনে তার উল্লেখ আছে।

হযরত মোহম্মদের পিতৃপুরুষ

ইসমাইল বিবাহ করেন স্থানীয় আরব পরিবারে ও তাদের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। এই ইসমাইলের সন্ততি থেকেই হযরত মোহম্মদের খ্যাতনামা পূর্বপুরুষ কোরেশদের উৎপত্তি—এই কোরেশদের দাবি, আর কোরআনেরও উক্তি।

কোরেশবংশ কালে কালে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়। আরবরা কোনো রাজার অধীন ছিল না, কিন্তু তারা তাদের গোষ্ঠীপতিদের মান্য করতো। কোরেশ-গোষ্ঠীপতিরা আরবে ব্যাপক প্রতিপত্তির অধিকারী হয় মক্কার মন্দিরের সেবাইৎ হয়ে। এই সেবাইতের মান-প্রতিপত্তিকে কেন্দ্র কোরে কোরেশ বংশে পরে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় হাশিম গোত্র ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যে। ইসলামের ইতিহাসে সেই বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে বিচিত্র ফল প্রসব করেছিল।

হযরতের প্রপিতামহ হাশিম তাঁর বহু সদ্‌গুণের জন্য বিখ্যাত হন। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বিদেশ থেকে অনেক আটা এনে আর উট জবাই করে তিনি দেশের লোকদের খাইয়েছিলেন। হাশিমের পুত্র শায়বা বা আব্দুল মোত্তালেবও কৃতী পুরুষ হন। বিখ্যাত জমজম কূপ নানা আবর্জনায় ঢাকা পড়েছিল; তাঁর যত্নে তার পুনরুদ্ধার হয়। সেজন্য তাঁর প্রতিপত্তি আরো বেড়ে যায়।

আব্দুল মোত্তালেবের বহু পুত্র ও কন্যা লাভ হয়, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ্ হযরত মোহম্মদের পিতা।

আব্দুল মোত্তালেব এক সময়ে মানত করেছিলেন যে তাঁর দশ পুত্র লাভ হলে একটি পুত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানি দেবেন। পুত্রেরা বড় হলে তাদের থেকে কাকে কোরবানি দেওয়া হবে এই নিয়ে গুটি খেলা হলে আব্দুল্লাহ্‌র নাম ওঠে। দৈবজ্ঞদের ব্যবস্থা মতো এক শত উট কোরবানি দিয়ে আব্দুল মোত্তালেব পুত্রকে কোরবানি দেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পান। হযরত ইসমাইলকে তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, আবার হযরতের পিতাকেও কোরবানি দেবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল; এই জন্য হযরতকে বলা হতো দুই কোরবানের- উৎসর্গীকৃতের- পুত্র। এই অনন্যসাধারণ ঐতিহ্য সম্বন্ধে হযরত বিশেষ সচেতন ছিলেন।

বাল্যকাল

হযরত মোহম্মদের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন তাঁর জন্ম ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে, কেউ বলেছেন ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০, ২১, অথবা ২২ এপ্রিলে। তাঁর ভূমিষ্ঠ হবার বৎসরে মক্কায় একটি বড় ঘটনা ঘটে- সেটি হচ্ছে ইয়েমেনের খৃষ্টানশাসক আবরাহার মক্কা আক্রমণ। তার সৈন্যদলে একটি হাতী ছিল। আবরাহার উদ্দেশ্য ছিল মক্কার মন্দির বিনষ্ট করে তার নিজের নির্মিত মন্দিরের গৌরব বাড়াবে। কিন্তু তার সৈন্যদলে বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দেয়, ফলে তাকে বিফলমনোরথ হতে হয়। এ সম্বন্ধে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

তুমি কি দেখো নি তোমার পালয়িতা হস্তীর মালিকদের প্রতি কেমন আচরণ করেছিলেন? তাদের চক্রান্ত তিনি কি বিফল করেন নি?

আর পাঠাননি কি তাদের বিরুদ্ধে পাখীর দল ? যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল কাদা দিয়ে তৈরী (ছোটো) পাথর।

আর তাদের করেছিল পশুতে খাওয়া শস্য ক্ষেতের মতো!

হজরতের পিতা আব্দুল্লাহ্ বিশ বৎসর বয়সে (মতান্তরে চব্বিশ বৎসর বয়সে) বিবাহিত হন কোরেশ বংশের যোহরা গোত্রের কন্যা আমিনার সঙ্গে। সেই সময়ে বর্ষীয়ান আবদুল মোত্তালেব বিবাহিত হন বিবি আমিনার চাচাতো বোন হালার সঙ্গে।* বিবাহের পর আব্দুল্লাহ্ বাণিজ্যে যান সিরিয়ার দক্ষিণে, আর সেখান থেকে ফিরবার পথে অসুস্থ হয়ে মদিনায় প্রাণ ত্যাগ করেন। তখন হযরত মাতৃগর্ভে।

এর পর যথাসময়ে তিনি ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর পিতামহ তাঁর নাম রাখেন মোহম্মদ—প্রশংসিত। এই নাম আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না।

হযরতের অপর নাম আহ্‌মদ—তারও অর্থ প্রশংসিত। হযরতের জন্মকালে অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছিল—তাঁর পুরাতন জীবন-চরিতে ও ইতিহাসে এই মর্মের অনেক কথা আছে। প্রাচীন কালের সব মহাপুরুষ সম্পর্কেই এমন বহু অলৌকিক ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে।

আরবের সম্ভ্রান্ত বংশের রীতি ছিল তাদের সন্তানরা শৈশবে ধাত্রীদের দ্বারা লালিত হতো। হযরত লালিত হয়েছিলেন বনি সা'দ গোত্রের হালিমার দ্বারা। ধাত্রীহস্তে সমর্পিত হবার পূর্বে তিনি কিছুদিন তাঁর পিতৃব্য আবুলাহাবের দাসী সোয়াইবিয়ার স্তন্য পান করেছিলেন। তাঁর এই দুধ-মাদের প্রতি হযরত উত্তরকালে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে-ছিলেন। বনি সা'দ গোত্রে হযরত লালিত হয়েছিলেন প্রথমে দুই বৎসর। ধাত্রীগৃহে তাঁর বাড় চমৎকার হয়েছে দেখে মাতা আমিনা তাঁকে পুনরায় ধাত্রীগৃহের মরুভূমির স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পাঠান। সেখানে তাঁর আরো দুই বৎসর কাটে।

প্রাচীন কাহিনীকারদের মতে সেই সময়ে একদিন যখন তিনি তাঁর দুধ-ভাইদের সঙ্গে মাঠে মেষ চরাতে গিয়েছিলেন তখন দুইজন ফেরেশ্‌তা—

* হালার গর্ভে আবদুল মোত্তালেবের বীরপুত্র হাম্‌যার জন্ম হয়।

দেবদূত—এসে তাঁর বুক চিরে তাঁর ভিতর থেকে সমস্ত কলুষ বের করে দেয়। মুসলিম যুক্তিবাদীরা অবশ্য এইসব অালৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করেন না। কোরআনে আছে ঃ

তোমার জন্য তোমার বক্ষ উন্মোচিত (প্রসারিত) করি নি কি ?

আর তোমার থেকে নামিয়ে দিই নি কি তোমার ভার ? (৯৪ ঃ ১-২)

এই উন্মোচন বা সম্প্রসারণ অন্তরের সম্প্রসারণ অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন।

পুরাবৃত্তে আছে, ধাত্রী হালিমা ও তাঁর লোকেরা আশঙ্কা করেছিল বালকের উপরে কোনো আত্মার ভর হয়েছে। আর সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে হালিমা হযরতকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন। * কিন্তু মাতা আমিনা এসব কথার কোনো মূল্য না দিয়ে হযরতকে হালিমার হস্তে পুনরায় সমর্পণ করেন। আরো এক বৎসর হযরত ধাত্রীগৃহে উন্মুক্ত মরুভূমিতে মানুষ হন।

বনি সা'দ গোত্রে যে হযরতের শৈশব কেটেছিল এটি তাঁর জন্য খুব সুফলদায়ক হয়েছিল। কেননা বনি সা'দ গোত্রের ভাষা ছিল উৎকৃষ্ট আরবী ভাষা। হযরতের একটি বাণীতে আছে ঃ আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম আরব—আমার জন্ম কোরেশ বংশে আর আমার ভাষা বনি সা'দের।

পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত হযরতকে লালন পালন করে' হালিমা তাঁকে তাঁর জননীর ক্রোড়ে সমর্পণ করেন।

ষষ্ঠ বৎসর হযরতের মক্কায় কাটে। তারপর তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে মদিনায় যান স্বামীর কবর দেখতে ও স্বামীর মাতুলালয় পরিদর্শন করতে। এই গৃহের স্মৃতি হযরতের মনে অম্লান ছিল। বহু বৎসর পরে মদিনায় এসে তিনি তাঁর বাল্যকালের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন ঃ এই বাড়ীতে

---

* এই ঘটনা থেকে অনেক ইয়োরোপীয় ইসলামবিদ্ বলেছেন, হযরত মোহম্মদ বাল্যকালে মৃগী রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এমন অনুমান ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়, কেন না হযরত অসাধারণ মানসিক ও দৈহিক বীর্যের অধিকারী ছিলেন।

আমি আমার মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে আর মদিনার উনেসা নামের একটি ছোটো মেয়ের সঙ্গে খেলতাম। ঘরের ছাদের উপরে যেসব পাখী বসতো তাদের তাড়িয়ে দিতাম……আর ঐ পুকুরে আমি সাঁতার শিখেছিলাম।

মদিনায় একমাস কাটিয়ে হযরত আমিনা মক্কায় ফেরেন। কিন্তু মাঝপথে এসে তিনি অসুস্থ হন ও সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন। সেখানেই তাঁর সমাধি হয়। হযরতকে মক্কায় নিয়ে আসে তাঁর মাতার দাসী উম্মে আয়মন।

হযরতকে লালনপালন করতে থাকেন তাঁর পিতামহ আবদুল মোত্তালেব। সম্ভ্রান্ত আরবদের মধ্যেও তখন লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। বাল্যকালে হযরতের লেখাপড়ার কোনো ব্যবস্থাই হয় নি। তাঁর লেখাপড়া জানার অভাব সম্বন্ধে কোরআনে বলা হয়েছেঃ

আর তুমি (হে মোহম্মদ) এর পূর্বে কোনো গ্রন্থ পাঠ কর নি, তোমার ডান হাত দিয়ে তা লেখও নি, তাহলে তারা সন্দেহ করতে পারতো যারা মিথ্যা রটনা করে। (২৯ ঃ ৪৮)।

দুই বৎসর কাল পিতামহের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত হয়ে তাঁকেও তিনি হারান। প্রায় আশি বৎসর বয়সে অশেষসম্মানিত গোষ্ঠীপতি আবদুল মোত্তালেব তাঁর বহু পুত্র ও কন্যা রেখে পরলোক গমন করেন। ইব্‌নে ইসহাক লিখিত হযরতের জীবনচরিতে আছেঃ অন্তিমকাল ঘনিয়ে এলে আবদুল মোত্তালেব তাঁর ছয় কন্যাকে ডেকে বল্লেনঃ আমার উদ্দেশ্যে তোমরা যে শোকগাথা রচনা করবে তা রচনা করে আমাকে শোনাও। তাঁর কন্যারা যে সব পদ রচনা করেছিলেন তার কিছু অংশ এইঃ

ওরে আমার দুই চোখ, তোমের অশ্রুর মুক্তা ঝরা তার উদ্দেশ্যে
যে কখনো কোনো ভিক্ষুককে হাঁকিয়ে দেয়নি ;
যার বংশ উঁচু, যে সফলকর্মা,
সুদর্শন, যার পিতৃপুরুষের অতুল গৌরব।
শায়বা তার নাম, প্রশংসিত, মহাপ্রাণ,

মহামান্য, শক্তিশালী, অশেষ খ্যাতিমান,
ক্ষমাশীল, বিপদে ধীর,
উদারহৃদয়, সদামুক্তহস্ত,
গৌরবের যার তুলনা নেই—
উজ্জ্বল যেন চাঁদের জ্যোৎস্না।
মৃত্যু ধরলো তাকে, দিল না রেহাই।

কন্যাদের গাথা আবৃত্তি করা যখন শেষ হলো তখন বৃদ্ধ বাক্‌শক্তিহীন হয়েছেন। ইঙ্গিতে তিনি জানালেন গাথা তাঁর মনে ধরেছে।

আবদুল মোত্তালেব হযরতের লালনপালনের ভার দিয়ে যান তাঁর পুত্র আবুতালেবকে। আমরা দেখবো আবুতালেব অতি যোগ্যতার সঙ্গে এই ভার বহন করেছিলেন।

হযরতের বয়স যখন বারো বৎসর তখন আবুতালেব তাঁকে রেখে দূর সিরিয়ায় বাণিজ্যের জন্য যাত্রার আয়োজন করেন। কিন্তু হযরত কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন না। তখন আবুতালেব হযরতকে সঙ্গে নিয়েই বাণিজ্যে রওনা হলেন। সে-যাত্রায় তাঁরা সিরিয়ার বসরা এমন কি তারও থেকে দূরে গিয়েছিলেন। প্রাচীন ইতিবৃত্তে আছে ঃ বসরায় বহিরা নামে এক খৃষ্টান সন্ন্যাসী হযরত সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যৎ-বাণী করে ও ইহুদীদের থেকে তাঁকে সাবধানে রক্ষা করতে বলে। এই যাত্রায় হযরত অনেক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখেন। লোকপ্রসিদ্ধি ছিল যে সেই সব নগর বিধ্বস্ত হয়েছিল আল্লাহ্‌র রোষের ফলে, কেন না তাদের লোকেরা দুষ্ক্রিয়াপরায়ণ হয়েছিল। কোরআনে বহু স্থানে বলা হয়েছে লোকেরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করুক আর দেখুক কি পরিণতি হয়েছিল তাদের যারা আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

এই যাত্রায় আবু তালেবের প্রচুর লাভ হয়। সম্ভবত সেই জন্য তাঁকে পরবর্তী কালে আর বাণিজ্য-যাত্রা করতে দেখা যায় না।

তরুণ বয়সে হযরত কখনো কখনো ছাগ ও মেষ চরাতেন। কোরআনে বলা হয়েছে, এমন নবী নেই যিনি মেষের রাখাল ছিলেন না।

ছাগ ও মেষ চরাবার কালে অন্য রাখালদের সঙ্গে মিশে বনের পাকা ফল তিনি খেতেন। কিন্তু তরুণসুলভ কোনো অশালীন কাজে তাঁকে রত দেখতে পাওয়া যায় না।

একবার তাঁর চাচা আব্বাসের সঙ্গেও তিনি বাণিজ্য-যাত্রা করেন।

নব যৌবন

ইবনে ইসহাকের মতে হযরতের বয়স যখন বিশ বৎসর তখন ঘটে প্রখ্যাত হরবুল্ ফিজার, অর্থাৎ ফিজারের যুদ্ধ। তবকাত-ই-ইবনে-সা'দ-এ আছে, কোরেশদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন ছিল এমন একটি গোত্রের একব্যক্তি বানু হাওয়াযিনের এক বণিকদলকে আক্রমণ করে' তাদের মাল লুটে নেয় ও একজনকে হত্যা করে, আর তখন ওকাযের † মেলা হচ্ছিল সেই মেলায় সে কোরেশদের আশ্রয় নেয়। এর ফলে ফিজারের যুদ্ধ ঘটে। তা চলে চার বৎসর ধরে, আর তাতে দুই পক্ষে বহু লোক নিহত হয়। হযরত বলেছেন, এই যুদ্ধে তিনি তাঁর চাচাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন আর দুইচার তীর মেরেছিলেন কিন্তু এই কাজ না করলেই তিনি খুশি হতেন। * তার কারণ, কোরেশরা এই যুদ্ধে যোগদান করেছিল অত্যাচারীর পক্ষে।

ফিজারের এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ সেইদিনের অনেকের মনে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। আর তার ফলে আব্দুল্লাহ্ ইবনে যদ্আন নামক এক ধনী ব্যক্তির গৃহে হযরতের চাচা আয্-যোবেরের নেতৃত্বে অনেকে সমবেত হন, আর তাঁরা এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন ঃ

(১) আমরা দেশের অশান্তি দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

† এমন মেলায় কবির লড়াই, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা, মদ্যপান, এসব তো হতোই, খৃষ্টান ও ইহুদী পুরোহিতরা ধর্মের আলোচনাও করতেন। মূয়র বলেছেন : সেই সব আলোচনা তরুণ মোহম্মদের মনকে ধর্মবোধের গভীরতার দিকে আকর্ষণ করে থাকবে।

(২) বিদেশী লোকদের ধনপ্রাণ ও মানসম্মান রক্ষা করতে আমরা চেষ্টা করবো।

(৩) দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সাহায্য করতে আমরা কুন্ঠিত হবো না।

(৪) অত্যাচারী ও অত্যাচার দুইই ব্যাহত করতে, দুর্বলদের রক্ষা করতে, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করবো। †

এই প্রতিজ্ঞায় হযরতও অংশ গ্রহণ করেন। এই প্রতিজ্ঞা তাঁর গভীর শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছিল। পরবর্তী কালে তিনি বলতেন: আমি যে আব্দুল্লাহর গৃহে অনুষ্ঠিত অঙ্গীকারে অংশ গ্রহণ করেছিলাম, তাতে বনি হাশিম, যোহ্রা ইব্নে কিলাব আর তইম ইবনে মুর্রা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল যে তারা অত্যাচারিতের পক্ষে দাঁড়াবে, তার স্মৃতি আমি লাল উটের সঙ্গে বদল করব না। (আরবে লাল উটকে বহুমূল্য জ্ঞান করা হয়।)

নব যৌবনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সঙ্গে হযরত যে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন এতেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তরুণ বয়সেই তাঁর অন্তর কত সুবিকশিত হয়েছিল। তাঁর এই বিকাশ সম্বন্ধে ইবনে ইস্হাকের গ্রন্থে বলা হয়েছে: "আল্লাহ্র নবী বেড়ে উঠেছিলেন—আল্লাহ্ তাঁকে পৌত্তলিকতার কলুষ থেকে রক্ষা করেছিলেন, কেন না, তিনি তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন নবীত্বের সম্মান; তিনি হয়ে উঠেছিলেন তাঁর জাতির মধ্যে মনুষ্যত্বে অনুপম, চরিত্রে উত্তম, বংশগৌরবে সম্ভ্রান্ততম, শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী,

* মূলে আছে 'ওমা উহেব্বু আন্নি লাম্আকুন্ ফাআলতু', মূয়র এর অনুবাদ দিয়েছেন and I do not regret it; কিন্তু এর অনুবাদ হবে...... 'আমি চাই যে একাজ আমি না করেছি'। মূলের 'মা' এখানে নিষেধার্থক নয়। একজন বড় মওলানারও (ঢাকা মাদ্রাসার মৌলানা মোহম্মদ ইসহাকের) এই বাক্যটির অর্থ সম্বন্ধে ভুল হয়েছিল; পরে তিনি সে সম্বন্ধে অবহিত হন।

† দ্রঃ মোস্তফা চরিত, পৃঃ ২৩০।

পরমসদয়, সত্যপরায়ণ, বিশ্বস্ত, নৈতিক অশালীনতা ও গ্লানি থেকে বহু দূরে অবস্থিত…ফলে তাঁর লোকেদের মধ্যে তিনি পরিচিত ছিলেন আল্-আমীন—বিশ্বস্ত—নামে, আল্লাহ্ তাঁকে যেসব উঁচু গুণে ভূষিত করেছিলেন সেই জন্য।”

গার্হস্থ্য জীবন

কোরেশদের মধ্যে একজন বিশিষ্টা ধনবতী বিধবা ছিলেন। তাঁর নাম খদিজা—তিনি বিশিষ্টা ছিলেন তাঁর বিত্তের জন্য আর বিশেষ করে' তাঁর শুচিশুভ্র চরিত্রের জন্য। তিনি কর্মচারীদের সহায়তায় বাণিজ্য করতেন। হযরতের এমন সুনামের কথা শুনে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন ও অনুরোধ জানালেন তাঁর সিরিয়াগামী কাফেলার ভার নিতে, বল্লেন: অন্যদের তিনি যা দেন তার চাইতে বেশি তিনি তাঁকে (হযরতকে) দেবেন। হযরত রাজি হলেন, আর বিবি খদিজার ভৃত্য মায়সারাকে সঙ্গে নিয়ে বণিজ্য-যাত্রা করলেন। এই যাত্রায় প্রচুর লাভ হয়েছিল। মায়াসারা বহুভাবে হযরতের সুখ্যাতি করে। এর পরেও হযরত বিবি খদিজার কাফেলার ভার নিয়ে সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে যান, আর তাঁর সততার ও ভদ্র ব্যবহারের গুণে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

এই সময়ে বিবি খদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর। হযরতের কর্মক্ষমতা ও উত্তম চরিত্র তাঁর মনে দাগ কাটে। তিনি তাঁকে স্বামিত্বে বরণ করতে অভিলাষ করেন। হযরত তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবকে এই প্রস্তাবের কথা জানান। দুই পক্ষের সম্মতিতে হযরত ও বিবি খদিজার বিবাহ অচিরে সুসম্পন্ন হয়। হযরতের বয়স এই সময়ে ছিল পঁচিশ বৎসর। কিন্তু হযরত ও বিবি খদিজার দাম্পত্য-জীবন পরম সুখের হয়েছিল। আমরা পরে পরে পরিচয় পাবো পরস্পরের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল।

হযরত ও বিবি খদিজার বিবাহের ব্যাপারে প্রাচীন বিবরণে কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনারও উল্লেখ আছে।

বিবি খদিজার গর্ভে হযরতের সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন—তিনটি পুত্র আর চারটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল আল্ কাসেম, সেজন্য হযরতের সম্ভ্রমসূচক ডাকনাম ছিল আবুল কাসেম অর্থাৎ কাসেমের পিতা। পুত্ররা সবাই অল্প বয়সে মারা যান। কন্যারা সবাই যথাসময়ে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। হযরতের কনিষ্ঠা কন্যা বিবি ফাতেমা ভিন্ন তাঁরা সবাই হযরতের জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন।

হযরতের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বৎসর তখন কাবাগৃহ পুনর্নির্মিত হয়। এই নির্মাণকার্যে হযরত একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কোরেশ বংশের সব গোত্রের লোকই এতে যোগ দিয়েছিল, এবং কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গেই এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু গণ্ডগোল দেখা দিল কাবার বিখ্যাত কৃষ্ণ প্রস্তর যথাস্থানে স্থাপনার সমস্যা নিয়ে, কেন না, তাদের চিন্তায় কৃষ্ণপ্রস্তর স্থাপনার সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিল। সহজেই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠলো। সামান্য কারণে আরবদের মধ্যে যেমন ভীষণ যুদ্ধ হতো তেমন এক যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিল।

এই সংকটে বর্ষীয়ান আবু উমাইয়া তাদের নিরস্ত করে বল্লেন: আমার কথা শোনো, যে ব্যক্তি প্রথম কাবার ফটক দিয়ে প্রবেশ করবে তার উপরে তোমাদের এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার ভার দাও। তারা রাজী হলো। সেই দরজা দিয়ে প্রথম প্রবেশ করলেন হযরত। তাঁকে দেখে সবাই সমস্বরে বলে উঠলো: এই যে আমাদের আল্-আমীন (বিশ্বাসভাজন) এসেছে, আমরা সবাই এর মীমাংসায় সম্মত। হযরত তাদের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে নিজের চাদর বিছিয়ে তার উপরে কৃষ্ণপ্রস্তরখনি রাখলেন, আর সব গোত্রকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বল্লেন। তারপর সেই প্রতিনিধিদের বল্লেন চাদরখানির বিভিন্ন প্রান্ত ধরে যেখানে কৃষ্ণ

প্রস্তর বসানো হবে সেখানে নিয়ে যেতে। তারপর তিনি নিজে পাথরখানি তুলে যথাস্থানে বসালেন। তাঁর শুভবুদ্ধির গুণে কোরেশ এক ভীষণ আত্মঘাত থেকে রক্ষা পেল। কৃষ্ণপ্রস্তর সম্বন্ধে মৌলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁ লিখেছেন :

"হাজরে আছওয়াদ বা কৃষ্ণপ্রস্তর সম্বন্ধে অন্য ধর্মাবলম্বী লেখকগণ যৎপরোনাস্তি অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। হযরত এবরাহিম ও তাহার বংশধরদিগের মধ্যে চিরাচরিত পদ্ধতি ছিল যে, প্রান্তরে বা অন্য কুত্রাপি উপাসনা ও বলিদানের স্থান মনোনীত হইলে তথায় তাহারা চিহ্ন স্বরূপ এক একখানা প্রস্তর স্থাপন করিতেন। বাইবেলেও ইহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। হযরত এবরাহিম ও এসমাইল মক্কায় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া যথা নিয়মে সেখানেও একখানা প্রস্তর রাখিয়াছিলেন। প্রস্তরখানা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় শেষে উহা হাজরে আছওয়াদ বা কৃষ্ণ প্রস্তর নামে খ্যাত হয়। বংশের আদি পুরুষের স্মৃতিফলক মনে করিয়া আরবগণ স্বভাবতই ঐ কৃষ্ণপ্রস্তরের সমাদর করিত। কিন্তু ঘোর পৌত্তলিকতার যুগেও কখনই তাহার কোনোপ্রকার পূজা হয় নাই।...মক্কা-বিজয়ের পরে হযরত যখন দেববিগ্রহগুলি কা'বা হইতে অপসারিত করিয়া ফেলেন, তখন এই জন্যই ঐ প্রস্তরটিকে স্বস্থানচ্যুত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করা হয় নাই।

একদা হজ্জের মৌসুমে সমবেত জনমণ্ডলীকে শুনাইয়া হযরত ওমর এই প্রস্তরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি নিশ্চিতরূপে অবগত আছি যে তুমি একখণ্ড প্রস্তর মাত্র, কাহারও উপকার বা অপকার করার কোন শক্তিই তোমার নাই।"

ফিজারের যুদ্ধের পরের অঙ্গীকার গ্রহণ আর পুনর্নির্মিত কাবাগৃহে কৃষ্ণপ্রস্তর স্থাপনা, এই দুইয়ের মতো অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও হযরতের নবীত্ব লাভের পূর্বে তাঁর পরিবেশে ঘটে, সেটি হচ্ছে সত্যধর্ম নির্ণয়ের জন্য মক্কার চারজন সন্ধানীর উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। ইবনে ইসহাক থেকে তাঁদের বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করছি।

এক বাৎসরিক উৎসবের দিনে আরবদের প্রচলিত পৌত্তলিকতার

প্রতি বিরূপতা জানালেন এই চার ব্যক্তি : ওরাকা বিন নওফল, ওবেদুল্লাহ্ বিন্ জহ্শ, ওসমান বিন্ আল্ হুওয়েরিস আর যায়েদ বিন্ আমর। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে তাঁদের লোকেরা জাতির পিতা ইব্রাহিবের ধর্ম বিকৃত করেছে, তাদের পাথরের মূর্তি প্রদক্ষিণ করা এক অর্থহীন অনুষ্ঠান, সেই মূর্তির না আছে শোনার ক্ষমতা, না আছে দেখার ক্ষমতা, তা না ক্ষতি করতে পারে, না সাহায্য করতে পারে। সেজন্য তাঁরা বিভিন্নভাবে ইব্রাহিমের দ্বারা প্রচারিত 'হানিফিয়া' ধর্মের সন্ধানী হলেন।

এই চারজনের জীবনের পরিণতি লাভ হয় এই : ওরাকা কালে কালে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন আর তাতে ব্যুৎপন্ন হন। ইসলাম প্রচারিত হলে ওবেদুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন ও মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ওম্মে হবিবাকে সঙ্গে নিয়ে আবিসিনিয়ায় যান। সেখানে তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন; তিনি মুসলমানদের বলতেন : আমরা স্পষ্ট-ভাবে দেখি, কিন্তু তোমাদের চোখ আধ-খোলা। তিনি আবিসিনিয়ায় মারা যান। তাঁর পত্নী পরে হযরতের পত্নী হন। ওসমান আল্-হুওয়েরিস বাইজেন্টিয়ামে যান ও সেখানে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হন। কথিত আছে যে তিনি মক্কাজয়ের ষড়যন্ত্র করেছিলেন, আর মক্কার লোকদের তরফ থেকে কেউ তাঁকে বিষ দিয়ে হত্যা করে। যায়েদ বিন আম্‌র্ সত্যের সন্ধানী হয়ে সিরিয়া ইরাক প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি কন্যাহত্যা নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্, যদি জানতাম কেমন করে তোমার উপাসনা করলে তুমি খুশী হও তবে তাই আমি করতাম, কিন্তু আমি জানি না। ওমর (পরে দ্বিতীয় খলিফা) ছিলেন তাঁর সহোদর (কিন্তু দুইজন বিভিন্ন পিতার সন্তান); যায়েদ পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে-ছিলেন এ জন্য তিনি তাঁর উপরে খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন, আর ছোকরাদের উসকিয়ে দিতেন যায়েদের উপরে অত্যাচার করার জন্য। বিদেশ থেকে মক্কায় ফিরবার পথে যায়েদ নিহত হন। ইবনে

ইসহাকের গ্রন্থে যায়েদের কবিতা ব'লে প্রচারিত অনেকগুলো লাইন আছে, সে সবের থেকে আমরা চার লাইন উদ্ধৃত করছি :

হে আল্লাহ্, এক দীনহীন কয়েদী আমি, আমার মুখ
ধুলায় লুটিয়ে ;
তোমার যা আদেশ তাই আমি পালন করবো ;
অহঙ্কার আমি চাই না, আমি চাই ভক্তির আশীর্বাদ—
যে পথিক দুপুরে চলেছে সে নয় তার মতো
যে আছে দুপুরে ঘুমিয়ে।

তাঁর সম্বন্ধে ওরাকার শোকগাথাও ইবনে ইসহাকের গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, তার চার লাইন এই :

তুমি ছিলে সম্পূর্ণ সত্য পথে হে যায়েদ,
তুমি এড়িয়ে গেছ দোযখের আগুন—
একমাত্র আল্লাহ্‌র সেবা করে'
আর মিথ্যা প্রতিমাদের বিসর্জন দিয়ে।

ইবনে ইসহাকের গ্রন্থেই আছে, হযরত ওমর একবার এই যায়েদ সম্বন্ধে হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : আমরের পুত্র যায়েদের জন্য আমরা আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি কি? হযরত বলেছিলেন : হ্যাঁ, কেন না, মৃতদের থেকে তাকে তোলা হবে একটি সমগ্র জাতির একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে।

মার্মাডিউক পিক্‌থল বলেছেন, নবীত্ব লাভের পূর্বে হযরত ছিলেন হানিফিয়া-পন্থী।—হানিফিয়াদের মত অবশ্য তেমন স্পষ্ট রূপ নেয় নি। তবে তাঁদের প্রতি, বিশেষ করে' যায়েদ বিন্ আম্‌র্-এর প্রতি, হযরত যে বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন তা বোঝা কঠিন নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত দেখতে কেমন ছিলেন

হযরত দেখতে কেমন ছিলেন সে সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদিস-সংগ্রহে ও চরিত-কথায় বহু বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচনায় সে সবের কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি।

হযরত দেখতে লম্বা ছিলেন না, খাটোও ছিলেন না। তিনি বলতেন: মধ্যমাকৃতিই ভালো।

তাঁর বর্ণ ছিল গৌর—গমের রঙের নয়, অত্যন্ত সাদাও নয়। কেউ কেউ বলেছেন তাঁর বর্ণ ছিল রক্তাভ। তাঁর শরীরের যেসব অংশ বাতাসে ও রৌদ্রে উন্মুক্ত থাকতো, যেমন মুখ, ঘাড়, কান, সেসব ছিল রক্তাভ, আর যেসব অংশ বস্ত্রাবৃত থাকতো তা ছিল সম্পূর্ণ সাদা।

তাঁর কেশ ছিল কিছু কুঞ্চিত, যখন তিনি চুল আচড়াতেন তখন তাতে ঢেউয়ের ভাব দেখা দিত। তাঁর কেশ ছিল স্কন্ধ পর্যন্ত লম্বিত।

তাঁর মুখ ছিল অন্যদের তুলনায় বেশি সুন্দর—পূর্ণচন্দ্রের মতো। তাঁর প্রসন্নতা অথবা অপ্রসন্নতা ফুটে উঠতো তাঁর মুখে।

তাঁর কপাল ছিল চওড়া, আর ভ্রূ ছিল বাঁকানো আর সংযুক্ত। তাঁর দুই চোখ ছিল কালো, বড়, উন্মুক্ত—তাদের সাদা অংশে ছিল লালের ছোঁওয়া। তাঁর নাক ছিল সরল উঁচু ও সুগঠিত। তাঁর দাঁত ছিল কিছু ফাঁক ফাঁক, ওষ্ঠাধর সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। তাঁর চিবুক কোমল ছিল না, ছিল দৃঢ়। তাঁর মুখাকৃতি লম্বা ছিল না, গোলাকারও ছিল না, তবে কিছু গোলাকার ছিল। তাঁর

দাড়ি ছিল ঘন, তা ছাঁটা হতো না; তাঁর গোঁফ ছিল ছাঁটা। তাঁর ঘাড় ছিল অন্যদের চাইতে বেশি সুন্দর—লম্বাও নয়, খাটোও নয়, তার যে অংশে রোদ ও হাওয়া লাগতো তা ছিল সোনার-ছোঁওয়া-লাগা রূপার পাত্রের মতো। স্থূলতার দিক দিয়ে তাঁর দেহ ছিল মাঝারি রকমের, বৃদ্ধ বয়সেও তা ছিল পেশীযুক্ত। তাঁর পদক্ষেপ ছিল দৃঢ়—চলবার সময়ে তিনি সামনে কিছু ঝুঁকতেন।

বহু প্রাচীন বিবরণে আছে হযরত প্রথম প্রত্যাদেশ লাভ করেন তাঁর বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হলে। তার কয়েক বৎসর পূর্বে থেকেই ধ্যানের দিকে তাঁর প্রবণতা বেড়ে যায়। ইবনে ইসহাকে আছেঃ হযরত বৎসরে একমাস হেরা পর্বতে নির্জনে প্রার্থনা করতেন আর যেসব দরিদ্র তাঁর কাছে আসতো তাদের খাবার দিতেন। একমাস পূর্ণ হলে নির্জন বাস ত্যাগ করে গৃহে ফিরে সাত বার অথবা আরো বেশি বার কাবা প্রদক্ষিণ করতেন।

প্রথম প্রত্যাদেশ লাভ

কোরআনে আছে রমযান মাসে কোরআন প্রথম অবতীর্ণ হয়। হযরতের প্রথম প্রত্যাদেশ লাভের বিবরণ আমরা ইবনে ইসহাক থেকে উদ্ধৃত করছিঃ

রমযান মাসে হযরত হেরা পর্বতে গেলেন তাঁর পরিবার সঙ্গে নিয়ে। রাত্রি হলে জিব্রিল তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র আদেশ আনে। হযরত বলেছেনঃ জিব্রিল যখন এসেছিল একটি নক্সা-বোনা চাদর গায়ে দিয়ে, তাতে কিছু লেখা ছিল, তখন আমি ঘুমোচ্ছিলাম। সে বল্লেঃ পড়ো। আমি বল্লামঃ কি পড়বো? সে তার চাদর সমেত আমাকে এমন চেপে ধরলো যেন আমার মৃত্যু হলো, তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বল্লেঃ পড়ো। আমি বল্লামঃ কি আমি পড়বো? সে পুনরায় আমাকে সেই চাদর সমেত চেপে ধরলো, আমার মনে হলো আমার যেন মৃত্যু হলো, তারপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বল্লেঃ

পড়ো। আমি বল্লাম ঃ কি আমি পড়বো? সে আমাকে তৃতীয়বার সেই চাদর সমেত চেপে ধরলো, ফলে আমার মনে হলো আমার মৃত্যু হলো, আর বল্লে ঃ পড়ো। আমি বল্লাম ঃ কি তবে পড়বো? আর এই কথা আমি বল্লাম তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য পাছে সে পুনরায় আমার প্রতি তেমনি আচরণ করে। সে বল্লে ঃ

> ইক্‌রা বিস্‌মি রব্বিকাল্লাযী খালাকা…পড়ো তোমার পালয়িতার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে, পড়ো—আর তোমার পালয়িতা মহাসম্মানিত—যিনি শিখিয়েছেন লেখনীর যোগে, শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।…

তাই আমি তা পড়লাম আর সে আমার কাছ থেকে চলে গেল। আর আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, আর এই কথাগুলো যেন আমার হৃদয়ের উপরে লেখা হয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে কেউই বেশি ঘৃণিত ছিল না একজন ভাবোন্মত্ত কবির চাইতে অথবা একজন ভূতে-পাওয়া অথবা জিনে-পাওয়া লোক থেকে। আমি তাদের দিকে তাকাতে পারতাম না। আমি ভাবলাম—হায় আমার দুর্ভাগ্য, হলাম কি না একজন কবি, অথবা জিনে বা ভূতে পাওয়া—কোরেশ আমার সম্বন্ধে এমন কথা কখনো না বলুক। আমি চড়বো পাহাড়ের চূড়ায় আর সেখান থেকে নিজেকে ফেলে দেবো নিচে যেন আমি নিজেকে হত্যা করতে পারি ও শান্তি পেতে পারি। সেজন্য আমি তাই করতে চল্‌লাম; আর যখন পাহাড়ের মধ্যপথে গিয়েছি তখন শুনলাম আকাশ থেকে একটি কণ্ঠ বলছে ঃ হে মোহম্মদ, তুমি এই যুগের পয়গাম্বর আর আমি জিব্রিল। আমি আকাশের দিকে মাথা তুললাম কে কথা কইছে তাই দেখতে। আর দেখলাম মানুষের রূপ ধরে জিব্রিল দিগন্তে দুই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলছে ঃ হে মোহম্মদ, তুমি আল্লাহ্‌র রসুল আর আমি জিব্রিল। ক

ক কোরআনে আছে ঃ নিঃসন্দেহ তিনি তাকে দেখেছিলেন স্পষ্ট আকাশ-প্রান্তে—(৮১ ঃ ২৩)।

আমি দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলাম। সামনেও এগোলাম না পিছনেও হঠলাম না। আর এতে আমার সংকল্পের পরিবর্তন হলো। তার পর আমি তার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু আকাশের যেদিকেই তাকালাম পূর্বের মতো তাকে দেখলাম আমার সামনে। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম, এগোলাম না পিছেও হঠলাম না। খদিজা আমার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলেন। তারা মক্কার টিলায় উঠে তাঁর কাছে ফিরে গেল। আমি সেখানে দাঁড়িয়েই রইলাম। তারপর সে আমার কাছ থেকে চলে গেল, আর আমিও ফিরে পরিজনের কাছে এলাম। আমি খদিজার কাছে গিয়ে তাঁর উরু ঘেঁষে বসলাম। তিনি বল্লেন ঃ আবুল কাসেম, আপনি কোথায় ছিলেন? আল্লাহর শপথ, আমি আমার লোকদের পাঠিয়েছিলাম আপনার খোঁজে, তারা মক্কার টিলা ঘুরে আমার কাছে ফিরে এসেছে। আমি বল্লাম, হায়, আমি কবি হয়েছি অথবা আমাকে জিনে অথবা ভূতে পেয়েছে। খদিজা বল্লেন ঃ হে আবুল কাসেম, তা থেকে আমি আল্লাহ্‌তে আশ্রয় নিই—আল্লাহ কখনো আপনার প্রতি এরূপ ব্যবহার করবেন না, কেন না তিনি জানেন আপনার সত্যবাদিতা, অসাধারণ বিশ্বস্ততা, আপনার উত্তম চরিত্র আর আপনার দয়া। এ কখনোই হতে পারে না প্রিয়তম। হয়ত আপনি কিছু দেখেছেন। আমি বল্লাম ঃ হাঁ আমি দেখেছি। তারপর তাঁকে বল্লাম কি আমি দেখেছি। তিনি বল্লেন ঃ আমার পিতৃব্য পুত্র, আনন্দিত হোন আর আশ্বস্ত হোন, যাঁর হাতে খদিজার জীবন তাঁর শপথ কোরে বলছি নিশ্চয় আপনি এই জাতির নবী হবেন।

এর পর হযরত খদিজা তাঁর আত্মীয় সুপণ্ডিত ওরাকা বিন্ নওফলের কাছে গিয়ে হযরত সম্পর্কিত সব ব্যাপার বিবৃত করলেন। ওরাকা বলে উঠলেন ঃ কদ্দুস কদ্দুস (পবিত্র পবিত্র), যাঁর হাতে ওয়াকার জীবন তাঁর শপথ, হে খদিজা, তুমি যদি আমাকে সত্য বলে' থাকো তবে তাঁর কাছে সব চাইতে বড় নামুস (অর্থাৎ জিব্রিল) এসেছে যে এর পূর্বে

এসেছিল মূসার কাছে, আর নিঃসন্দেহ তিনিই এই জাতির পয়গাম্বর, তাঁকে আশ্বস্ত হতে বলো। এর পর হযরতের সঙ্গে ওরাকার দেখা হলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন কি তিনি দেখেছেন, আর তাঁর কাছ থেকে সব শুনে তাঁকে আশ্বস্ত হতে বল্লেন; আর বল্লেনঃ তোমার কাছে শ্রেষ্ঠতম নামুস এসেছে, যে এসেছিল মূসার কাছে, ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলবে, অপমানিত করবে, তাড়িয়ে দেবে, আর তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। নিশ্চয় সেই সময় পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকি আমি আল্লাহ্‌কে সাহায্য করবো সেইভাবে যা তিনি জানেন। তারপর ওয়াকা নিজের মাথা হযরতের কাছে এনে তাঁর ললাট চুম্বন করলেন ও বাড়ী চলে গেলেন। ওয়াকার কথায় হযরতের আত্মবিশ্বাস বাড়লো, আর তাঁর দুশ্চিন্তার বোঝা হাল্কা হলো।

হযরতের প্রথম প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি সম্বন্ধে মোস্তাফা-চরিতে বলা হয়েছেঃ

"হযরত এই বাক্যগুলি (পূর্বোক্ত পাঁচটি আয়াত) লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেনে। তখন তাঁহার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছিল—তিনি খদিজার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। খদিজা তাহাই করিলেন। তারপর সেই ত্রাস দূর হইয়া গেলে, হযরত খদিজাকে হেরার সমস্ত বিবরণ অবগত করিয়া বলিলেন—'আমার নিজের সম্বন্ধে ভয় হইতেছে।' তখন খদিজা বলিলেন—'কখনই নহে, আল্লাহ্‌র দিবা, তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করিবেন না।

...অতঃপর খদিজা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় খুল্লতাত পুত্র অর্কা-বেন-নওফলের নিকট লইয়া গেলেন...কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই অর্কা পরলোক গমন করিলেন।

বোখারীতে এই সঙ্গে সঙ্গে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, অহি বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর হযরতের ত্রাস ও চিন্তা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি মধ্যে মধ্যে পর্বত শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িরা আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু বোখারীর বর্ণিত হাদিসের এই

অংশটুকু হযরতের বা বিবি আয়েশার এমন কি তাঁহার পরবর্তী রাবিরও (বর্ণনকারীরও) উক্তি নহে। ইহা তৃতীয় বর্ণনাকারী জোহ্‌রীর বর্ণনা। এমাম বোখারীর এই অংশটুকু প্রকৃতপক্ষে হাদিসের অন্তর্ভুক্ত নহে।" প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি সম্বন্ধে ইব্‌নে ইসহাক লিখেছেন ঃ প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি এক কষ্টকর ভার—কেবল সবল সংকল্পবান বাণীবাহকরাই আল্লাহ্‌র সহায়তায় ও কৃপায় তা বহন করতে পারেন।*

প্রথম আয়াতগুলো পাবার পরে হযরতের কাছে কিছুদিন কোনো বাণী আসে নি; এতে তাঁর চিন্তা ও উদ্বেগ বেড়ে যায়। এই অবস্থায় "একদিন হঠাৎ তিনি পূর্ব্ববৎ সেই পরিচিত শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দেখিলেন, স্বর্গ মর্তের মধ্যস্থলে এক আসনের উপর উপবিষ্ট—এবার পূর্ব্ব পরিচিত সেই ফেরেশতা। তখনও তাঁহার ত্রাস হইল এবং তিনি বাটীতে আসিয়া পূর্ব্ববৎ কাপড় গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। তখন নিম্নলিখিত আয়তগুলি অবতীর্ণ হইল।"†

হে পোষাক-পরিহিত,
ওঠো, তারপর সতর্ক করো;
আর তোমার প্রতিপালক—তাঁর মহিমা কীর্তন করো,
আর তোমার পোষাক—তা পবিত্র করো,
আর কদর্যতা—পরিহার করো,
আর অনুগ্রহ করো না পুনরায় বেশি পাবার জন্য,
আর তোমার পালয়িতার উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধরো···

গোপনে ধর্মপ্রচার

হযরত যে নব ধর্মজীবনের বাণী লাভ করলেন তাতে প্রথম আস্থাবতী হলেন তাঁর পত্নী হযরত খদিজা।

* প্রত্যাদেশ স্বতঃই অনুবৃত্তিতে এবং চতুর্থ খণ্ডেও আমাদের আলোচনার বিষয় হবে।

† দ্রঃ মোস্তাফা-চরিত।

তাঁর সম্বন্ধে ইবনে-ইসহাক বলেছেন: তিনিই প্রথম আল্লাহ্‌তে, তাঁর রসুলে, আর তাঁর বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তিনি কখনো তাঁর বিরুদ্ধাচারিণী অথবা তাঁতে অনাস্থাবতী হয়ে তাঁকে দুঃখিত করেন নি, বরং তাঁর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যখন তিনি গৃহে ফিরেছিলেন। তিনি তাঁর বলবৃদ্ধি করেছিলেন, তাঁর বোঝা হাল্কা করেছিলেন, তিনি তাঁর সত্য প্রচার করেছিলেন, আর লোকদের বিরোধিতা তুচ্ছ করেছিলেন।

হযরত খদিজার পরে ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আলী—তখন তিনি দশ বৎসরের বালক। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইবনে ইসহাকে বলা হয়েছে:

দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত তাঁর চাচা আল্‌-আব্বাসকে বল্লেন (তিনি ছিলেন হাশিম গোত্রে সব চাইতে সংগতিসম্পন্ন) তাঁর চাচা আবু তালেবের পরিজনের কিছু অংশের ভার নিয়ে তাঁকে সাহায্য করা সঙ্গত। আল্‌-আব্বাস রাজী হলে তাঁকে দেওয়া হলো আবু তালেবের পুত্র জাফরের ভার আর হযরত নিলেন আলীর ভার। সেই থেকে আলী হযরতের পরিবারভুক্ত হলেন। প্রত্যাদেশ লাভের পরে হযরত নামায পড়তে মক্কার কোনো সংকীর্ণ উপত্যকায় চলে যেতেন আলীকে সঙ্গে নিয়ে, সেখানে নামায পড়ে সন্ধ্যায় তাঁরা গৃহে ফিরতেন। তখন হযরতের এইভাবে নামায পড়ার কথা বাইরের কেউ জানতো না। একদিন আবু তালেব তাঁদের এইভাবে নামায পড়তে দেখে হযরতকে জিজ্ঞাসা করলেন: ভাই-পো, তোমরা যে ধর্মকর্ম করছ এটা কি? তিনি বল্লেন: চাচা, এই ধর্ম হচ্ছে আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের, তাঁর রসুলদের, আর এই ধর্ম হচ্ছে আমাদের পিতা ইব্রাহিমের। মতান্তরে তিনি বলেছিলেন: আল্লাহ্‌ আমাকে মানুষদের কাছে পয়গাম্বররূপে পাঠিয়েছেন, আর আপনি আমার চাচা সেজন্য সব চাইতে সঙ্গত যে আপনাকে জানাবো সত্য ও পথনির্দেশের কথা। তাঁর চাচা উত্তর দিয়েছিলেন: আমার পূর্বপুরুষ যে ধর্ম অনুসরণ করেছেন তা আমি ছাড়তে পারি না, তবে আল্লাহ্‌র শপথ

করে' বলছি আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমার কোনো বিপদ ঘটতে দেবো না। তাঁর পুত্র আলীকেও তিনি তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর তাঁর উত্তর শুনে বলেছিলেন ঃ সে (মোহম্মদ) তোমাকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করবে না যা ভালো নয়, কাজেই তার সঙ্গে থাকো।

আলীর পরে ইসলাম গ্রহণ করেন যায়েদ। যায়েদ প্রথমে ছিলেন হযরত খদিজার দাস. তিনি তাঁকে উপহার দেন হযরতকে। হযরত যায়েদকে মুক্তি দিয়ে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

যায়েদের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন হযরতের বন্ধু হযরত আবু বকর। তিনি হযরতের চাইতে বছর দুয়েকের ছোট ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত সওদাগর, সততার জন্য তাঁর বিশেষ সম্মান ছিল। তিনি কোরেশদের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে সব চাইতে ওয়কিফহাল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ধীরতা ও বিজ্ঞতাও সুপরিচিত ছিল। হযরত যখন প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন ও কোরআনের যে অংশ সেই সময় পর্যন্ত তাঁর লাভ হয়েছিল তা পড়ে শোনালেন, আর বল্লেন যে এক আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার আর বিভিন্ন দেবতার পূজা পরিত্যাগ এই তাঁকে আদেশ করা হয়েছে, তখন কিছুমাত্র দ্বিধা না কোরে হযরত আবুবকর হযরতের প্রেরিতত্বে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করলেন শুধু আস্থা স্থাপন নয়, তখন পর্যন্ত ইসলাম প্রকাশ্য ভাবে প্রচারিত হচ্ছিল না. হযরত আবু বকর তাঁর বন্ধুবান্ধবদের প্রকাশ্য ভাবে ইসলামে আহ্বান করতে লাগলেন। তাঁর অনুরোধে যাঁরা সেই প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে এই পাঁচ জন বিশেষ খ্যাতনামা ঃ ওসমান বিন্ আফফান (পরে তৃতীয় খলিফা); আয্-যুবের বিন্ আওয়াম, আব্দুর রহমান বিন্ আউফ, সাদ বিন্ আবু ওক্কাস, তাল্‌হা বিন্ উবায়দুল্লাহ। এঁদের মধ্যে ওসমানের বয়স এই সময়ে ছিল ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, তাল্‌হা ছিলেন হযরতের চাইতে দশ বৎসরের ছোট। অবশিষ্ট তিনজন ছিলেন তরুণবয়স্ক।

হযরত তাঁর নবীত্ব লাভের অতিপ্রাথমিক যুগে যেসব প্রত্যাদেশ

লাভ করেছিলেন তার কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করেছি। কোরআনের আম্‌পারায়—শেষ খণ্ডে—সেই অতিপ্রাথমিক যুগের প্রত্যাদেশ আরো পাওয়া যাবে। সেইসব বাণীতে দেখা যায়, নবীত্বের সূচনায় হযরতের লাভ হয়েছে আল্লাহ্‌র একত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা, আর মানুষকে যে তার জীবনের মহৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে আর তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে সেসব কথাও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ; যারা দুঃস্থ ও বঞ্চিত তাদেরও প্রতি যে মানুষের বিশেষ কর্তব্য আছে কোনো কোনো সূরায় তারও স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তবু তাঁর নবীত্ব লাভের পরে প্রথম তিন বৎসর তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁর লব্ধ বাণী প্রচার করেন নি।

প্রকাশ্য প্রচারের ফল

ইব্‌নে ইসহাকে আছে ঃ

লোকেরা, নারী পুরুষ উভয়েই, ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। তাতে এর কথা মক্কাময় রাষ্ট্র হলো। তখন আল্লাহ্‌ নবীকে আদেশ দিলেন যে-সত্য তাঁর (নবীর) লাভ হয়েছে তা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করতে ঃ আর তোমার নিকটতম আত্মীয়দের সাবধান করো ; আর তোমার ডানা আনত করো (করুণায়) সেই বিশ্বাসীদের প্রতি যারা তোমার অনুসরণ করে (২৬ ঃ ২১৪-২১৫)।

এই বাণী লাভ করে হযরত আলীকে বল্লেন, আল্লাহ্‌ আমাকে আদেশ করেছেন আমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করতে, কিন্তু এই দায়িত্ব আমার সাধ্যের অতিরিক্ত ; আমি জানি তাদের কাছে এই বাণী প্রচার করলে আমি তাদের খুব অপ্রিয় হবো ; তাই আমি কিছু বলি নি ; কিন্তু জিব্রিল এসে আমাকে বল্লে যে আমাকে যে আদেশ দেওয়া হযেছে তা যদি আমি পালন না করি তবে আল্লাহ্‌ আমাকে শাস্তি দেবেন। সেজন্য, তিনি অলীকে একটি ছোটখাটো ভোজের আয়োজন করতে বল্লেন তাঁর পরিজনদের জন্য। অভ্যাগতদের খাদ্য

ও পানীয় গ্রহণের পরে হযরত তাদের কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু আবু লাহাবের বাধা দানের ফলে সেদিন আর তাঁর কিছু বলা হলো না। এর পরে আর একদিন হযরত তাদের নিমন্ত্রণ করলেন। সেদিন ভোজনের পরে তাদের সম্বোধন করে তিনি বলতে পারলেন: "হে আবদুল মোত্তালেবের সন্তানগণ, আমি কোন আরবকে জানি না যে তার জাতির কাছে আমার চাইতে ভালো বাণী নিয়ে এসেছে। আমি তোমাদের কাছে এনেছি তাই যা ভালো ইহকালে আর পরকালে, আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন তোমাদের তাঁর দিকে আহ্বান করতে···।" কিন্তু তাঁর লোকেরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না।

এই প্রচারের আদেশ অবতরণ সম্বন্ধে বুখারীতে আছে: এই বাণীর অবতরণ হলে হযরত সাফা পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে কোরেশ বংশের সব গোত্রকে নাম ধরে ডাকলেন, আর যখন সেইসব গোত্রের প্রতিনিধিরা সমবেত হলো—তাদের মধ্যে হযরতের কড়া বিরোধী আবু লাহাবও ছিল—তখন হযরত তাদের বল্লেন: আমি যদি বলি যে এক সৈন্যদল উপত্যকার মধ্যে লুকিয়ে আছে তোমাদের আক্রমণ করার জন্য তাহলে তোমরা আমার সেই কথা কি বিশ্বাস করবে? তারা সবাই একবাক্যে বল্লে: হাঁ, কেন না তোমার মুখ থেকে কখনো আমরা সত্য ভিন্ন মিথ্যা কিছু পাই নি। হযরত বল্লেন: তবে জেনে রাখো তোমাদের জন্য যে সংকট এগিয়ে আসছে আমি সে সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছি। বদমেজাজী আবু লাহাব বলে উঠলো: তোমার মরণ হোক—এইজন্য তুমি আমাদের একত্রিত করেছ।

প্রকাশ্যভাবে প্রচার আরম্ভ করার পূর্বে হযরতের জন চল্লিশেক শিষ্য লাভ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দুঃস্থদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

কোরআনের কয়েক জায়গায় আছে ক্ষমতাগর্বী কোরেশ বিদ্রূপ করে বলছে, মক্কায় আর তায়েফে আল্লাহর বাণী লাভ হ'ল কিনা মোহম্মদের, সেখানকার কোনো প্রধানের তা লাভ হ'ল না, আর সেই বাণীর ধারক ও বাহক হ'ল তারা যাদের কিছুই নেই।

প্রকাশ্যভাবে এই ধর্মের প্রচার আরম্ভ করতে গিয়ে হযরতকে যে বাধার সম্মুখীন হতে হলো তা অত্যন্ত প্রবল। তাঁর স্বজাতি ছিল ক্ষমতা-গর্বে অন্ধ, আর ছিল ঘোর ইহবাদী - মৃত্যুকেই জীবনের শেষ এই ছিল তাদের স্থির ধারণা। কাজেই মৃত্যুর পরে কেয়ামতের দিনে তাদের পুনরায় জীবিত করা হবে, তাদের কৃত কার্যের বিচার হবে, আর তাদের নানা পাপের জন্য কঠিন শাস্তি লাভ হবে, এসব তাদের জন্য ছিল অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য কথা। কোরআনের বহু জায়গায় তার উল্লেখ আছে। হযরতের প্রচারিত এইসব কথা প্রথমতঃ তারা ঠাট্টা তামাসা করে উড়িয়ে দিতে চাইল ; বল্লে ঃ লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ; বল্লোঃ এসব সেকালের লোকদের গল্পগুজব ; বল্লে ঃ লোকটা গণৎকার। তবুও যখন দেখলে লোকেরা তাঁর কথার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তখন বল্লে ঃ লোকটা বড়দরের যাদুকর। স্বজাতির তরফ থেকে আসা এমন অপমান ও উপেক্ষা হযরতকে কতটা বিঁধতো কোরআনের বহু বাণীতে তারও পরিচয় আছে। কিন্তু হযরত অসাধারণভাবে শান্ত ও কোমল প্রকৃতির লোক হলেও সত্য প্রচারের ক্ষেত্রে ছিলেন অনমনীয়। কন্যা-হত্যা, অনাথ ও নিঃস্বদের প্রতি অবিচার, ব্যাপক দায়িত্বহীনতা, জাতির এইসব বড় বড় পাপের প্রতি উদাসীন থাকা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। ফলে অল্পদিনেই পরিস্থিতি কেমন ঘোরালো হলো কোরআনের বহু আয়াতে তার পরিচয় আছে। আমরা অতিপ্রাথমিক মক্কীয় সূরা আল্-কলম্ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

তোমার পালয়িতার অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। আর নিঃসন্দেহ তোমার পুরস্কার হবে অব্যাহত। আর নিঃসন্দেহে তুমি মহৎ চরিত্রের।

ফলে তুমি দেখবে আর তারাও দেখবে তোমাদের মধ্যে কে উন্মত্ত।

নিঃসন্দেহ তোমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট আর তিনি ভালো জানেন পথে চালিতদের।

অতএব অন্যায়কারীদের অনুবর্তী হয়ো না। তারা চায় তুমি নমনীয় হও তবে তারাও নমনীয় হবে।

আর অনুগত হয়ো না প্রত্যেক হীন শপথকারীর—নিন্দুকের, যে নিন্দা করে' বেড়াচ্ছে, কল্যাণের নিষেধকারীর, সীমা অতিক্রমকারীর, পাপীর, নীচের, এসব ভিন্ন, অসৎ চরিত্রের।

এই জন্য যে সে বিত্তবান আর সন্তানসন্ততিযুক্ত—যখন আমার নির্দেশাবলী তার কাছে পড়া হয় সে বলে: সেকালের লোকদের গল্প। আমি দাগ দেবো তার উঁচু নাকে।*

নিশ্চয় আমি তাদের পরীক্ষা করবো যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদের যখন তারা সংকল্প করেছিল যে তারা নিশ্চয় ভোরে ফসল কাটবে···

জাতির বহুদেববাদ হযরতের গভীর অসন্তোষের কারণ হয়েছিল তা বোঝা যায় সহজেই। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরো একটি বড় ব্যাপার। সেই ব্যাপারটি এই যে, তাঁর জাতির বিচিত্র প্রতিমা-পূজার সঙ্গে যোগ ঘটেছিল শুধু বিচিত্র অজ্ঞানতার নয়, বিচিত্র দুষ্কৃতিরও। কাজেই তার সঙ্গে কোনো আপোসের উপায় তিনি দেখেন নি। সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারকরা অর্থাৎ কল্যাণ প্রচারকরা অন্যায়ের প্রতিকার সম্বন্ধে আপোসহীন।

অল্পদিনেই কোরেশদের একটি গণ্যমান্য দল হযরতের চাচা আবু তালেবের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলে যে তাঁর ভাই-পো মোহম্মদ তাদের পূর্ব-পুরুষের ধর্ম, তাদের চিরাচরিত জীবনধারা, এসবের নিন্দা করছে, বলছে, এসব ভুল, আবুতালেব তাকে এসব বলতে নিষেধ করুন অথবা তাকে তাদের হাতে দিন। আবুতালেব নরম কথায় তাদের ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলেন। তারা সে-যাত্রায় চলে গেল।

* ওয়ালিদ্ বিন্ মুগিরার নাক ছিল উঁচু—বদরের যুদ্ধে সে নাকে আঘাত পায়।

কিন্তু হযরতের প্রচার চলতেই লাগল। এর পর অন্য একদিন কোরেশ প্রধানরা আবু তালেবকে এসে বল্লেঃ আবু তালেব, আমাদের মধ্যে তোমার মর্যাদা উঁচু, তোমাকে বলেছি তোমার ভাইপো'র কার্য-কলাপের কথা, কিন্তু তুমি কিছুই করো নি। আল্লাহ্‌র দিব্য আমাদের পূর্বপুরুষদের যে এমন নিন্দা করা হবে, আমাদের আচরণ নিয়ে তামাশা করা হবে, আমাদের দেবতাদের অপমান করা হবে, এ আমরা সহ্য করতে পারছি না। যদি তুমি তার কার্যকলাপ বন্ধ না কর তবে তোমাদের দুই জনের বিরুদ্ধেই আমরা যুদ্ধ করবো যে পর্যন্ত না একপক্ষ ধ্বংস হয়ে যায়।—ব্যাপারের গতি দেখে আবু তালেব দুঃখিত হলেন। তিনি হযরতকে ডাকালেন ও তাঁকে বল্লেন, আমাকে বাঁচাও আর নিজেও বাঁচো, আমার উপরে এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করার সাধ্য আমার নেই।—হযরতের মনে হলো তাঁর চাচা তাঁকে রক্ষার দায়িত্ব ত্যাগ করছেন। তিনি উত্তর দিলেনঃ চাচা, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাঁ হাতে চাঁদ দেয় এই শর্তে যে আমি এই প্রচারধারা ত্যাগ করবো তবু আমি এই ধারা ত্যাগ করবো না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ এই ধারাকে জয়ী করেন, অথবা আমার মৃত্যু হয়। বলে' তিনি কেঁদে ফেললেন ও উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর চাচা তাঁকে ডেকে বল্লেনঃ ভাইপো, ফিরে এসো। ফিরে এলে তিনি তাঁকে বল্লেনঃ যা তুমি ইচ্ছা করো প্রচার করো, আল্লাহ্‌র দিব্য আমি কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করবো না। ক

যখন কোরেশরা দেখলে আবু তালেব কিছুতেই মোহম্মদকে ত্যাগ করবেন না তখন উমারা নামের একজন সুদর্শন যুবককে সঙ্গে নিয়ে বল্লেঃ আবু তালেব, এই উমারা কোরেশদের মধ্যে সব চাইতে বলবান ও সুদর্শন যুবক, তুমি তাকে আপন পালিত পুত্র

ক ইবনে ইস্‌হাক দ্রষ্টব্য

রূপে গ্রহণ করো আর যে আমাদের ধর্ম আমাদের পূর্বপুরুষের আচার এ সবের বিরুদ্ধাচারী, আমাদের স্বজাতির ঐক্যকে যে নষ্ট করেছে, তোমার সেই ভাই-পো-কে আমাদের দাও, আমরা তাকে হত্যা করবো, আমরা প্রাণের বদলে প্রাণ দিচ্ছি। আবু তালেব বল্লেনঃ আল্লাহ্‌র দিব্য, এক নিন্দনীয় কাজের ভার আমার উপরে তোমরা চাপিয়েছ। তোমরা তোমাদের সন্তানকে আমাকে দিচ্ছ তাকে আমি খাওয়াবো পরাবো সেই জন্য আর আমার সন্তানকে তোমরা নিচ্ছ তাকে হত্যা করার জন্য! আল্লার শপথ, এ কখনো হবে না।—এমনি ক'রে অবস্থা দিন দিন আরো ঘোরালো হতে লাগলো।

এর পর কোরেশদের কাজ হলো যারা মুসলমান হয়েছিল তাদের উপরে অত্যাচার চালানো। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা তাদের মধ্যেকার মুসলমানদের উপরে মারধোর শুরু করলো। অসহায় দাসদের উপরে তো লোমহর্ষণ অত্যাচার চলতে লাগলো। "মোস্তফা-চরিতে" তার কিছু কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। এই পরিস্থিতিতে আবু তালেব হাশিম ও মোত্তালেব বংশের স্বজনদের ডেকে বললেন মোহম্মদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাকে সহায়তা করতে। তারা সবাই সম্মত হলো—আবু লাহাব ভিন্ন।

তাঁর গোষ্ঠীর লোকদের আনুকূল্য

মনীষী ইবনে খলদুন তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস-তত্ত্ব 'মুকাদ্দিমা'য় বলেছেন, কোনো ব্যাপক কর্মব্রত উদযাপনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় এই যে সেই প্রচেষ্টা সমর্থন পাবে একটি সুসংবদ্ধ দলের। এই সম্পর্কে তিনি হযরতের প্রতি তাঁর স্বজনগণের আনুকূল্য দানের উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায় সত্যের পরিমাণ যথেষ্ট, কেন না হযরতকে হত্যা করতে কোরেশরা সাহস করেনি তাঁর রক্ষার জন্য তাঁর স্বজনরা যে সংঘবদ্ধ ছিল সেই কারণে। তাহলেও হযরতকে নানাভাবে নিগৃহীত করতে কোরেশরা কসুর করে নি। একদিন কাবায় কোরেশরা হযরতের উপরে এমনি নিগ্রহ চালিয়েছিল।

সৌভাগ্যক্রমে তখন আবু বকর সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাদের হাত থেকে হযরতকে নিষ্ক্রান্ত করেন। কিন্তু হযরতকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি নিজে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করেন।

হাম্‌যার ইসলাম গ্রহণ

অন্য একদিন আবু জেহেল হযরতকে খুব অবমাননাকর কথা বলে, তাঁর প্রচারিত ধর্মের কুৎসা করে, ও এই ভাবে তাঁকে যারপর নাই অপমান করে। কিন্তু হযরত একটি কথাও না বলে আবু জেহেল ও তার দলবলের কাছ থেকে বাড়ী চলে যান। আবদুল মোত্তালেবের কনিষ্ঠ পুত্র বীরবর হাম্‌যা তখন শিকার করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এলে একজন মুক্তিপ্রাপ্তা দাসী হাম্‌যাকে বলে আবু জেহেল কিভাবে হযরতকে অপমান করেছে, আর দুঃখ প্রকাশ করে এই বলে' যে তাঁর সহায়-স্বজন থাকতেও তাঁকে এমন লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। হাম্‌যা কালবিলম্ব না ক'রে কাবায় আবু জেহেল যেখানে বসে ছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন আর সোজা তার সামনে গিয়ে তাঁর ধনুক দিয়ে তাকে জোরে আঘাত করে' বলেন ঃ তুমি কি তাকে অপমান করবে যখন আমি তার ধর্ম গ্রহণ করবো আর বলবো সে যা বলে ? যদি পার আমাকে প্রতিঘাত করো। আবু জেহেলকে সাহায্য করার জন্য কেউ কেউ দাঁড়ালো, কিন্তু আবু জেহেল বল্লে ঃ হাম্‌যাকে কিছু বোলো না, আল্লাহ্‌র শপথ আমি তার ভাই-পোকে খুব অপমান করেছি। এরপর হাম্‌যা অচিরে ইসলাম গ্রহণ করেন, আর তার ফলে হযরতের পক্ষের বলবৃদ্ধি হয়।

উৎবা বিন্ রাবিয়া-র প্রচেষ্টা

হযরতের অনুবর্তীদের দল শক্তিশালী হচ্ছে দেখে উৎবা বিন্ রাবিয়া নামে একজন কোরেশ-প্রধান কৌশলে হযরতকে বশীভূত করার কথা ভাবে। কোরেশদের সম্মতি নিয়ে সে হযরতের কাছে গিয়ে বলে ঃ ভাই-পো, তুমি আমাদের আপন জন, আমাদের মধ্যে সব চাইতে সেরা

বংশের সন্তান, তুমি তোমার জাতির কাছে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে এসেছ যার ফলে তোমার জাতির লোকদের মধ্যে মনান্তর দেখা দিয়েছে ; তাদের আচার-আচরণকে তুমি বিদ্রূপ করছ, তাদের দেবতা ও ধর্ম সম্বন্ধে অপমানকর কথা বলছ, আর তাদের পূর্বপুরুষদের বলছ ধর্মহীন ; সেজন্য আমি কিছু বলতে চাচ্ছি, তুমি তা শোনো, হয়রত আমার কোনো কথা তুমি গ্রহণ করতে পারবে। হযরত তার কথা শুনতে স্বীকৃত হলে সে বল্লে ঃ যদি তুমি অর্থ চাও তবে আমরা অর্থ সংগ্রহ ক'রে তোমাকে আমাদের মধ্যে সব চাইতে ধনী করবো, যদি সম্মান চাও, তবে তোমাকে আমাদের প্রধান করবো, তোমার কথার উপরে কারো কথা চলবে না, যদি রাজত্ব চাও তবে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা করবো. আর যে ভূতটা তোমার কাছে আসে, যাকে তুমি দেখো, যদি তার হাত থেকে রেহাই পেতে না পারো তবে আমরা তোমার জন্য চিকিৎসক ডাকবো আব আমাদের যথাসাধ্য ব্যয় করে' তোমার চিকিৎসা করাবো। এই ধরনের কথা সে অনেকক্ষণ ধরে' বললো। হযরত ধীর ভাবে তার কথা শুনে বল্লেন ঃ এখন আমার কথা শোনো। এই বলে তিনি কোরআন শরীফের 'হা মীম' সূরার সূচনা থেকে পড়তে আরম্ভ করলেন ঃ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

হা-মীম—প্রশংসিত মহিমময় আল্লাহ্‌। একটি অবতরণ করুণাময় কৃপাময় থেকে—একটি গ্রন্থ যার নির্দেশগুলো স্পষ্ট করা হয়েছে ; একটি আরবী কোরআন্ (ভাষণ) সেই লোকদের জন্য যারা জানে—সুসংবাদ ও স্মারক, কিন্তু তাদের অনেকেই ফিরে যায়, ফলে তারা শোনে না। আর তারা বলে ঃ আমাদের হৃদয় আবরণে রক্ষিত তা থেকে যাতে তুমি (হে মোহম্মদ) আমাদের ডাকো, আর আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা, আর আমাদের ও তোমার মধ্যে রয়েছে একটি পর্দা, সেজন্য কাজ করে যাও আমরাও কাজ করছি।

বলো ঃ আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র, আমাতে প্রত্যাদিষ্ট হয় যে তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য, সেজন্য তাঁর দিকে সরল পথে চলো আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর দুর্ভাগ্য বহুদেববাদীরা—

যারা যাকাত দেয় না, আর তারা অবিশ্বাসী পরলোক সম্বন্ধে।

নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার যা রুদ্ধ হবে না।

হযরত আবৃত্তি করে' চল্লেন। উৎবা তার পিঠের দিকে দুই হাত রেখে তার উপরে ভর করে' মন দিয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলো। হযরত আবৃত্তি করতে করতে ৩৭ সংখ্যক আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন। সেই আয়াতটি এই ঃ

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত হচ্ছে রাত্রি ও দিন আর সূর্য ও চন্দ্র ; সেজদা (প্রণতি) কোরো না সূর্যকে ও চন্দ্রকে, আর সেজদা করো আল্লাহ্‌কে যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন যদি তাঁরই উপাসনা তোমরা করো।

এই আয়াত পাঠ করার পরে হযরত সেজদা করলেন। তারপর উৎবাকে বল্লেন ঃ ওলিদের পিতা, তুমি তো শুনলে, এর পর কি করবে তা তোমার উপরে নির্ভর করছে। উৎবা যখন তার দলবলের কাছে ফিরে গেল তারা তার মুখে একটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ভাব লক্ষ্য করলো—তারা জানতে চাইল কি ঘটেছে। উৎবা বল্লে সে এমন সব কথা শুনেছে যা পূর্বে কখনো শোনে নি, সে সব কবিতা নয়, মন্ত্র নয়, জাদুও নয়। সে বল্লে ঃ আমার কথা শোনো আর আমি যা করছি তাই করো—এই লোককে তার মতো থাকতে দাও, আল্লাহ্‌র শপথ, যে সব কথা আমি শুনেছি তা দিকে দিকে প্রচারিত হবে, যদি অন্য আরবরা তাকে হত্যা করে তবে অন্যেরাই তার হাত থেকে তোমাদের অব্যাহতি দিলে, আর যদি সে আরবদের উপরে জয়ী হয় তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদের রাজত্ব তার ক্ষমতা হবে তোমাদের ক্ষমতা আর তার ভিতর দিয়ে তোমাদের সুদিন আসবে।

তারা বল্লে ঃ সে তার কথা দিয়ে তোমাকে ভুলিয়েছে। উৎবা বল্লে ঃ আমার মত তোমাদের জানালাম—যা ভালো বোঝো করো।

কোরেশদের বিচিত্র প্রচেষ্টা

এরপর কোরেশরা চেষ্টা করলে নানা তর্ক তুলে হযরতকে তাঁর প্রচার থেকে নিবৃত্ত করতে। তারা হযরতকে অর্থ দেবার ক্ষমতা দেবার প্রলোভন দেখালে, তিনি বার বার সেসব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তারা বল্লে ঃ মোহম্মদ, তুমি তো আমাদের কোনো কথাই শুনছ না, আচ্ছা তুমি তো জানো কোনো জাতিরই আমাদের চাইতে চাষের জমি ও পানীয় জল কম নেই আর আমাদের চাইতে কষ্টে কেউ দিন কাটায় না, তাহলে তোমার যে প্রভু তোমাকে পাঠিয়েছেন তিনি এই পাহাড়গুলো আমাদের চারিদিক থেকে দূর ক'রে দিন, আর আমাদের দেশকে সমতল করুন, আর তাতে সিরিয়া ও ইরাকের মতো নদী বইয়ে দিন, আর আমাদের সেকালের সম্মানিত গোষ্ঠীপতি কুসাঈ-বিন্-কিলাবকে পুনর্জীবিত করুন আর তিনি এসে আমাদের বলুন তুমি যা বলছ তা সত্য কি না, তাহলে তোমার কথা আমরা বিশ্বাস করবো, আমরা জানবো আল্লাহ্‌র কাছে তোমার কি মর্যাদা, আর সত্যই তিনি তোমাকে একজন রসুল (বাণীবাহক) ক'রে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। হযরত উত্তর দিলেন ঃ তিনি এসবের জন্য প্রেরিত হন নি ; তিনি তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ্‌র বাণী, তারা তা গ্রহণ করে' লাভবান হতে পারে অথবা প্রত্যাখ্যান করে' আল্লাহ্‌র বিচারের প্রতীক্ষা করতে পারে। কোরেশরা বল্লে ঃ তিনি (হযরত) যদি তাদের জন্য কিছু না করতে পারেন তবে নিজের জন্য কিছু করুন—আল্লাহ্‌কে তিনি বলুন যে তিনি তাঁর জন্য একজন ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে দিন তাঁর কথার সমর্থন করতে আর তাদের কথার প্রতিবাদ জানাতে, অথবা তাঁর জন্য তৈরি করে দিক বাগান ও প্রাসাদ, আনুক তাঁর জন্য সোনা রূপা তাঁর অভাব দূর করতে কেন না তিনি তাদেরই মতো রাস্তায় ঘোরেন আর তাদেরই মতো জীবিকার সংস্থানের চেষ্টা করেন, এসব যদি করা হয়

তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ হবে আর তাঁকে সত্যকার নবী বলে’ জানবে। হযরত বল্লেন ঃ তিনি এসব করবেন না, এমন সব জিনিস চাইবেনও না, কেন না এসবের জন্য তিনি প্রেরিত হন নি। তারা বল্লে ঃ তবে আকাশ আমাদের উপরে ভেঙে পড়ুক যেমন তুমি বলো যে আল্লাহ্‌ তাই করবেন যদি তাঁর ইচ্ছা হয়—তা না হলে আমরা তোমাতে বিশ্বাস করবো না। হযরত বল্লেন ঃ এ আল্লাহ্‌র ব্যাপার, তিনি যদি চান তোমাদের এমন শাস্তি দেবেন, তবে তা তিনি দেবেন।

এসব ভিন্ন আরো অনেক অদ্ভুত প্রস্তাব কোরেশরা হযরতের কাছে করে। যেমন—আকাশে মৈ লাগিয়ে তুমি তাতে ওঠো, আর চারজন ফেরেশতা তোমার সঙ্গে এসে বলুক যে তুমি সত্য কথা বলছ, আর আল্লাহ্‌র শপথ, এসব যদি করতে পারো তবুও যে তোমাতে বিশ্বাস করতে পারবো তা মনে হয় না।

বলা বাহুল্য জাতির এমন অর্থহীন বিরোধিতা হযরতকে মর্মাহত করেছিল। এরপর কোরেশরা মদিনায় গিয়ে ইহুদিদের সঙ্গে পরামর্শ করে আর তাদের নির্দেশ মতো অনেক কূট তর্ক তুলে হযরতকে বিব্রত করতে চেষ্টা করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানদের প্রথম দেশত্যাগ

হযরতের অনুবর্তীদের উপরে, বিশেষ করে যারা অপেক্ষাকৃত অসহায় তাদের উপরে, যে ঘোর অত্যাচার চলেছিল তার কথা আমরা জেনেছি। হযরত আবু বকর এমন কিছু সংখ্যক অসহায় ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে তাদের দুর্গতির অবসান ঘটান। কিন্তু অনেকের উপরে অত্যাচার চলতেই থাকে। শিষ্যদের এমন দশা দেখে হযরত সহজেই চিন্তিত হলেন। তিনি তাদের আবিসিনিয়ায় চলে যাবার প্রস্তাব করলেন; বল্লেন: সেখানকার রাজা অন্যায় অত্যাচারের পক্ষপাতী নন, ওদেশ মিত্রভাবাপন্ন, আল্লাহ্ যত দিন না তোমাদের দুঃখ দূর করেন তত দিন সেখানে গিয়ে থাকো। হযরতের উপদেশ অনুসারে তাঁর নবীত্ব লাভের পঞ্চম বৎসরে বারো জন পুরুষ ও চার জন নারী আবিসিনিয়ায় যাওয়ার জন্য গোপনে প্রস্তুত হলো। কোরেশ যখন তাদের দেশত্যাগের কথা জানতে পেলে তখন তাদের পিছনে ধাওয়া করলো, কিন্তু তার পূর্বেই তারা বন্দর ত্যাগ করতে পেরেছিল।

প্রথম দলের পরে আবু তালেবের পুত্র জাফরের নেতৃত্বে আরো অনেকে আবিসিনিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হলো। ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন: ছেলেপিলে বাদ দিয়ে আনুমানিক ৮৩ জন লোক আবিসিনিয়ায় গিয়েছিল।

প্রবাসী মুসলমানেরা আবিসিনিয়ায় কয়েক মাস কাটাবার পরে শুনতে পায় যে মক্কার কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই সংবাদ পেয়ে তাদের কেউ কেউ গোপনে মক্কায় আসে, আর জানতে পারে সংবাদটি সত্য নয়।

এরপর হযরতের উপদেশে প্রায় এক শত জন মুসলমান নরনারী বিভিন্ন সময়ে আবিসিনিয়ায় যায়।

কোরেশরা যখন দেখলে যে হযরতের অনেক শিষ্য আবিসিনিয়ায় গিয়ে বসবাস করছে ও নিরাপদে আছে তখন তারা সংকল্প আঁটলো তাদের ফিরিয়ে আনবার ও তাদের ধর্মান্তরিত করবার। সেই উদ্দেশ্যে তারা তাদের মধ্যেকার দুই জন কূটনীতিজ্ঞকে আবিসিনিয়ায় পাঠালো। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী ও তাঁর সেনাপতিদের জন্য মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাতে তারা অবশ্য ভোলেনি। মক্কার চামড়ার কাজের খুব খ্যাতি ছিল। তারা বহু চামড়া সংগ্রহ করলো যেন প্রত্যেককে কিছু কিছু উপহার দিতে পারে।

কূটনীতিকরা প্রথমেই উপহার দিল সেনাপতিদের ও তাদের বল্লেঃ আমাদের কতকগুলো নির্বোধ লোক মহামান্য নাজ্জাশীর দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্ম বিসর্জন দিয়েছে কিন্তু আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করেনি, তারা এক নতুন ধর্মের উদ্ভাবন করেছে যার কিছুই আমরাও বুঝি না আপনারাও বোঝেন না; আমাদের প্রধানরা আমাদের নাজ্জাশী মহোদয়ের কাছে পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাদের ফেরত পাঠান সেজন্য আমরা যখন মহামান্য নাজ্জাশীর কাছে দরবার করবো তখন সেনাপতি মহোদয়েরা যেন এই ধর্মত্যাগীদের কোনো কথা না শুনে আমাদের কাছে তাদের ফিরিয়ে দেন, কেননা তাদের দেশের লোকেরাই তাদের দোষ সম্বন্ধে সব চাইতে বেশি ওয়াকিফহাল। কূটনীতিকরা এইভাবে কথা বললে কেননা তারা চাচ্ছিল না যে মুসলমানদের বক্তব্য কি আছে নাজ্জাশী তা জানুন। সেনাপতিরা সেইভাবে নাজ্জাশীর কাছে কথা তুললো। কিন্তু নাজ্জাশী অসন্তুষ্ট হয়ে বল্লেনঃ না—ঈশ্বরের শপথ, আমি তাদের এদের হাতে ছেড়ে দেবো না; যারা আমার আশ্রয় নিয়েছে, আমার দেশে বসবাস করছে, আমার কাছে আসাই ভালো মনে করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এই সব লোকের কি অভিযোগ আছে তা না জেনে আমি তাদের হাতে এদের দিয়ে দেবো না ও তাদের জাতির কাছে তাদের পাঠিয়ে দেবো না; অধিকন্তু তারা যা বলছে তা যদি মিথ্যা হয় তবে আমি

তাদের রক্ষা করবো আর দৃষ্টি রাখবো যেন তারা আমার এখানে আশ্রয় পায়।*

এর পর নাজ্জাশী হযরতের অনুবর্তীদের ডাকালেন। তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলে কি তারা বলবে আর সংকল্প গ্রহণ করলো যে তারা বলবে যা তারা জানে আর হযরত তাদের যা আদেশ করেছেন— তাতে যা হয় হোক। তারা সভায় প্রবেশ করে' দেখলে রাজা তাঁর ধর্মযাজকদের আহ্বান করেছেন, তাঁরা তাঁদের পবিত্র গ্রন্থ খুলে তাঁর চারপাশে বসেছেন। রাজা জানতে চাইলেন কি সেই ধর্ম যার জন্য তারা নিজেদের জাতিকে পরিত্যাগ করেছে আর নাজ্জাশীর ধর্মে বা অন্য ধর্মে প্রবেশ করে নি। নাজ্জাশীর কথায় আবু তালেবের পুত্র জাফর যে উত্তর দিলেন ইসলামের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বল্লেন ঃ

হে রাজন্, আমরা ছিলাম এক সভ্যতাবর্জিত জাতি, প্রতিমাদের পূজা করতাম, মৃত পশু ভক্ষণ করতাম, অনেক ঘৃণিত কাজ করতাম, স্বাভাবিক স্নেহবন্ধনের মর্যাদা রক্ষা করতাম না, অতিথিদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতাম, আর আমাদের সবলরা দুবলদের সর্বস্বান্ত করতো। এইভাবেই আমরা চলেছিলাম যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে পাঠালেন এক রসুল যাঁর বংশমর্যাদা, সত্যপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও সদয়তা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই। তিনি আমাদেব আহ্বান করলেন আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করতে এবং তাঁর বন্দনা করতে আর পাথর ও মূর্তি-পূজা বিসর্জন দিতে যা আমাদের পূর্বপুরুষরা ও আমরা এতদিন ধরে করে আসছিলাম। তিনি আমাদেব নির্দেশ দিলেন সত্য কথা বলতে, অঙ্গীকার পালন করতে, রক্তের বন্ধন ও সদয় আতিথেয়তা সম্বন্ধে মনোযোগী হতে, আর অপরাধ ও রক্তপাত পরিহার করতে, তিনি আমাদের আদেশ করেছেন অশালীন আচরণ না করতে, মিথ্যা না বলতে, অনাথদের ধনসম্পত্তি গ্রাস না করতে, আর সাধ্বী রমণীদের কুৎসা না রটাতে। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দনা

* ইবনে ইস্‌হাক দ্রষ্টব্য

করতে আর তাঁর সঙ্গে কোনো অংশী দাঁড় না করাতে। আর তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন নামাযের আর যাকাতের আর রোযা পালনের। তাঁর আনা সত্য আমরা স্বীকার করেছি, আমরা তাঁতে বিশ্বাসী, আমরা তার অনুসরণ করি যা তিনি এনেছেন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। আর আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দনা করি তাঁর সঙ্গে কিছুকে অংশী দাঁড় না করিয়ে। আমরা নিষিদ্ধ জ্ঞান করি যা তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন, আর আমরা বৈধ জ্ঞান করি যা তিনি বৈধ বলো ঘোষণা করেছেন। এসব কারণে আমাদের জাতির লোকেরা আমাদের আক্রমণ করেছে, আমাদের প্রতি কঠোর হয়েছে, আমাদের ধর্ম থেকে আমাদের ফিরিয়ে নেবার আর এক আল্লাহ্‌র উপাসনার পরিবর্তে পুনরায় প্রতিমা-পূজায় আমাদের রত করতে চেয়েছে। আর যেসব কুক্রিয়া আমরা পূর্বে করতাম তাই আমাদের জন্য বৈধ করতে যত্নবান হয়েছে। সেইজন্য যখন আমরা আর তাদের সঙ্গে পেরে উঠলাম না, আমাদের প্রতি তারা দুর্ব্যবহার করেই চললো আর আমাদের প্রতিদিনের জীবন দুর্বহ করলো, আমাদের ধর্মের প্রতিবন্ধকতা ঘটালো, তখন আমরা আপনার দেশে হিজরত করলাম, অন্য কারো চাইতে আপনার আশ্রয় নেওয়া বেশি ভালো মনে করলাম। আমরা আপনার আশ্রয়ে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করছি, আর মহারাজ, আমরা আশা করি যে আপনার রাজত্বে আমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

অল্পদিনেই হযরতের শিক্ষা তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে কেমন সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছিল জাফরের এই ভাষণে তার পরিচয় রয়েছে।

নাজ্জাশী জিজ্ঞাসা করলেন প্রত্যাদেশ যা তারা পেয়েছে তার কিছু তাদের কাছে আছে কি না। জাফর বল্লেন ঃ- আছে। তখন নাজ্জাশী তা পড়তে তাঁকে আদেশ করলেন। তখন তিনি কোরআনের ১৯ সংখ্যক সূরা মরিয়ম থেকে একটি অংশ পড়ে শোনালেন। শুনে নাজ্জাশীর চোখে জল ঝরলো, তাঁর শ্মশ্রু সিক্ত হলো, প্রধান ধর্মযাজকরাও অশ্রু মোচন করলেন। তার পর নাজ্জাশী বল্লেন ঃ এটি আর যীশু যা

এনেছিলেন তা একই স্থান থেকে। মক্কার প্রতিনিধিদের তিনি বল্লেন ঃ তোমরা চলে যেতে পারো, ঈশ্বরের শপথ আমি কখনো তাদের তোমাদের হাতে ছেড়ে দেবো না, তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও করবো না।

পরদিন ভোরে মক্কার প্রতিনিধিদের একজন গিয়ে রাজাকে বললে যে মুসলমানেরা মরিয়ম-পুত্র যীশুর সম্বন্ধে এক ভয়ঙ্কর উক্তি করে, মহারাজ তাদের কাছ থেকে সেকথা শুনুন। যথা সময়ে মুসলমানদের দরবারে ডাক পড়লো আর রাজার প্রশ্নের উত্তরে জাফর বল্লেন ঃ আমরা হযরত ঈসা সম্বন্ধে তাই বলি যে বাণী আমাদের রসুল এনেছেন—ঈসা আল্লাহ্‌র দাস ও তাঁর রসুল, তাঁর প্রেরণা, তাঁর বাণী, যা তিনি পুণ্যময়ী কুমারী মেরীতে নিক্ষেপ করেছিলেন। নাজ্জাশী ভূমি থেকে একটি কাঠি উঠিয়ে বল্লেন ঃ ঈশ্বরের শপথ, মরিয়ম-তনয় যীশু সম্বন্ধে তোমরা যা বলছ তিনি তার চাইতে এই কাঠির পরিমাপেও বেশি নন। এই বলে' নাজ্জাশী মক্কার প্রতিনিধিদের দেওয়া সব উপহার ফিরিয়ে দিলেন। তারা তাদের উপহার ফেরত নিয়ে মলিন মুখে ফিরে গেল।

ইব্‌নে ইসহাকে আছে, নাজ্জাশী হযরতের রসুলত্বে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে হযরত তাঁর আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

ওমরের ইসলাম গ্রহণ

মুসলমানদের একটি বড় দলের আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নেবার পরের বড় ঘটনা খাত্তাবের পুত্র স্বনামখ্যাত ওমরের ইসলাম গ্রহণ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ওমর হযরতের প্রতি ও মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন আর পূর্বপুরুষের ধর্মে একান্ত আস্থাবান ছিলেন; তার কিছু কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইব্‌নে-ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ওমরের ভগিনী ফাতেমা ও ফাতেমার স্বামী সঈদ দুই জনই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ওমরের কাছ থেকে তা তারা লুকিয়ে রেখেছিল। একদিন ওমর তলোয়ার হাতে যাত্রা করলেন হযরত ও তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে। তাঁরা জন চল্লিশেক সাফা অঞ্চলের আকরম নামক এক ভক্তের বাড়ীতে অবস্থিতি করছিলেন; হযরতের সঙ্গে ছিলেন হাম্যা, আবু বকর, আর আলী। পথে নাইম্ নামে এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ওমরের দেখা হল, নাইম্ও গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। নাইম্ ওমরকে জিজ্ঞাসা করলে, সে কোথায় যাচ্ছে। ওমর বল্লেন: আমি যাচ্ছি ধর্মদ্রোহী মোহম্মদকে হত্যা করতে—সে কোরেশদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়েছে, তাদের এতদিনের জীবনধারাকে তামাশায় পরিণত করেছে, তাদের দেবতা ও ধর্মবিশ্বাসকে অপমান করেছে। নাইম বল্লে: তুমি নিজেকে মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছ, তুমি কি মনে করো মোহম্মদের বংশের লোকেরা তোমাকে জীবন্ত রাখবে যদি তুমি তাকে হত্যা করো? তার চাইতে বরং তোমার পরিজনদের মধ্যে কি ঘটেছে সেদিকে নজর দাও। ওমর বল্লেন: কি হয়েছে আমার পরিজনদের? নাইম বল্লে: তোমার ভগিনী ও ভগিনীপতি মুসলমান হয়েছে ও মোহম্মদের দলভুক্ত হয়েছে; কাজেই তুমি বরং গিয়ে তাদের যা করবার তা করো। শুনে ওমর তাঁর ভগিনী ও ভগিনীপতির বাড়ীতে গেলেন। খাব্বাব নামে একজন মুসলমান তখন ওমরের বোন ও ভগিনীপতিকে কোরআন্ শরীফের সূরা তা-হা থেকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। ওমরের গলার আওয়াজ পেয়ে তিনি বাড়ীর একটি ছোট কামরায় লুকোলেন, ফাতেমা সূরা তা-হা-র পাণ্ডুলিপি তার উরুর নীচে রাখলো। ওমর বল্লেন: কি পড়া হচ্ছিল——শুনলাম? তারা বল্লে: কিছুই না। ওমর বল্লেন, আমি শুনেছি তোমরা মোহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছ, বলে' তিনি সঈদকে ধরলেন। ফাতেমা স্বামীর সাহায্যে অগ্রসর হলে ওমর তাকে আহত করলেন। এর পর তারা দুইজন বল্লে: হাঁ আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহ্‌তে ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করি, তুমি যা পারো করো। ওমর যখন দেখলেন তাঁর

বোন রক্তাক্ত হয়েছে তখন তিনি নিজের আচরণে খুব দুঃখিত হলেন। তিনি তাঁর বোনকে বল্লেন ঃ যা তোমরা এখন পড়ছিলে তা আমাকে দাও, দেখি মোহম্মদ কি এনেছে। ওমর পড়তে জানতেন। তাঁর বোন বল্লে তাঁর হাতে কোরআনের পাণ্ডুলিপি দিতে সে ভরসা পাচ্ছে না। ওমর বল্লেন ঃ ভয় পেয়ো না। তিনি তাঁর দেবতাদের নামে শপথ করলেন যে পড়ে পাতাগুলো তিনি ফেরত দেবেন। ফাতেমার মনে ভরসা হলো হয়ত ওমর মুসলমান হবেন। তিনি বল্লেন ঃ তুমি পৌত্তলিক, শুচি অশুচি মানো না, কেবল যারা শুচি তারাই কোরআন স্পর্শ করতে পারে। তখন ওমর উঠে গিয়ে নিজেকে ধৌত করলেন; ফাতেমা তাঁকে সূরা তা-হা-র পাতাটি দিলেন। † কিছুদূর পড়েই তিনি বল্লেন ঃ কি চমৎকার, কি মহৎ ভাবপূর্ণ বাণী। এই কথা শুনে খাব্বাব লুকোনো স্থান থেকে বেরিয়ে বল্লেন ঃ ওমর, আল্লাহর শপথ, রসুলের আহ্বানে আল্লাহ তোমাকে নির্বাচিত করেছেন, কেননা গত রাত্রে আমি শুনছিলাম তিনি বলছেন ঃ আল্লাহ, ইসলামকে শক্তিশালী করো, আবুল হাকামের (আবু জেহেলের) দ্বারা অথবা খাত্তাবের পুত্র ওমরের দ্বারা। ওমর, আল্লাহর কাছে এসো, আল্লাহর কাছে এসো। তখন ওমর বল্লেন ঃ আমাকে মোহম্মদের কাছে নিয়ে যাও। খাব্বাব বল্লেন ঃ হযরত আছেন সাফা-অঞ্চলে ভক্ত-পরিবেষ্টিত হয়ে। ওমর তলোয়ার নিয়ে চল্লেন হযরত ও তাঁর সঙ্গীরা যেখানে ছিলেন সেখানে ও এসে দরজায় ঘা দিলেন।

† সূরা তা-হা-র প্রথম ১৬টি আয়াত এই—

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ তা-হা—হে মানব,

২ আমি তোমার কাছে কোরআন অবতীর্ণ করি নি যে তুমি বিপন্ন বোধ করবে—

৩ (অবতীর্ণ করি নি) স্মারকরূপে ভিন্ন তার কাছে যে ভয় করে,—

৪ একটি অবতরণ তাঁর কাছ থেকে যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী আর উঁচু আকাশ;—

৫ করুণাময় সুপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনের উপরে।

৬ তাঁরই যা আছে আকাশে, আর যা আছে পৃথিবীতে, আর যা আছে দুয়ের মধ্যে, আর যা আছে ভিজে মাটির নীচে।

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে একজন সাহাবী (সঙ্গী) দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন ওমর তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে, তিনি ভীত হয়ে হযরতকে বল্লেন সে কথা। হামযা বল্লেন ঃ তাকে আসতে দাও, যদি সে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তবে তাকে আমরা স্বাগত জানাব, কিন্তু যদি মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে এসে থাকে তবে তার তলোয়ার দিয়েই তাকে হত্যা করবো। হযরত ওমরকে আসবার অনুমতি দিলেন। হযরত উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে ওমরের কোমরবন্ধ ধরে জোরে টেনে নিয়ে বল্লেন ঃ কেন তুমি এসেছ হে খাত্তাবের পুত্র? আল্লাহ্‌র শপথ, আমার মনে হয় না তুমি তোমার অত্যাচার থামাবে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তোমার উপরে বিপদ আনেন। ওমর বল্লেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসুল, আমি আপনার কাছে এসেছি আল্লাহ্‌তে আর তাঁর রসুলে বিশ্বাস জানাতে আর রসুল যা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এনেছেন তাতে। রসুল তখন সজোরে বলে'

---

৭ আর যদি কথা জোরে বলো তবে নিঃসন্দেহ তিনি গোপনের জ্ঞাতা, আর তার চাইতেও যা লুকানো।

৮ আল্লাহ্—নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন, তাঁরই শ্রেষ্ঠ নামসমূহ।

৯ আর মূসার কাহিনী কি তোমার কাছে এসেছে?

১০ আর তিনি যখন আগুন দেখলেন তিনি তাঁর পরিজনদের বল্লেন ঃ থামো, নিঃসন্দেহ আমি একটি আগুন দেখছি, সম্ভবতঃ তার থেকে তোমাদের জন্য আনতে পারবো একটি জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা আগুনের কাছ থেকে একটি পথনির্দেশ পাবো।

১১ আর যখন তিনি তার কাছে এলেন তাঁকে নাম ধরে ডাকা হলো ঃ হে মূসা,

১২ নিঃসন্দেহ আমি তোমার পালয়িতা সেজন্য তোমার জুতো খুলে ফেলো, যেহেতু নিঃসন্দেহ তুমি তুওয়া-র পবিত্র উপত্যকায়,

১৩ আর আমি তোমাকে নির্বাচিত করেছি, সেজন্য শোনো যা তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়,

১৪ নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্, কোনো উপাস্য নেই আমি ভিন্ন, সেজন্য আমার বন্দনা করো, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো আমার স্মরণে,

১৫ নিঃসন্দেহ সেই সময় আসছে কিন্তু আমি চাই তা গোপন রাখতে যেন প্রত্যেক প্রাণ পুরস্কৃত হতে পারে যার জন্য সে চেষ্টা করে।

১৬ সেজন্য যে এতে বিশ্বাস করে না, আর তার কামনার অনুবর্তী হয়, সে তোমাকে এ থেকে না ফেরাক, তাহলে তুমি বিফল হবে।

উঠলেন আল্লাহু আকবর (আল্লাহ্ মহোত্তম)। ভক্তরাও জয়ধ্বনি করলেন—আল্লাহু আকবর। এই প্রথম ইসলামে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারণ।

ইব্‌নে ইসহাকে আছে, ওমর মুসলমান হয়ে সেই রাত্রে ভাবলেন, যে ইসলামের সব চাইতে বড় শত্রু তার কাছে গিয়ে তিনি বলবেন তিনি মুসলমান হয়েছেন। পরের দিন ভোরে তিনি গিয়ে আবু জেহেলের দরজায় ঘা দিলেন। আবু জেহেল তাঁকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কেন তিনি এসেছেন। তিনি বল্লেন: আমি এসেছি তোমাকে এই সংবাদ দিতে যে আমি আল্লাহ্‌তে ও তাঁর রসুল মোহম্মদে আর তিনি যা এনেছেন তাতে বিশ্বাসী হয়েছি। আবু জেহেল তাঁর মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে বল্লে: আল্লাহ্ ধ্বংস করুন তোমাকে আর তুমি যা এনেছ তা।

ইসলাম গ্রহণের পরে হযরত ওমরকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি আদৌ দমেন নি।

ইসলাম গ্রহণের কয়েক দিন পরে হযরত ওমর আকরমের গৃহে গিয়ে প্রস্তাব করেন যে মুসলমানদের প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্‌র আরাধনা করা উচিত। হযরত তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেন আর তাঁর সঙ্গীরাও সন্তুষ্ট হন। তখন দলবদ্ধভাবে তাঁরা কাবায় গিয়ে নামায পড়েন।

কোরেশদের বিরোধিতায় হযরতের অন্তর্বেদনা আমরা জেনেছি। যেসব মুসলমান আবিসিনিয়ায় গিয়েছিল তাদের একটি দল মক্কায় ফিরে এসেছিল এই সংবাদ শুনে যে কয়েকজন কোরেশ-প্রধান ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা এসে জানতে পারে সংবাদটি ঠিক নয়। এই বহু-আলোচিত ব্যাপারটি সম্পর্কে ইব্‌নে ইস্‌হাকের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে:

যখন রসুল দেখলেন তাঁর জাতির লোকেরা তাঁর দিক থেকে সম্পূর্ণ-ভাবে মুখ ফিরিয়েছে তখন তাদের ও তাঁর মধ্যে এই বিচ্ছেদে তিনি ব্যথিত হন। তিনি কামনা করতে লাগলেন যে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এমন কোনো বাণী আসুক যা তাঁর জাতির সঙ্গে তাঁকে পুনর্মিলিত করবে।

সেই কালে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয় সূরা আন্‌-নজ্‌ম্‌-এর এইসব আয়াতঃ

ভাবো নক্ষত্রের কথা, যখন তা অস্ত যায়—তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট নন, প্রবঞ্চিতও নন, আর তিনি নিজের কামনা থেকে কথা বলেন না,···ইত্যাদি।

আর যখন তিনি এই সূরার এইসব কথায় পৌঁছলেন—"তবে লাত আর উয্‌যার কথা ভেবেছ? আর মানাত যেটি তৃতীয়, অন্যটি (১৯-২০)"? তখন, শয়তান স্বজাতির সঙ্গে হযরতের মিলনের কামনার সুযোগ নিয়ে তাঁর জিহ্বার উপরে বসিয়ে দেয় এই কথা "এরা উচ্চ-মার্গ-বিহারী হংস যাদের সুপারিশ গৃহীত হয়।" এই উক্তি শুনে কোরেশরা খুব খুশী হলো তাদের দেবতাদের এমন প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখে, আর মুসলমানরা স্বতঃই ধারণা করলো যে তাদের নবী আল্লাহর কাছ থেকে যা এনেছেন তা সত্য, তাঁর কোনো ভ্রম-প্রমাদের কথা তাদের মনে উদিত হয়নি; আর যখন এই সূরার শেষে রসুল সেজদার আদেশ-স্থলে উপনীত হলেন তখন তিনি সেজদা করলেন, তাঁর সঙ্গে মুসলমানরাও সেজদা করলো, আর বহুদেববাদী কোরেশ ও অন্যান্য যারা মসজিদে উপস্থিত ছিল তারাও সেজদা করলো; কেবল ওয়ালিদ্‌ বিন্‌ আল্‌মুগিরা খুব বৃদ্ধ হয়েছিল বলে সেজদা করতে পারলো না, সে এক মুঠো ধুলোবালি হাতে তুলে তার উপরে আনত হলো। এর পর লোকেরা যার যার জায়গায় চলে গেল, কোরেশরা বলাবলি করতে লাগলো মোহম্মদ তাদের দেবতাদের খুব প্রশংসা করেছে—বলেছে তারা উচ্চ-মার্গ-বিহারী হংস।

এই সংবাদ আবিসিনিয়ায় পৌঁছল এই মর্মে যে কোরেশ ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফলে কিছু লোক মক্কায় রয়ে গেল। তার পর জিব্রিল এসে রসুলকে বল্লেঃ মোহম্মদ, আপনি কি করেছেন? আপনি এই লোকদের কাছে আবৃত্তি করেছেন এমন কিছু যা আমি আল্লাহর কাছ থেকে আনি নি আর আপনি এমন কথা বলেছেন যা আল্লাহ্‌ আপনাকে বলেন নি। রসুল অত্যন্ত দুঃখিত হলেন আর খুব ভীত হলেন আল্লাহ্‌র

ভয়ে। তখন আল্লাহ্ নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে ও যা হয়ে গেছে তা হাল্কা ক'রে তাঁর জন্য একটি প্রত্যাদেশ পাঠালেন, কেন না আল্লাহ্ ছিলেন নবীর প্রতি করুণাময়। শয়তানের আরোপ-করা বাণী তিনি বাতিল করলেন এই বাণীর দ্বারা :

তোমাদের জন্য ছেলে আর তার জন্য মেয়ে ?

এ অসঙ্গত বিভাগ !

তারা নাম ভিন্ন আর কিছু নয়, তোমরা সেসব নাম দিয়েছ, তোমরা ও তোমাদের পিতা-পিতামহেরা, আল্লাহ্ তাদের জন্য অবতীর্ণ করেন নি কোনো নির্দেশ। তারা আর কিছুর অনুসরণ করে না অনুমান আর কামনা ব্যতীত যা তাদের অন্তর চায়। আর নিঃসন্দেহ পথপ্রদর্শন তাদের কাছে এসেছে তাদের পালয়িতা থেকে।

অথবা মানুষ কি তাই পাবে যা সে কামনা করে ?

কিন্তু আল্লাহ্‌রই শেষ ও সূচনা।

আর কত ফেরেশতা আছে আকাশে যার সুপারিশে আদৌ কাজ দেয় না—আল্লাহ্‌র অনুমতি দানের পরে ব্যতীত—তাকে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন আর যার প্রতি তিনি প্রসন্ন। (৫৩ঃ ২১—২৬)

আর নবীকে আল্লাহ্ সান্ত্বনা দিলেন এই বাণীর দ্বারা ঃ

আর আমি তোমার পূর্বে কোনো রসুল (বাণীবাহক) অথবা নবী (সংবাদদাতা) পাঠাই নি এ ভিন্ন যে যখন তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছেন তখন শয়তান তাঁর আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে একটি মন্ত্রণা দিয়েছে ; কিন্তু আল্লাহ বাতিল করেন শয়তান যে মন্ত্রণা দেয় তা, তার পর আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর নির্দেশাবলী ; আর আল্লাহ সুবিজ্ঞ, জ্ঞানী ; (২২ঃ ৫২)।

শয়তানের আরোপ করা কথা যখন আল্লাহর তরফ থেকে এইভাবে বাতিল করা হলো তখন কোরেশরা হযরতের উপরে ও মুসলমানদের উপরে মহা অসন্তুষ্ট হলো কেন না শয়তানের আরোপ করা কথা তাঁদের প্রত্যেকের মুখে মুখে ফিরছিল। যেসব মুসলমান আবিসিনিয়া থেকে

মক্কায় ফিরছিল তারা মক্কায় প্রবেশ করলে গোপনে অথবা কারো আশ্রয় নিয়ে।

হযরতের জিহ্বার উপরে শয়তানের এমন বাণী আরোপ করার বিবরণ হযরত সম্বন্ধে আলোচনাকারীদের মধ্যে স্বতঃই মতভেদের কারণ হয়েছে। কেউ কেউ এই বিবরণকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব'লে মত প্রকাশ করেছেন। এই সম্পর্কে মোস্তফা-চরিতে মৌলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁ'র দীর্ঘ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

খ্যাতনামা ইসলাম-তত্ত্ব-বিদ্ সৈয়দ আমীর আলি এই বিবরণকে অবিশ্বাস্য ভাবেন নি।

এই বিবরণকে যাঁরা অবিশ্বাস্য জ্ঞান করেছেন তাঁদের বিশেষ নির্ভর-স্থল হচ্ছে কোরআনের এই মর্মের উক্তি: সম্মুখ ও পশ্চাৎ কোনো দিক থেকে কোরআনে মিথ্যা স্পর্শ করতে পারে না; আল্লাহ্‌র যারা দাস তাদের উপরে শয়তানের কোনো হাত নেই; ইত্যাদি। এই ধরনের সমালোচনার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, (১) কোনো কোনো নবীর বড় রকমের ভুলভ্রান্তির কথা কোরআনে আছে; সেইসব ভুলভ্রান্তির পরে তাঁরা অনুতপ্ত হ'য়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন আর আল্লাহ্ তাঁদের ক্ষমা করেছিলেন; (২) শয়তানের কুমন্ত্রণা দানের অশেষ ক্ষমতার কথাও কোরআনে বলা হয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্‌র যাঁরা দাস তাঁরা শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা পান।

হযরতের ক্ষেত্রেও সেই রক্ষা পাবার দৃষ্টান্ত আমরা দেখছি। ব্যাপারটা মনস্তাত্ত্বিক—Psychological। কাজেই তার বিচার সেই দিকে দৃষ্টি রেখে করাই উচিত, তর্কের—Logic-এর—বাঁধাধরা সূত্রের দ্বারা তার মীমাংসা সম্ভবপর নয়। এমন ভুলের জন্য হযরতের মানবিক মূল্য কমে না আদৌ, বরং বাড়ে।—এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আরো আলোচনা আমরা করবো।

কোরেশদের বয়কট ঘোষণা ও তার অবসান

কোরেশ যখন দেখলে আবিসিনিয়ায় বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমানের আশ্রয় লাভ হয়েছে আর মক্কায় পর পর হাম্‌যা ও ওমরের ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের সাহস যথেষ্ট বেড়েছে, হাশিম ও আব্দল মোত্তালেবের বংশের লোকদের আনুকূল্য তো রয়েছেই, তখন তারা সংকল্প আঁটলো গোটা হাশিম বংশ ও মোত্তালেব বংশকে তারা বয়কট করবে: তাদের সঙ্গে বিবাহাদি হতে পারবে না, তাদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবে। এই মর্মের এক প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখে তারা কাবার মাঝখানে ঝুলিয়ে দিলে।

কোরেশ এমন সংকল্প গ্রহণ করাতে হাশিম বংশের ও মোত্তালেব বংশের লোকেরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আবু তালেবের সঙ্গে তাঁদের পার্ব্বত্য গলির গৃহে আশ্রয় নিল। আবু লাহাব স্বজনদের ত্যাগ করে' কোরেশদের সঙ্গেই রইল।

ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন, দুই কি তিন বৎসর তাঁদের এই গিরি-সঙ্কটে কাটে। অবর্ণনীয় কষ্ট তাঁদের সহ্য করতে হয়েছিল। এই সংকটে হাশিম বংশের নিকট-আত্মীয় হাশিম বিন্ আমর তাঁদের বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। রাত্রে উটের পিঠে খাদ্য বা কাপড়চোপড় বোঝাই করে এনে তিনি সেই উটকে ঢুকিয়ে দিতেন তাঁদের গলিতে। হযরতের কোনো কোনো শিষ্য বলেছেন, তাঁরা গাছের পাতা সিদ্ধ ক'রে খেতেন, হাড় পুড়িয়ে খেতেন।* কিন্তু এত কষ্টেও মুসলমানেরা তো দমেনই নি, পূর্বপুরুষের ধর্মে বিশ্বাসী হযরতের স্বজনেরাও দমেন নি। মনীষী ইবনে খলদুন এমন গোষ্ঠীচেতনাকে বা সংহতি-বোধকে মহামূল্য জ্ঞান করেছেন, তাঁর মতে এমন চেতনার ফলে আর তার সঙ্গে ধর্মবোধের উদ্দীপনার ফলে আরবদের লাভ হয়েছিল অমন উচ্চাঙ্গের বিজয়।

শেষে হিশাম বিন্ আমর উদ্যোগী হলেন এই বয়কট ভাঙতে—তিনি সঙ্গীরূপে পেলেন যুহের বিন্ আবু উমাইয়াকে, আল্ মোৎয়েম বিন্

* মোস্তফা চরিত দ্রষ্টব্য।

আদিকে, আবুল বখতরী বিন হিশামকে আর যামাআ বিন আল আসওয়াদকে। এঁদের সমবেত চেষ্টা আবু জেহেল প্রতিরোধ করতে পারলো না। আল মোৎয়েম অঙ্গীকার-পত্র ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে দেখলেন তার সব অংশ পোকায় খেয়েছে, কেবল সূচনার "হে আল্লাহ্ তোমারই নামে" এই অংশ ভিন্ন। এইভাবে বয়কট উঠে গেল।

এই সংকট-কালেও হযরত তাঁর প্রচারধারা থেকে বিচ্যুত হন নি। তবে তিনি প্রচারের বিশেষ সুযোগ পেতেন হজের শান্তিপূর্ণ মৌসুমে। কোরেশদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলাম দূরে দূরে কেমন বিস্তার লাভ করছিল তার প্রমাণ দাউস গোত্রের কবি তোফেলের আর সাধু আবু যর গেফারীর ইসলাম গ্রহণ। এঁদের প্রভাবে এঁদের বংশের লোকদের মধ্যে ইসলাম যথেষ্ট ব্যাপক হয়। ইবনে ইসহাকে আছে, এই সময়ে আবিসিনিয়া থেকে কিছু সংখ্যক খৃষ্টান মক্কায় আসে আর হযরতের মুখে কোরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবি খদিজার ও আবুতালেবের মৃত্যু

হযরতের প্রচারক জীবনের দশম বৎসরে গিরি-সংকটে বাস থেকে তাঁর ও তাঁর স্বজনদের মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু মুক্তিলাভের কয়েক মাস পরেই তিনি প্রথমে হারান তাঁর জীবন-সঙ্গিনী হযরত খদিজাকে, তার পর তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবকে।

মৃত্যুকালে হযরত খদিজার বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। তাঁর মতো পত্নী জগতে খুব কম লোকেরই লাভ হয়েছে, বিশেষ করে কোনো প্রতিভাবানের। তাঁর স্মৃতির প্রতি হযরত চিরদিন শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। বাড়ীতে কোনো ভালো খাবার প্রস্তুত হলে তিনি তার কিছু অংশ হযরত খদিজার স্বজনদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। হযরত খদিজার মহৎ গুণাবলীর কথা হযরত সব সময়ে বলতেন বলে' একদিন হযরত আয়েশা তাঁকে বলেছিলেন: হযরত, সেই বৃদ্ধার কথা কি আপনি ভুলতে পারেন না? খদিজার প্রতি এই কিছু বিদ্রূপপূর্ণ কথায় হযরতের মুখে অসন্তোষ ফুটে উঠলো। তিনি উত্তর দিলেন: না—কখনোই নয়, খদিজার প্রেম আমার অস্থিমজ্জাগত হয়ে আছে। লোকে যখন আমাকে অগ্রাহ্য করেছিল তখন খদিজা আমাতে বিশ্বাস করেছিলেন, সকলে যখন আমাকে বলেছিল মিথ্যাবাদী তখন খদিজা আমার কথার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন, সকলে যখন আমাকে ত্যাগ করেছিল তখন খদিজা ছিলেন আমার সঙ্গিনী—তাঁর ধনভাণ্ডার তিনি লুটিয়ে দিয়েছিলেন ধর্ম-কর্মে ব্যয় করার জন্য।

হযরত খদিজার মৃত্যুর মাত্র এক মাস পাঁচ দিন পরে ঘটলো আবু তালেবের মৃত্যু। তাঁর অন্তিমকালের বর্ণনা ইবনে ইসহাকে এইভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ

আবু তালেবের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বুঝে আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, প্রমুখ কোরেশ প্রধানরা তাঁকে গিয়ে বল্লে ঃ মোহম্মদের সঙ্গে একটা মিটমাট তুমি করে দিয়ে যাও, তার ধর্ম নিয়ে সে থাকুক আমাদের ধর্ম নিয়ে আমরা থাকবো। হযরত এলে আবু তালেব তাঁকে বল্লেন ঃ ভাইপো, এই প্রধানরা তোমার কাছে এসেছেন যেন তুমি তাঁদের কাছ থেকে কিছু নিতে পার আর তাঁরাও তোমার কাছ থেকে কিছু নিতে পারেন। হযরত বল্লেন ঃ এঁরা যদি আমাকে একটি কথা দেন তবে আরবদের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারবেন আর পারশিকদের অধীন করতে পারবেন। আবু জেহেল বল্লে ঃ দশ কথা দিতে রাজি আছি। হযরত বল্লেন ঃ আপনাদের বলতে হবে আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই, আর তাঁকে ভিন্ন যাদের উপাসনা আপনারা করেন যেসব বর্জন করতে হবে। কোরেশ-প্রধানরা হাততালি দিয়ে বল্লে ঃ মোহম্মদ, তুমি সব দেবতাকে এক দেবতা করে ফেলতে চাও? সে তো এক অদ্ভুত ব্যাপার হবে। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করলে, এ লোকের কাছ থেকে কিছু পাবার আশা নেই, কাজেই পূর্বপুরুষের ধর্মে বলবৎ থাকতে হবে যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে বিচার করেন। এই বলে তারা চলে গেল। আবু তালেব হযরতকে বল্লেন ঃ ভাই পো, তুমি যে তাদের কাছে অসম্ভব দাবি করেছিলে আমার তা মনে হয় না। তাঁর এই কথা শুনে হযরত আশান্বিত হলেন আবু তালেব হয়ত তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বল্লেন ঃ চাচা, আপনি এই বাণী উচ্চারণ করুন, তাহলে কেয়ামতের দিন আমি আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারবো। হযরতের আগ্রহ লক্ষ্য করে আবু তালেব বল্লেন ঃ যদি আমি ভয় না করতাম যে তোমাকে ও তোমার ভাইদের আমার মৃত্যুর পরে গালাগালি দেওয়া হবে আর কোরেশ বলবে যে আমি এই বাণী উচ্চারণ করেছি শুধু

মৃত্যুর ভয়ে, তবে আমি এই বাণী উচ্চারণ করতাম—আমি এটি করতাম কেবল তোমাকে খুশী করার জন্য। এই সময়ে আবু তালেবের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এলো। আল্-আব্বাস তাঁর ঠোঁট নাড়া দেখে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন ও তাঁর মুখের কাছে কান নিয়ে গেলেন, আর বল্লেন ঃ ভাই-পো, আল্লাহ্র শপথ, আমার ভাই সেই বাণী উচ্চারণ করেছেন যা তুমি তাঁকে বলেছিলে। হযরত বল্লেন ঃ আমি তা শুনি নি।

আবু তালেবের অন্তিমকালের বর্ণনা ইবনে সা'দের গ্রন্থে এইভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ

তাঁর অন্তিম কাল ঘনিয়ে এসেছে দেখে হযরত যত তাঁকে বলতে লাগলেন ঃ চাচা, আপনি আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই এই বাণী উচ্চারণ করুন, তত কোরেশ-প্রধানরা বলতে লাগলো ঃ আবু তালেব, তুমি তোমার পিতৃপুরুষের ধর্ম বিসর্জন দেবে? শেষে আবু তালেব হযরতকে বল্লেন ঃ তুমি পূর্বে যদি বলতে তবে তোমার আনা ধর্ম আমি গ্রহণ করতাম, কিন্তু এখন যদি গ্রহণ করি তবে কোরেশের বুড়ীরাও বলবে আবু তালেব দোজখের আগুনের ভয়ে পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছে। দেখো শরমের চেয়ে আগুন ভালো।

আবু তালেবের মৃত্যুর পরে হযরতের উপরে কোরেশদের উপদ্রব স্বতঃই বাড়লো। আবু তালেবের মৃত্যুর পরে আবু লাহাব হযরতকে বলেছিল বটে ঃ আবু তালেবের জীবদ্দশায় তুমি যা করতে তাই করে যাও, লাত-এর শপথ, আমি যতদিন বেঁচে আজি ততদিন কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু সে তার কথা রাখতে পারে নি। একদিন রাস্তা দিয়ে হযরত চলেছিলেন, এক দুষ্টলোক তাঁর মাথায় ধুলাবালি দিলো; সেই অবস্থায় বাড়ী এলে তাঁর কন্যাদের একজন তাঁর মাথা পরিষ্কার করে দিলেন ও কাঁদতে লাগলেন। হযরত তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন ঃ বাছা, কেঁদো না, কেন না নিশ্চয় আল্লাহ তোমার পিতাকে সাহায্য করবেন।

তায়েফে প্রচার

আবু তালেবের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই হযরত মক্কা থেকে ৬০।৭০ মাইল পূর্বে অবস্থিত তায়েফে গেলেন, সঙ্গে নিলেন মাত্র যায়েদকে। তায়েফ ছিল এক উর্ব্বর অঞ্চল—ফলে ফুলে শোভিত। তাদের প্রধান দেবতা ছিল লাত। হযরত তায়েফে পৌঁছে প্রথম গেলেন সকিফ গোত্রের প্রধানদের কাছে। তারা ছিল তিন ভাই, তাদের এক ভাইয়ের সঙ্গে এক কোরেশ-কন্যার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তিন জনের কেউই হযরতের কথায় কর্ণপাত করলে না। এদের একজন বল্লেঃ আল্লাহ্ তাহলে রসুল ক'রে পাঠাবার জন্য তোমার চাইতে ভালো আর কাউকে খুঁজে পান নি। অপর জন বল্লেঃ আল্লাহর শপথ, তোমার সঙ্গে আমি কোনো কথা বলতে চাই না: যদি তুমি রসুল হও, যেমন তুমি বলছ, তবে তো তুমি মহৎ লোক, তোমাকে কিছু বলা আমার সাজে না, আর যদি মিথ্যুক হও তবে তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলাই উচিত হবে না। হযরত তাদের বল্লেনঃ তোমাদের যা করবার তা তো করলে, অন্ততঃ এ বিষয়ে কাউকে কিছু ব'লো না। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন এদের এমন উপেক্ষার কথা কোরেশরা শুনলে তাদের সাহস আরো বেড়ে যাবে। কিন্তু এই প্রধানরা তাঁর কোনো কথাই শুনলো না; বরং তারা গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকদের ও দাসদের উসকিয়ে দিলে হযরতকে অপমান করার জন্য।

তায়েফে হজরত দিন দশেক ছিলেন। তাঁর আহ্বানে সেখানকার অনেক প্রধান এসেছিল, কিন্তু কাজ কিছুই হয় নি। প্রধানদের এই অবহেলায় শেষের দিকে সেখানকার অনেক লোক প্রকাশ্যভাবে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখাতে আরম্ভ করলো। শুধু তাই নয় তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগলো। এর ফলে তাঁর দুই পা দিয়ে রক্তের ধারা বইলো—তাঁকে আঘাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে যায়েদও আহত হলেন। এইভাবে প্রায় দুই তিন মাইল পথ জনতার হাতে লাঞ্ছনা সয়ে হযরত শহরের এক বাগানে প্রবেশ ক'রে এক দ্রাক্ষালতার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন।*

* মুয়রের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

হযরতের জুতার ভিতরে রক্ত জমে গিয়েছিল। অতি কষ্টে পা বার করে তিনি ওযু সমাধা করলেন। নামায পড়ার পরে তিনি এই প্রার্থনা করেন ঃ

“আল্লাহ, তোমারই কাছে আমি নালিশ জানাই—আমার দুর্বলতার জন্য, আমার সম্বলহীনতার জন্য, আর মানুষের সামনে তুচ্ছতার জন্য। হে পরম করুণাময়, তুমি দুর্বলদের প্রভু—তুমি আমার প্রতিপালক। কার হাতে তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে? অপরিচিত দূরের লোকদের হাতে যারা আমাকে লাঞ্ছিত করবে? অথবা আমার দেশের শত্রুদের হাতে যাদের তুমি ক্ষমতা দিয়েছ আমার উপরে? যদি তুমি অসন্তুষ্ট না হয়ে থাকো তবে আমি কিছুই পরোয়া করি না। তোমার অনুগ্রহ আমার জন্য বিশালতর আশ্রয়। আমি তোমার আননের আলোকে আশ্রয় নিই—যার দ্বারা অন্ধকার উজ্জ্বল হয়, আর এই সংসারের ও পরকালের সব কিছুর সুরাহা হয়। তোমার ক্রোধ আমার উপরে অবতীর্ণ না হোক, তোমার অসন্তোষও নয়। তুমি দয়া করে ফেরো—প্রসন্ন হও। কোনো শক্তি কোনো ক্ষমতা কোথাও নেই তোমাতে ভিন্ন।”*

এই প্রার্থনা অপূর্ব। সব অপমান লাঞ্ছনা হযরতকে ধৈর্যচ্যুত করতে পারছে না। তাঁর নির্ভর একমাত্র আল্লাহর প্রসন্নতার উপরে—সেই প্রসন্নতা তাঁর জন্য সব বল, সব ভরসা। এমন নির্ভরতা অতিমানবিক মনে হয়। কিন্তু বহু দেশের শ্রেষ্ঠ মানবরা এমন অতিমানবিক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

“কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো প্রেমিক ওগো পাগল ওগো ধরায় আস।”

এই বাগানের মালিক ছিল দুই জন কোরেশ—ওত্‌বা ও শায়বা। ধনী কোরেশদের তায়েফে এমন বাগান থাকতো। হযরতের প্রতি লোকদের ব্যবহার সবই তারা দেখছিল, দেখে দয়ার্দ্র হয়েছিল। তারা

* ইবনে ইসহাক দ্রষ্টব্য।

তাদের। এক দাসের হাতে হযরতের জন্য একপাত্র আঙুর পাঠিয়ে দিলে। হযরত আল্লাহর নাম নিয়ে তা ভক্ষণ করলেন।

তায়েফে আনুকূল্য লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে হযরত মক্কায় ফিরলেন। মাঝপথে নাখলায় তিনি কয়েক দিন অবস্থিতি করেন। এখানে সূরা 'জিন' অবতীর্ণ হয়।

জিন বলতে বর্বর জাতির লোকও বোঝা হয়েছে।

মক্কায় প্রবেশের পূর্বে তিনি সঙ্গত মনে করলেন সেখানকার কোনো প্রধানের শরণ প্রার্থনা করা। প্রথম যে দুই জনের কাছে লোক পাঠালেন, তারা আশ্রয় দিতে অপারগতা জানালো। কিন্তু মোৎয়েম বিন্ আদি-র নিকটে লোক পাঠাতেই তিনি সম্মতি জানালেন। তাঁর গোত্রের সক্ষম পুরুষদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে হযরতকে নিয়ে তিনি কাবায় পৌঁছলেন।

তাঁকে দেখে আবু জেহেল বল্লেঃ তুমি মোহম্মদকে আশ্রয় দিচ্ছ, না, তার ধর্ম গ্রহণ করেছ? মোৎয়েম বল্লেনঃ আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি। আবু জেহেল বল্লেঃ তুমি যাকে আশ্রয় দাও আমরাও তাকেঁ আশ্রয় দিই।

গিরিসঙ্কট থেকে হযরতকে ও তাঁর স্বজনদের উদ্ধার করার ব্যাপারে মোৎয়েম যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা জানি। মহান মোৎয়েমের প্রতি হযরত গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বদরের যুদ্ধের পরে তিনি বলেছিলেনঃ আজ যদি মোৎয়েম বেঁচে থাকতেন আর সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিতে বলতেন তবে আমি কালবিলম্ব না করে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতাম।

মে'রাজ

কোনো কোনো বিবরণ অনুসারে তায়েফ থেকে ফিরবার পরে হযরতের জীবনে বড় ঘটনা মে'রাজ। এ-সম্বন্ধে 'মোস্তফা-চরিতে' লেখা হয়েছেঃ

"নবুয়তের দশম সনে এবং তাএফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মে' রাজের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই ঘটনার দিন তারিখ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। একদা নিশীথকালে হযরত মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া বায়তুল মোকাদ্দছ বা যেরুজেলম মসজিদে উপনীত হন এবং সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে উপস্থিত হন। এই ঘটনার প্রথম অংশ এছরা এবং শেষ অংশ মে'রাজ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। আজকাল এই পার্থক্যটা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উভয় ঘটনা সমবেতভাবে মে'রাজ বলিয়া কথিত হইতেছে।

মে' রাজের ঘটনা যে সত্য, তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ থাকিতে পারে না।···কিন্তু এই মে'রাজ কোন সময় কোন স্থানে এবং কি অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা লইয়া প্রথম হইতেই অসাধারণ মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। মে' রাজ সংক্রান্ত হাদিছগুলির স্থানকালাদি বৃত্তান্ত এবং তাহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এত অধিক অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, হঠাৎ দুই চারি কথায় তাহার আলোচনা বা সমাধা করা···কখনোই সম্ভব নহে। ছাহাবাগণের সময় হইতে আজ পর্যন্ত এই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে।···ফলে বিষয়টি এমন জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কথিত অসামঞ্জস্যগুলির সমাধা করিতে অসমর্থ হইয়া অনেকেই একাধিকবার মে'রাজ হওয়ার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এমন কি কেহ কেহ ৩০ ও ৩৪ বার মে'রাজ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। মূল মে'রাজ সম্বন্ধে একদল বলিতেছেন যে, উহা স্বপ্নের ব্যাপার। অহির প্রারম্ভে যেরূপ হযরত স্বপ্নযোগে সত্যের স্বরূপ সন্দর্শন করিতেন, সেইরূপ মে'রাজের সময়ও আল্লাহ্ তা আলা তাঁহাকে স্বপ্নযোগে অনেক তথ্য ও বহু সত্য অবগত করাইয়া দেন। ইঁহারাও কোরআন হাদিস্ ও ইতিহাসের প্রমাণ দ্বারা নিজেদের মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। আর একদল বলিতেছেন—মে'রাজ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, দেহের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। ইঁহারাও প্রমাণ প্রয়োগে কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকের মত এই যে, মে'রাজের সমস্ত ব্যাপারই সশরীরে এবং জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল।"

মে'রাজ সম্বন্ধে হযরত আয়েশার উক্তি এই ঃ মে'রাজের কালে হযরতের দেহ ছিল যেখানে তা পূর্বে ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর আত্মাকে রাত্রিকালে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

স্বনামধন্য মরমী কবি রুমি মে'রাজ সম্বন্ধে এই ধরনের কথা বলেছেন ঃ মে'রাজ উপরে ওঠা বা নীচে নামা নয়, মে' রাজ আত্মার সম্প্রসারণ।

হযরতের এই "ভ্রমণে"র কিছু কিছু বিবরণ ইবনে ইসহাক থেকে আমরা উদ্ধৃত করছি ঃ

হযরত বোরাক-এর পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেছিলেন। বোরাক জীবটি ছিল অর্দ্ধেক খচ্চর অর্দ্ধেক গাধা, তার দুই পাশে ছিল পাখা, তার সাহায্যে এই জন্তুটি প্রতি পদক্ষেপে যেত যত দূর দৃষ্টি যায়।

হযরত প্রথমে পৌঁছলেন যেরুজালেমের মসজিদে, সেখানে বহু পয়গাম্বরের মধ্যে তার দেখা হয় ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসার সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে নামায পড়ার সময় হযরত নেতৃত্ব করেন। তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ ইব্রাহিম ছিলেন দেখতে হযরতেরই মতো, মূসার মুখ ছিল রক্তবর্ণ দেখতে তিনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতি, অস্থূল, কুঞ্চিতকেশ, আর তাঁর নাকটি ছিল বঁড়শির মতো বাঁকা। মরিয়ম-তনয় যীশু ছিলেন রক্তবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, দীর্ঘকেশযুক্ত, তাঁর মুখে ছিল বহু তিল—যেন এইমাত্র স্নান করে এসেছেন।

হযরত প্রথম আকাশে দেখেন আদমকে। দ্বিতীয় আকাশে দেখেন মরিয়ম-তনয় যীশুকে আর যাকারিয়া-তনয় জনকে, তৃতীয় আকাশে তিনি দেখেন পরমসুদর্শন ইউসুফকে, চতুর্থ আকাশে তিনি দেখেন ইদ্রিসকে, পঞ্চম আকাশে তিনি দেখেন শুভ্রকেশ দীর্ঘশ্মশ্রু হারুনকে। ষষ্ঠ আকাশে তিনি দেখেন মূসাকে, সপ্তম আকাশে তিনি দেখেন মহাগৌরবান্বিত ইব্রাহিমকে। তার পর জিব্রিল হযরতকে নিয়ে যায় বেহেশতে। সেখানে তিনি দেখেন এক রক্তোষ্ঠী কন্যাকে, তাকে দেখে তিনি খুশী হন। তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কার

জন্য? সে বল্লেঃ হারেসার পুত্র যায়েদের জন্য। হযরত যায়েদকে এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

হযরত যখন প্রথম আকাশে প্রবেশ করেন তখন যেসব ফেরেশতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল তারা সবাই তাঁকে হাসিমুখে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু একজন তাঁকে স্বাগত জানায়—না হেসে। হযরত জিব্রিলকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। জিব্রিল বলেঃ এই ফেরেশতা কখনো হাসে নি; সে দোযখের প্রহরী। হযরত দোযখ দেখতে চাইলে জিব্রিল সেই প্রহরীকে দোযখ দেখাতে বলে। দোযখের ঢাকা যখন খোলা হলো তখন আগুনের শিখাগুলো এমন দাউ দাউ করে উঠলো যেন সব পুড়িয়ে দেবে। হযরত জিব্রিলকে বল্লেনঃ এ শিখাগুলোকে যথাস্থানে ফিরিয়ে নেওয়া হোক। প্রহরী দোযখের উপরে ঢাকা চাপিয়ে দিলে।

মে'রাজ সম্বন্ধে কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ এই আছেঃ মহিমা তাঁর যিনি তাঁর দাসকে এক রাত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন পবিত্র মসজিদ (মক্কার) থেকে দূরবর্তী মসজিদে (জেরুজালেমে) যার পরিমণ্ডল আমি পুণ্যময় করেছি, যেন আমি তাঁকে দেখাতে পারি আমার কিছু নিদর্শন। নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা। (১৭ঃ১)।

হযরত কখনো জেরুজালেমে যান নি। ইবনে ইসহাকে আছে, হযরত আবু বকর যখন হযরতকে বলেছিলেন জেরুজালেমের বর্ণনা দিতে তখন তিনি তার সঠিক বর্ণনা দিয়েছিলেন। হযরত যে জেরুজালেমের সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন হযরত আবু বকর তা সম্পূর্ণ স্বীকার করেছিলেন। তাতে হযরত তাঁকে বলেনঃ তুমি সিদ্দিক—অর্থাৎ সত্যের সাক্ষী। সেই সময় থেকে হযরত আবু বকর এই সম্মানিত নাম পান।

একালের কোনো কোনো পণ্ডিত মন্তব্য করেছেনঃ মধ্যযুগের স্বনামখ্যাত খৃষ্টান কবি দান্তে তাঁর বিখ্যাত 'ডিভাইন কমেডি' রচনায় সম্ভবত হযরতের এই 'স্বর্গ-মর্ত্য-ভ্রমণ' থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন।

মে'রাজের পরের দিন ভোরে হযরত যখন কোরেশদের তাঁর 'ভ্রমণে'র কথা বল্লেন তারা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ক'রে বল্লেঃ এ অসম্ভব, সিরিয়ায় যেতে লাগে এক মাস আসতে লাগে এক মাস। অনেক মুসলমান তাদের ধর্ম ত্যাগ করলে। কিন্তু হযরত আবু বকরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি বল্লেনঃ হযরত যদি এ কথা বলে থাকেন তবে এ সত্য। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? তিনি আমাকে বলে থাকেন যে তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আকাশ থেকে পৃথিবী থেকে দিনে রাত্রে বাণী পান, আর আমি তা বিশ্বাস করি, কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

বিবি সওদা ও বিবি আয়েশার সঙ্গে বিবাহ

তায়েফ থেকে ফিরবার কিছু দিন পরে হযরত বিবি সওদাকে বিবাহ করেন। বিবি সওদা ছিলেন কোরেশ-কন্যা। তিনি ও তাঁর স্বামী সক্‌রান প্রাথমিক যুগের মুসলমান, তাঁরা আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলেন ও সেখানে সকরানের মৃত্যু হয়। বিবি সওদার দুঃস্থ অবস্থার জন্য হযরত তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন মনে হয়। মোস্তফা-চরিতে আছেঃ বিবি সওদা হযয়তকে বলেনঃ

"হযরত, বিবাহ্ করার সাধ আমার নাই। তবে আমি কিয়ামতে আপনার সহধর্ম্মিণীরূপে উত্থিত হইবার বাসনা করি।" প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিলও তাহাই তিনি নিজের "বারী" (বার, পালা) বিবি আয়েশাকে দান করিয়াছিলেন।

বিবি সওদার বিবাহের পরে হযরত বাগ্‌দত্ত হন হযরত আবু বকরের কন্যা হযরত আয়েশার সঙ্গে। তখন তিনি নিতান্ত বালিকা।

হজের সময়ে প্রচার

তায়েফে হযরতের কোনো সাফল্য লাভ হয় নি তা আমরা দেখেছি। কিন্তু ব্যর্থতা-বোধ যেন তাঁকে স্পর্শ করতে পারতো না। এই সময় হজের

মৌসুম শেষ হয়ে এসেছিল, তবু যাত্রীদের ভিড় কিছু কিছু ছিল। তিনি তাদের কাছে এক আল্লাহ্‌কে গ্রহণ করার কথা আর প্রতিমাদের বর্জন করার কথা কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে বলেন, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তার ফল কিছু হয় নি। একটি বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত এক আল্লাহ্‌র কথা প্রচার করছেন আর আবু লাহাব তাঁর পেছনে পেছনে বলে চলেছেঃ এই লোকটা লাত ও উয্‌যা থেকে তোমাদের সরিয়ে নিতে চাচ্ছে, তার কথা শুনো না, তাকে আমল দিও না। —এক দলের একজন হযরতের কথা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে বলে, আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে জয় দেয় তবে তোমার পরে আমাদের কর্তৃত্ব লাভ হবে তো? হযরত উত্তর করেনঃ কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌ যাকে খুশী দেন। সে বলেঃ তাহলে তুমি চাচ্ছ যে আমরা আরবদের থেকে তোমাকে বুক দিয়ে রক্ষা করি, আর আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে জয় দেয় তবে ফল ভোগ করবে অন্যেরা?—সেটি হবে না।

এমন প্রচারের ফলে হযরতের কিছু কিছু সাফাল্য লাভও যে হয় নি তা নয়। ইয়াস নামে মদিনার একটি যুবক হযরতের কথা শুনে তার লোকদের বলে—এ তো বেশ ভাল কথা। তাতে তার সঙ্গের একজন তার মুখে এক মুঠো ধূলি ছুঁড়ে দিয়ে বলেঃ চুপ কর, আমরা এর জন্য এখানে আসি নি! ইয়াস চুপ করে যায়। মদিনায় গিয়ে অল্প দিনেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু তার লোকেরা বলতো—সে সব সময় এক আল্লাহ্‌র স্তবস্তুতি করতো।

হযরতের প্রচারক জীবনের একাদশ বৎসরে এমনি হজের মৌসুমে হেরা ও মীনার মধ্যবর্তী আকাবা নামক স্থানে তাঁর দেখা হয় ছয় জন লোকের সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞাসা করে জানেন যে তারা মদিনার খাযরাজ গোত্রের লোক, ইহুদীদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ। তিনি তাদের কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা করলেন ও তাদের কোরআন পাঠ করে শোনালেন। খায়রাজ গোত্রের এই লোকেরা ইহুদীদের মুখে প্রায়ই শুনতো যে শিগ্‌গিরই একজন পয়গাম্বর আবির্ভূত হবেন—তাঁর আবির্ভাবের আর দেরী নেই—আর ইহুদীরা তাঁর সাহায্যে আরব পৌত্তলিকদের ধ্বংস করবে পূর্বে

যেমন আদ্ ও ইরাম ধ্বংস হয়েছিল। হযরতের কথা শুনে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, এই সেই নবী যাঁর সম্বন্ধে ইহুদীরা আমাদের সাবধান করেছে, তাদের পূর্বেই আমরা কেন না এঁর অনুবর্তী হই। এই ভেবে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এই ছয় জনের নাম হচ্ছে : আবু ইমামা আস্আদ্ বিন্ যারারাহ্, (২) আউফ বিন্ হারিস, (৩) রাফি বিন্ মালিক, (৪) উৎবা বিন্ আমীর বিন্ হুদায়দা, (৫) আকাবা বিন্ আমীর বিন্ নবী, (৬) সা' আদ বিন্ রবি।

তারা মদিনায় ফিরে আপন লোকদের হযরত ও ইসলামের কথা বলে। তাদের প্রচারের ফলে মদিনায় এমন পরিবার রইল না যেখানে হযরতের ও ইসলামের কথা অজানা রইল।

আকাবার অঙ্গীকার

পর বৎসর এদের বারো জন লোক হজের সময়ে মক্কায় এলো আর তারা হযরতের কাছে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করলো :

(১) আমরা কোনো-কিছুকে আল্লাহ্র অংশী দাঁড় করাবো না ;

(২) আমরা চুরি করবো না ;

(৩) আমরা ব্যভিচার করবো না ;

(৪) আমরা সন্তান-হত্যা করবো না ;

(৫) আমরা পাড়াপ্রতিবেশীর কুৎসা রটাবো না ;

(৬) যা ভালো তাতে আমরা রসুলের অবাধ্য হবো না ;

(৭) যদি আমরা এই অঙ্গীকার পূর্ণ করি তবে আমাদের লাভ হবে বেহেশ্ত ; আর যদি এইসব পাপের কোনো একটি আচরণ করি তবে আল্লাহ্ আমাদের শাস্তি দেবেন অথবা ক্ষমা করবেন যা তাঁর ইচ্ছা।

একে বলা হয় নারীদের অঙ্গীকার কেন না যুদ্ধ করার দায়িত্ব এতে ছিল না।

এই বারো জনের সঙ্গে হযরত পাঠিয়ে দেন মুস্‌আব বিন্‌ উমেরকে তাদের ধর্ম-শিক্ষকরূপে. মুস্‌আব থাকতেন আস্‌আদ্‌ বিন্‌ যুরারাহ্‌-র বাড়ীতে।

কেউ কেউ বলেছেন মদিনায় আউস ও খাযরাজ এই দুই গোত্রের মধ্যে যে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সেইজন্য সেখানে নামাযে নেতৃত্ব করতেন মুস্‌আব।

ইসলাম প্রচারে মুস্‌আব-এর ধৈর্য ও নৈপুণ্য সম্বন্ধে ইব্‌নে ইসহাকের গ্রন্থে ও অন্য ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে ঃ আস্‌আদ্‌ ও মুস্‌আব আউস গোত্রের এক বাগানে কুয়োর ধারে বসে অন্যান্য নতুন মুসলমানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলেন। তাঁদের আসার সংবাদ পেয়ে ঐ গোত্রের দুই প্রধান সা'দ ইবনে মোয়ায ও ওসেদ, পূর্বপুরুষের ধর্মের অবসান আশঙ্কা করে বিচলিত হ'ল, আর আসআদের আত্মীয় ওসেদ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁদের কাছে গিয়ে গালাগালি করলে ঃ তোরা দুই জন কেন এসেছিস আমাদের ছোকরাদের আর নির্বোধদের বিপথে নিতে ? পালা যদি জীবনের ভয় থাকে। মুস্‌আব বিনীত কণ্ঠে বল্লেন ঃ একটু বসে দুটো কথা শুনুন, যদি ভালো লাগে তবে তা নেবেন নইলে স্বচ্ছন্দে তা ত্যাগ করবেন। উসেদ দেখলে কথাটা যুক্তিযুক্ত। সে তার বর্শা মাটিতে খোঁচা দিয়ে দাঁড় করিয়ে বসে পড়ল। মুস্‌আব তাঁর কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা করলেন আর কোরআন পাঠ করলেন। ওসেদের মুখে ভাবান্তর দেখা দিল। সে বল্লে ঃ কি চমৎকার আর সুন্দর কথা এসব ! এই ধর্ম গ্রহণ করতে হলে কি করতে হয় ? তাঁরা বল্লেন ঃ তাকে নিজেকে ধৌত করতে হবে আর নিজেকে ও নিজের কাপড়চোপড় পবিত্র করতে হবে, আর কলেমা পড়তে হবে, আর নামায পড়তে হবে। সে তৎক্ষণাৎ তা করলো আর দুই সেজদা দিলে। তারপর বল্লে ঃ আমার পেছনে আর একজন আছে সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করবে। তারপর সা'দও তাদের কাছে এলো আর মোস্‌আবের মধুর ব্যবহারে ও তাঁর ইসলাম-ব্যাখ্যা শুনে ইসলামে

দীক্ষিত হলো। ইসলামের প্রতি তাদের প্রধানের অকৃত্রিম নিষ্ঠা দেখে তাদের গোত্রের প্রত্যেক নরনারী ইসলাম গ্রহণ করলে।

আমরা দেখেছি চরম ব্যর্থতার দিনেও হযরত ব্যর্থতা স্বীকার করেন নি। এইকালে যেসব প্রত্যাদেশ হযরতের লাভ হয় তার কিছু কিছু আমরা উদ্ধৃত করছি :

আর অবিশ্বাসীরা তাদের পয়গাম্বরদের বলেছিল : নিশ্চয় আমরা তোমাদের আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবো, অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। সেজন্য তাঁদের পালয়িতা তাঁদের প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি ধ্বংস করবো অন্যায়কারীদের ;

আর নিঃসন্দেহ তাদের পরে আমি তোমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবো। এটি তার জন্য যে ভয় করে আমার সামনে দাঁড়াতে আর ভয় করে আমার শাস্তি।

আর তারা বিচার চেয়েছিল—আর প্রত্যেক গর্বিত বিরুদ্ধাচারী বিফল হয়েছিল।

তার সামনে জাহান্নাম আর তাকে পান করতে দেওয়া হবে ক্লেদপূর্ণ জল। (১৪ : ১৩—১৪)

* * *

রোমীয়গণ পরাভূত হয়েছে—

কাছের এক দেশে, আর তাদের পরাভবের পরে, বিজয়ী হবে,

অল্প কয়েক বৎসরের (দশ বৎসরের) মধ্যে। আল্লাহ্‌রই হুকুম আগে ও পরে, আর সেইদিন বিশ্বাসীরা খুশী হবে—

আল্লাহ্‌র সহায়তায়, তিনি সাহায্য করবেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর তিনি মহাশক্তি কৃপাময় ; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি—আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। কিন্তু অনেক লোকই জানে না। (৩০ : ২—৬)।

* * *

আর যদি আমি তাদের প্রতি করুণা করি, আর দূর করে

দিই তাদের আপদ, তারা লেগে থাকবে তাদের বাড়াবাড়িতে অন্ধভাবে।

আর পূর্বেই আমি তাদের উপরে এনে দিয়েছি শাস্তি, কিন্তু তারা বিনত হয় নি তাদের পালয়িতার প্রতি, তারা তাঁর অনুগতও নয়—যে পর্যন্ত না আমি তাদের উপরে খুলে দিই কঠোর শাস্তির দরজা—তখন দেখো তারা তাতে হতাশ্বাস। (২৩ঃ ৭৫-৭৭)।*

* * *

আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার

মোসআবের সফল প্রচারের ফলে পর বৎসর, অর্থাৎ হযরতের প্রচারের ত্রয়োদশ বৎসরে, হজের সময়ে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী মদিনার মুসলমানদের তরফ থেকে হযরতের সঙ্গে দেখা করতে আসে। এটি মদিনার লোকদের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় সাক্ষাৎকার। হযরতের চাচা আল-আব্বাস মুসলমান না হলেও হযরতের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। এই তৃতীয় সাক্ষাৎকারে তিনি মদিনার লোকদের বলেনঃ হে খাযরাজ-বংশীয়গণ, আপনারা জানেন আমাদের মধ্যে মোহম্মদের কি স্থান। আমাদের নিজেদের লোকদের থেকে আমরা তাঁকে যথাসাধ্য রক্ষা ক'রে এসেছি তা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তিনি আমাদের লোকদের মধ্যে সম্মানে ও নিরাপত্তায় বাস করছেন। কিন্তু তিনি যাচ্ছেন আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে। যদি আপনারা মনে করেন যে আপনারা তাঁর সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছেন তা বজায় রাখতে পারবেন আর তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন তবে আপনারা সেই ভার গ্রহণ করুন, কিন্তু যদি আপনারা মনে করেন যে তাঁর পক্ষ সমর্থন আপনারা করবেন না আর আপনাদের সঙ্গে তাঁর চলে যাবার পরে তাঁকে ত্যাগ করবেন তবে তাঁকে ত্যাগ করে যান, কেন না তিনি যেখানে আছেন সেখানে নিরাপদেই আছেন। মদিনাবাসীরা উত্তর দিলেঃ আমরা আপনার কথা শুনেছি, হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনি

* এইকালে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।

বলুন আর নিজের জন্য আর আপনার প্রতিপালকের জন্য যা বেছে নেবার তা নিন। হযরত কোরআন পাঠ করলেন আর তাদের ইসলামে আহ্বান করলেন ও তারপর বল্লেন ঃ আমি তোমাদের এই আনুগত্য চাচ্ছি যে তোমরা আমার রক্ষণাবেক্ষণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের নারীদের ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করো। তাদের প্রধান আল্-বরা হস্ত প্রসারিত করে বল্লে ঃ তাঁর শপথ, যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন সত্য দিয়ে আমরা আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করবো যেমন আমরা আমাদের নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করি। আমরা আমাদের বশ্যতা স্বীকার করছি আর আমরা অস্ত্রধারী যোদ্ধা, আমরা যুদ্ধের জ্ঞান রাখি উত্তরাধিকার-সূত্রে।

মদিনাবাসীদের সঙ্গে হযরতের আরো কথা হয়। তিনি স্বীকার করেন বিজয় লাভের পরে তিনি মদিনাবাসীদের ছেড়ে যাবেন না।

এর পর প্রথম প্রধানেরা হযরতের হাতে হাত রেখে আনুগত্য স্বীকার করল, তারপর সবাই সেইভাবে আনুগত্য স্বীকার করলো। নারীরা আনুগত্যের কথা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে শুধু মুখে উচ্চারণ করলো। তার পর হযরত খাযরাজদের মধ্যে থেকে নয় জন আর আউস গোত্র থেকে তিন জন এই বারো জন নেতা ঠিক করে দিলেন মদিনার লোকদের ভার নেবার জন্য।

খুব গোপনে এই বৈঠক সমাধা হয়েছিল। তবু কোরেশ এর কথা জানতে পারে। পর দিন ভোরে মদিনার যাত্রীদের কাছে এসে তারা অভিযোগ করে কেন তারা তাদের সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করছে। মদিনার বহুদেববাদী যাত্রীরা আকাবার অঙ্গীকারের কথা কিছুই জানতো না, কাজেই তারা কিছু বলতে পারলো না, বরং সব অভিযোগ অস্বীকার করলো। এই অবসরে মুসলমানেরা মদিনা থেকে রওনা হয়ে গেল। তাদের দুই একজনকে কোরেশরা ধরতে পেরেছিল, আর তাদের উপরে উৎপীড়নও করলো। কিন্তু মদিনার পথে কোরেশদের বাণিজ্যযাত্রা করতে হয়, সেই সূত্রে তাদের সঙ্গে বাধ্যবাধকতা আছে, এইসব বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত তাদের ছেড়ে দিলে।

যুদ্ধের আদেশ লাভ

ইব্‌নে ইসহাক তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকারের পূর্বে যুদ্ধ করার অথবা রক্তপাত করার অনুমতি হযরতের লাভ হয়নি। তাঁকে শুধু আদেশ দেওয়া হয়েছিল মানুষদের আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করতে আর অপমান সহ্য করতে এবং অজ্ঞদের ক্ষমা করতে।* কোরেশরা তাঁর অনুবর্তীদের উপরে অত্যাচার করেই চলেছিল, তাদের কাউকে কাউকে ধর্মচ্যুত করেছিল, আর কাউকে কাউকে দেশান্তরিত করেছিল। যখন কোরেশ আল্লাহ্‌র প্রতি উদ্ধত হলো আর তাঁর সদয় অভিপ্রায় অস্বীকার করলো, নবীকে বল্লে মিথ্যাবাদী, আর যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হলো তাঁর একত্ব স্বীকার করলো তাঁর রসুলে আস্থা স্থাপন করলো আর আল্লাহ্‌র দেওয়া ধর্ম আঁকড়ে রইল তাদের তারা উৎপীড়ন করলো আর দেশান্তরিত করল, তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন।

উর্‌ওয়া বিন্ আল যুবায়ের ও অন্যান্য পণ্ডিতব্যক্তিদের কাছে থেকে শোনা গেছে যে এ সম্বন্ধে প্রথম যে বাণী অবতীর্ণ হয় সেটি এই ঃ

> যারা যুদ্ধ করে তাদের অনুমতি দেওয়া গেল কেন না তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, আর আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ সক্ষম তাদের সাহায্য করতে—
>
> যারা তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে অন্যায় ভাবে এইজন্য ভিন্ন নয় যে তারা বলে ঃ আমাদের পালয়িতা আল্লাহ্। আর যদি না থাকতো আল্লাহ্‌র প্রতিরোধ মানুষের একদলের দ্বারা অন্য দলের, তবে নিঃসন্দেহ ভেঙে ফেলা হতো মঠ গির্জা ইহুদিভজনালয় ও মসজিদ যাতে আল্লাহ্‌র নাম প্রচুরভাবে নেওয়া হয় ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন যে তাঁকে সাহায্য করে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবল, মহাশক্তি—

এর পরে আল্লাহ্ নবীর কাছে পাঠান এই বাণী ঃ

† দ্রঃ কোরআন ১৪ ঃ ১২

আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত পীড়ন আর না থাকে, আর ধর্ম হবে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য……(৮ঃ ৩৯)।

যখন আল্লাহ্‌ যুদ্ধের অনুমতি দিলেন আর আনসারদের (মদিনার সাহায্যকারীদের) এই দল ইসলামের জন্য তাঁকে, তাঁর অনুবর্তীদের, আর যেসব মুসলনান তাদের আশ্রয় নিয়েছিল তাদের, সাহায্য করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো তখন রসুল তাঁর সঙ্গীদের……আদেশ করলেন মদিনায় হিজরত করতে আর তাদের আনসার ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হতেঃ "আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য ভাই ও গৃহ সৃষ্টি করবেন যাতে তোমরা নিরাপদ হবে।" এইভাবে তারা দলে দলে যাত্রা করলো, আর নবী মক্কায় রইলেন তাঁর পালয়িতার অনুমতি পেয়ে মক্কা ত্যাগ ক'রে মদিনায় হিজরত করবার জন্য।

যুদ্ধের অনুমতি যে হযরতের প্রথম মক্কায় লাভ হয় কোরআনের ইংরেজি অনুবাদক মৌলবী মোহম্মদ আলীও এই মত দিয়েছেন। মার্মাডিউক পিক্‌থলেরও এই মত। কিন্তু মৌলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁর (এবং আরো কারো কারো) সিদ্ধান্ত এই যে যুদ্ধের অনুমতি হযরতের লাভ হয়েছিল মদিনায়।

হযরতের অনুবর্তীরা ক্রমে ক্রমে প্রায় সবাই রওনা হয়ে গেল। কাউকে কাউকে কোরেশরা আটক ক'রে রাখলো, আর ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন, কাউকে কাউকে তারা অন্তত সাময়িকভাবে, ধর্মচ্যুতও করলো। মক্কায় রয়ে গেলেন হযরত নিজে আর হযরত আলী আর হযরত আবুবকর। হযরত হিজরতের জন্য আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষা করছিলেন। যখন হযরত আবুবকর হিজরত করার জন্য হযরতের অনুমতি চাইতেন তখন হযরত বলতেনঃ ব্যস্ত হয়ো না; হতে পারে আল্লাহ্‌ তোমাকে সঙ্গী দেবেন।

ইব্‌নে ইসহাকের গ্রন্থেই আছেঃ যখন কোরেশরা দেখলে হযরতের একটি অনুবর্তী দল গড়ে উঠেছে ভিন্ন দেশে আর ভিন্ন জাতির মধ্যে আর তাঁর সঙ্গীরা দেশত্যাগ করেছে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য, আর

সেখানে গিয়ে তারা আশ্রয় ও নিরাপত্তা দুইই লাভ করেছে, তখন তাদের ভয় হলো যে হযরত তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, আর তারা জানতো যে হযরত ঠিক করেছেন যে কোরেশদের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করবেন। তখন তারা সমবেত হলো তাদের দরবার-গৃহে কি করণীয় তা নির্ধারণ করতে।

প্রাচীন বিবৃতিতে আছেঃ শয়তান এই সভায় যোগ দিয়েছিল নেজ্‌দের এক সম্ভ্রান্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি শেখের বেশে। এই সভায় বিচার্য বিষয় দাঁড়ায়ঃ মোহম্মদকে আমৃত্যু কারারুদ্ধ করে রাখা হবে, না, ভিন্ন দেশে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। সেই শেখ এই দুই প্রস্তাবেরই অযৌক্তিকতা দেখিয়ে দেয়। তখন আবু জেহেল এই প্রস্তাব করেঃ প্রত্যেক গোত্র থেকে নেওয়া হোক একজন শক্তিমান তরুণবয়স্ক কুলগৌরবসম্পন্ন যোদ্ধাকে, তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হোক তীক্ষ্ণধার তরবারি যেন প্রত্যেকে মোহম্মদকে আঘাত হেনে হত্যা করতে পারে। এইভাবে তাকে তারা নিঃশেষ করতে পারবে আর তার রক্তের মূল্য দানের দায়িত্ব সব গোত্রের উপরে বর্তাবে। আব্‌দ্‌-মনাফের বংশের লোকেরা তাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না, কাজেই তাদের রক্তের মূল্যই নিতে হবে। তখন সেই শেখ বলে উঠলোঃ এই লোক ঠিক কথা বলেছে, আমার বিবেচনায় এই একমাত্র করণীয়।

এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কোরআনে আছেঃ

> আর যখন অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে তোমাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করবে, অথবা হত্যা করবে, অথবা তোমাকে তাড়িয়ে দেবে—আর তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহ্‌ও ষড়যন্ত্র করেছিলেন; আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্‌ শ্রেষ্ঠ। (৮ঃ ৩০)

হিজরত

এরপর জিব্রিল এসে হযরতকে বল্লেঃ যে বিছানায় আপনি ঘুমোন আজ সেখানে ঘুমোবেন না।

সেই রাত্রে হযরত গৃহত্যাগ করেন। তাঁর গৃহত্যাগ সম্বন্ধে প্রাচীন বিবরণে এই অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছেঃ কিছু রাত হতেই

আততায়ীরা তাঁর ঘর ঘেরাও করলে। হযরত সেই রাতে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন আলীকে, হযরতের চাদর মুড়ি দিয়ে তিনি শুয়েছিলেন। আবু জেহেল হযরতেব বাণত বেহেশত ও দোযখ সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করে। হযরত এক মুঠো ধুলো হাতে নিয়ে এসে বলেন—তুমি সেই দোযখের বাসিন্দাদের একজন আর সূরা 'ইয়াসিনে'র প্রথম আট আয়াত পড়তে পড়তে তাদের মাথার উপরে সেই ধুলো দিয়ে বাড়ী থেকে চলে যান। আল্লাহ্ আততায়ীদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করেছিলেন, সেজন্য তারা তাঁকে দেখতে পায় নি।

কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য বর্ণনাও আছে :

ঘাতকগণ হযরতের বাটীর দ্বারদেশে বসিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতেছিল এবং দ্বারের ফাটল দিয়া শয্যার উপর শায়িত আলীকে দেখিয়া তাহারা মনে করিতেছিল যে হযরতই শুইয়া আছেন। এই সময় সদর দিয়া বাহির হওয়া সম্ভব হইবে না দেখিয়া হযরত বাটীর অন্যদিকের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতঃ বহির্গত হইয়া পড়েন। হযরতের পরিচারিকা মারিয়া বলিতেছে : "হেজরতের রাত্রে আমি অবনমিত হইলে হযরত আমার পিঠের উপর পা দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়াছিলেন।" [১]

ইব্নে ইসহাকে আছে···আয়েশা বলেছেন : হযরত প্রত্যেক দিন আবু বকরের বাড়ীতে আসতেন হয় ভোরে না হয় রাত্রে। যেদিন তাঁর মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি মিললো সেদিন তিনি এলেন দুপুরে —এমন অসময়ে তিনি কখনো আসতেন না···আবু বকরকে তিনি বল্লেন : আল্লাহ্ আমাকে চলে যাবার ও দেশ ত্যাগ করবার অনুমতি দিয়েছেন। আবু বকর জিজ্ঞাসা করলেন : দুইজন একসঙ্গে? হযরত উত্তর দিলেন : দুইজন একসঙ্গে। ·· হযরত আয়েশা বলেছেন : এই কথায় আবু বকরের মতো এমন আনন্দের অশ্রু বিসর্জন করতে আমি আর কখনো কাউকে দেখি নি। এই যাত্রার জন্য আবু বকর দুইটি

১। মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য।

উট কিনে রেখেছিলেন। হযরত একটি উট নিলেন কিন্তু বিনামূল্যে নিতে রাজি হলেন না, দাম দিয়ে নিলেন। উটের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিল আবদুল্লাহ্ বিন আরকত। সে তখনও ছিল বহুদেববাদী।

একটু রাত হলে আবু বকরের ঘরের পিছনের জান্‌লা দিয়ে হযরত ও হযরত আবু বকর বেরিয়ে গেলেন আর মক্কার দক্ষিণে প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী সওর পর্ব্বতের এক উঁচু গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এই পথটি খুব বন্ধুর। হযরত আবু বকর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে বল্লেন মক্কার লোকেরা কি বলে সেই খবর রাত্রিকালে তাঁকে জানাতে। হযরত আবু বকরের মুক্ত দাস আমীর বিন্ ফুহেরা তার ভেড়ার পাল দিনে বাইরে চরিয়ে রাতে সেই গুহার কাছে নিয়ে যেতো ও তাঁদের দুধ সরবরাহ করতো। এবং তাঁদের জন্য দুই একটি জবাইও করতো। আবু বকরের কন্যা আসমা রাতে তাঁদের জন্য খাবার পৌঁছে দিতেন।

এই গিরি-গুহায় বাসের বর্ণনা কোরআনে এইভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ

> যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না করো আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন যারা অবিশ্বাসী তারা তাঁকে বার করে দিয়েছিল, তিনি ছিলেন দুইজনের দ্বিতীয় জন যখন তাঁরা দুইজন ছিলেন পাহাড়ের গুহার ভিতরে, যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন ঃ দুঃখে অভিভূত হয়ো না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে ; তারপর আল্লাহ অবতীর্ণ করেছিলেন তাঁর শান্তি তাঁর উপরে আর তাঁর বল বৃদ্ধি করেছিলেন সৈন্যদল দিয়ে যাদের তোমরা দেখো নি, আর যারা অবিশ্বাসী তাদের বাণীকে তুচ্ছতম করেছিলেন, আর আল্লাহ্‌র বাণী—তা হচ্ছে উচ্চতম। আর আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী। (৯ ঃ ৪০)

এঁরা দুইজন সেই গিরিগুহায় ছিলেন তিন দিন। হযরতকে না পেয়ে কোরেশরা ঘোষণা করে, যে তাঁকে ধরে আনতে পারবে* তাকে একশত উষ্ট্রী পুরস্কার দেওয়া হবে। তাঁদের রওনা হওয়ার সময়ে আস্‌মা একু

* ইব্‌নে ইসহাক দ্রষ্টব্য।

থলি খাবার নিয়ে এলেন, কিন্তু উপরে বেঁধে দেওয়ার জন্য রশি আনতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর কোমরবন্ধ ছিঁড়ে তার আধখানা দিয়ে সেই রশির কাজ চালালেন, আর আধখানা তাঁর কোমরবন্ধরূপে ব্যবহার করেন। এই থেকে তিনি নাম পান "দুই কোমরবন্ধওয়ালী"।

হযরত ও আবু বকর রওনা হয়ে গেলে আবু জেহেল ও আরো কয়েকজন কোরেশ আবু বকরের দরজায় এসে তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করে। আস্‌মা উত্তর দেন তিনি জানেন না। তাতে আবু জেহেল তাঁর মুখে এমন জোরে চড় মারে যে তাঁর কানের বালি খুলে পড়ে যায়।

আবু বকর চলে যাবার সময় তাঁর সব টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়ে যান। তাতে তাঁর অন্ধ পিতা আবু কোহাফা অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন। আস্‌মা তখন এক কুলুঙ্গিতে কতকগুলো পাথর রেখে তার উপরে একটা কাপড়ের ঢাকা দিয়ে তাঁর পিতামহকে বলেন: টাকাপয়সা আছে, দাদা, আপনি হাত দিয়ে দেখুন। তা নেড়েচেড়ে বৃদ্ধ বল্লেন: হাঁ, তোমাদের জন্য যথেষ্ট রেখে গেছে, চিন্তিত হবার কারণ নেই।

অনেক বিবরণে আছে: হযরতের ও হযরত আবু বকরের সওর গিরি-গুহায় প্রবেশের পরে সেই গুহার মুখে মাকড়সা জাল বোনে ও পায়রা ডিম পাড়ে, তাই দেখে অনুসন্ধানকারীরা আর সেই গুহায় ঢোকে না।

বহু বিবরণে আছে: সোরাকা নামে এক ব্যক্তি হযরত ও তাঁর সঙ্গীদের খবর পেয়ে পুরস্কারের লোভে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁদের পশ্চাৎধাবন করে। যাত্রা করার পূর্বে সে ভাগ্যনির্দেশক তীর ছোঁড়ে, কিন্তু উত্তর পায় "তাঁর কোনো ক্ষতি করো না"। তবু সে তার ঘোড়া ছোটায়। কিন্তু ঘোড়া হোঁচট খেয়ে তাকে ফেলে দেয়। পুনরায় সে ভাগ্যনির্দেশক তীর ছোঁড়ে, পুনরায় উত্তর পায় "তাঁর কোনো ক্ষতি করো না"। কিন্তু সে দমে না। পুনরায় তার ঘোড়া হোঁচট খায় ও তাকে ফেলে দেয়, আর পুনরায় সে তীর ছুঁড়ে পূর্বের উত্তরই পায়। সোরাকা বলছে: "আমি ঘোড়া চালিয়েই চল্লাম, অবশেষে সেই অল্প কয়েকটি যাত্রীর যখন দেখা

পেলাম তখন আমার ঘোড়া হোঁচট খাওয়ার ফলে তার সামনের দুই পা মাটির মধ্যে বসে গেল ও আমি পড়ে গেলাম ; যখন ঘোড়া তার দুই পা বার করে নিতে পারলো তখন মাটি থেকে ধোঁয়া উঠল ধূলিঝড়ের মতো। এই দেখে আমি বুঝলাম তাঁর ক্ষতি করবার সাধ্য আমার নেই বরং তিনি আমার সম্বন্ধে উপরহাত হবেন। আমি তাঁদের ডেকে নিজের পরিচয় দিলাম ও অপেক্ষা করতে বল্লাম এই বলে' যে আমার থেকে তাঁদের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। রসুল আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করতে বল্লেন আমি কি চাই, আমি বল্লাম ঃ আমাকে একটি লেখন দিন যা হবে আপনাদের ও আমার মধ্যেকার একটি চিহ্ন। রসুল আবু বকরকে তেমন কিছু লিখে দিতে বল্লেন ; সেই লেখন (হাড়ের উপর লেখা হয়েছিল না কাগজের উপরে লেখা হয়েছিল সোরাকার তা স্মরণ ছিল না) সোরাকা হযরতকে দেখায় তাঁর মক্কা ও তায়েফ ও হুনায়েন বিজয়ের পরে। তখন সোরাকা হযরতকে শুধু বলতে পেরেছিল ; আমার উটগুলোর জন্য যে পানী মজুদ রাখি বাইরের উটরা এসে তা খেয়ে যায় ; তাদের যে এমন পানী খেতে দিই তার জন্য আমার কি কোনো পুরস্কার মিলবে ? হযরত বলেছিলেন ঃ হাঁ,—প্রত্যেক তৃষ্ণার্ত জীবকে পানী খাওয়ানোর জন্য পুরস্কার আছে।

পথে দয়াবতী উম্মেমা'বদে-র আবাসে উপনীত হয়ে হযরত ও তাঁর সঙ্গীরা খাদ্য ও পানীয়ের প্রার্থী হন। তিনি বিষণ্ণ মুখে উত্তর দেন—"না মহাশয়। থাকিলে মূল্য দিতে হইত না, আমি নিজেই তাহা উপস্থিত করিতাম। আশ্রমের এক প্রান্তে একটি ছাগী শুইয়াছিল, হযরত উম্মেমা'-বদকে বলিলেন—উহাকে দোহন করিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করা যাইতে পারে কি ? উম্মেমা'বদ উত্তর করিলেন, ছাগীটি কৃশ বলিয়া পালের সহিত চরিতে যায় নাই। যদি উহার স্তনে দুধ থাকে, তবে তাহা আপনি দোহন করিয়া লইতে পারেন। হযরত 'বিছমিল্লা' বলিয়া, তাহাকে দোহন করিলেন। সম্ভবতঃ কৃশ মনে করিয়া কয়েক দিন তাহাকে দোহন করা হয় নাই, তাহার স্তনে কয়েক দিনের যে দুগ্ধ সঞ্চিত ছিল, তাহা পথিক-

গণের পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর হইল না। দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পান করার নিয়ম আরবে প্রচলিত ছিল। সুতরাং হযরত ও তাঁহার সঙ্গীত্রয় কতকটা দুগ্ধ পান করিয়া তাহার একাংশ আশ্রম-স্বামিনীর জন্য রাখিয়া দিয়া সকলে আবার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।"*

সোরাকার আক্রমণের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছিল, পথে আসলাম বংশের প্রধান বারিদা তার ৭০ জন দুর্ধর্ষ অনুচরকে নিয়ে হযরতের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু হযরতের কোরআন্ পাঠ শুনে ও তাঁর কথা শুনে তার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সে ও তার অনুবর্তীরা হযরতের আনুগত্য স্বীকার করে। (মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য)

* মোস্তফা চরিত দ্রষ্টব্য

দ্বিতীয় খণ্ড

সংঘর্ষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মদিনায় প্রথম দুই বৎসর

মদিনার লোকেরা আগ্রহের সঙ্গে হযরতের আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। তারা ভোরে নামায পড়ে শহরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতো যে পর্যন্ত না রোদ প্রখর হতো। হযরতের কাফেলাকে প্রথম আসতে দেখে একজন ইহুদী—সে তখন তার দুর্গ-প্রাচীরের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে চেঁচিয়ে বল্লে—ও হে কায়লা গোত্রের লোকেরা, তোমাদের সৌভাগ্য এসেছে। মুসলমানেরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেখল হযরত ও হযরত আবু বকর উট থেকে নেমে এক খেজুরের গাছের ছায়ায় বসেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত কে তা তারা চিনলো যখন তারা দেখলে হযরত আবু বকর তাঁর বহির্বাস মেলে ধরে হযরতকে সূর্যোত্তাপ থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন। এই পল্লীর নাম কোবা। মূয়রের গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে হযরত কোবায় পৌঁছেছিলেন ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৮ জুন তারিখে—সোমবারে। পথে তাঁর কেটেছিল আট দিন।

বলা বাহুল্য কোবায় হযরত খুব আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করেন। এখানে তিনি ৪ দিন (মতান্তরে চৌদ্দ দিন) কাটান। হযরত আলী এখানে এসে হযরতের সঙ্গে মিলিত হন। হযরতের মক্কা ত্যাগের পরে তিনি তিন দিন ও রাত্রি সেখানে ছিলেন হযরতের কাছে লোকদের যেসব গহনা ও টাকা পয়সা আমানত থাকতো তা ফেরৎ দেবার জন্য। দেশের লোক হযরতের চরম শত্রু হয়েও তাঁর বিশ্বস্ততায় আস্থা হারায়নি।

কোবায় হযরত একটি মসজিদের পত্তন করেন। এই মসজিদ্ বিখ্যাত। শুক্রবারে হযরত কোবা থেকে মদিনায় যাত্রা করেন তাঁর প্রিয় আল্-কাসওয়া উষ্ট্রীতে আরোহণ করে। জুমার নামাযের সময় উপস্থিত হলে বনি সালিম গোত্রের পল্লীতে তিনি জুমার নামায সমাধা করেন। এই ইসলামে প্রথম জুমার নামায পাঠ। নামায অন্তে পুনরায় চলতে আরম্ভ করেন। তাঁকে অতিথিরূপে পাবার জন্য বহুজন চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি বলেন, উষ্ট্রী তার ইচ্ছা মতো চলুক। শেষে উষ্ট্রী গিয়ে যেখানে থামলো সেখানে ছিল আবু আইয়ুব আনসারির বাড়ী। তাঁর আগ্রহে হযরত তাঁর আতিথ্যই স্বীকার করলেন। যেখানে উষ্ট্রী বসে পড়েছিল সেটি ছিল দুই জন নাবালকের জমি। হযরত সেখানে মসজিদ্ তৈরি করতে চাচ্ছেন জেনে তারা সেই জমি বিনামূল্যে দিতে রাজি হলো, কিন্তু হযরত দশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে তা নিলেন। এই অর্থ দিলেন হযরত আবু বকর। যতদিন মসজিদ্ এবং হযরতের কামরাগুলো নির্মিত না হয়েছিল (কামরাগুলোর আয়তন ছিল বারো কি চৌদ্দ বর্গ ফুট, রোদে শুকোনো ইটের তৈরি, তার ছাদ হাতে নাগাল পাওয়া যেতো) ততদিন তিনি বাস করেছিলেন আবু আইয়ুব আনসারির বাড়ীতেই। আবু আইয়ুবের যত্ন ও শ্রদ্ধার কথা অনেক হাদিসে বাণত হয়েছে।

এই মসজিদ্ নির্মাণের কাজে হযরত নিজে যোগ দিয়েছিলেন—নিজে পাথর বয়েছিলেন। এতে নির্মাতারা সুর করে গেয়েছিল ঃ

কোনো জীবন নেই পরকালের জীবন ব্যতীত ;

হে আল্লাহ্, আনসার ও মোহাজীরদের উপরে করুণা করো।

হযরতও সেই সুরে সুর মিলিয়েছিলেন।

এর পর হযরতের পরিজন, হযরত আবু বকরের পরিজন এবং অন্যান্য মুসলমান মক্কা থেকে মদিনায় চলে এলেন। কেবল রয়ে গেল তারা যাদের কোরেশরা আটক করে রেখেছিল, আর যারা ইসলাম ত্যাগ করেছিল †। ক্রমে ক্রমে মদিনার সব আনসার পরিবারই

† ইব্‌নে ইসহাক দ্রষ্টব্য।

ইসলাম গ্রহণ করলো, কেবল গ্রহণ করলো না আউস গোত্রের আউস আল্লাহ্ নামের এইসব পরিবার—খাৎমা, ওয়াকিফ, ওয়েল এবং উমাইয়া। এরা বহুদেববাদাই রইল।

ইসলামের একটি বড় শিক্ষা হচ্ছে—মোমিনরা (বিশ্বাসীরা) পরস্পরের ভাই। হযরত মদিনায় এসে মোহাজীর (শরণার্থী) আর আনসারদের (সাহায্যকারীদের) মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন দৃঢ় করলেন। ইব্‌নে ইসহাকের গ্রন্থে আছে হযরত বলেছিলেন: তোমরা প্রত্যেকে আল্লাহকে স্মরণ ক'রে একজন ভাই নাও।—তিনি আলীর হাত ধরে বল্লেন এই আমার ভাই। হামযা হলেন যায়েদ বিন্ হারিসার ভাই। আবু বকর হলেন খারিজা বিন্ যুহের-এর ভাই। ওমর হলেন ঈৎবান বিন মালিক খাযরাজি আনসারির ভাই। আবদুর রহমান বিন্ আউফ হলেন সাদ বিন্ আল্-রবির ভাই। ওসমান বিন্ আফফান হলেন আউস বিন্ সবিৎ আনসারির ভাই। তাল্‌হা বিন্ উবায়েদুল্লাহ হলেন কাআব বিন্ মালিকের ভাই। ইত্যাদি। এঁরা পরস্পরের সত্যকার ভাই হলেন। আনসাররা মহাজীরদের অর্থ ও জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করতে মুক্তহস্ত হলেন আর মক্কার শরণার্থীরাও ব্যবসায়ে ও অন্যান্য কাজে মন দিলেন। আবু বকর ও ওমর চাষের কাজে সাহায্য করতে তৎপর হলেন। মোহাজীর ও আনসারদের অপূর্ব প্রীতিবন্ধনের ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার বহু কহিনী বর্ণিত হয়েছে। একটি এই:

> মদিনার প্রধান ধনী ছাআদ-বেন-রবী প্রবাসী আবদুর রহমানের ভ্রাতৃরূপে নির্বাচিত হইলে, ছাআদ ভাবের আবেশে মাতওয়ারা হইয়া যখন আপনার সমস্ত ধন সম্পত্তির অর্ধেক অংশ (এমন কি আপনার দুই স্ত্রী'র মধ্যে একটি) স্বীয় ধর্মভ্রাতাকে দান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন আবদুর রহমান অতি সংযত ভাষায় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখান করতঃ ধন্যবাদ সহকারে বলিলেন—'ভাই, আমাকে তোমাদের বাজারের পথ দেখাইয়া

দাও'। তখন লোকে তাঁহাকে 'বনি কাইনোকা' বাজারের পথ দেখাইয়া দিল। আবদুর রহমান প্রথমে মাথায় মোট করিয়া সেই বাজারে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন এবং কালে তদ্দ্বারা বহু ধনের অধিপতি হইয়া পড়িলেন।

এই আত্মীয়তার বন্ধন অনুসারে, প্রথম প্রথম প্রবাসী মুসলমানদিগকে উত্তরাধিকারের স্বত্ব পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। কোন আনছার পরলোক গমন করিলে জুবেল-আরহাম বা দূরবর্তী দায়াদকে বঞ্চিত করিয়া এই 'ধর্মভাই' তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিতেন। কিছুদিন পরে—সম্ভবতঃ বদর সমর শেষ হইয়া গেলে— এই উত্তরাধিকার স্বত্ব রহিত হইয়া যায়। †

যখন মদিনার মসজিদ তৈরি হচ্ছিল তখন ঘটে বিখ্যাত ইসলাম-প্রচারক আবু উমামা আস্‌আদ্ বিন্ যুরারা-র মৃত্যু—ডিপথিরিয়া রোগে। তাঁর মৃত্যুতে হযরত বলেন ঃ আবু উমামার মৃত্যু কি শোচনীয় ; ইহুদী ও আরবদের মধ্যে যারা কপট তারা নিশ্চয় বলবে ঃ সে (মোহম্মদ) যদি আল্লাহর নবী হতো তবে তার সঙ্গী এমন করে মারা যেত না ; কিন্তু আমার নিজের ও আমার সঙ্গীদের সম্বন্ধে (মৃত্যু রোধ করার ব্যাপারে) কোনো শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ আমাকে দেন নি।

হযরত যখন মদিনায় আসেন তখন মদিনার স্বাস্থ্য ছিল খুব খারাপ। নবাগত মুসলমানরা অনেকেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলেন, কেবল হযরত আক্রান্ত হন নি। তিনি প্রার্থনা করেন ঃ হে আল্লাহ্, মদিনাকে আমাদের কাছে মক্কার মতো প্রিয় করো—তার চাইতেও বেশি প্রিয় করো।

এই বৎসরেই সুপরিচিত ইসলামীয় অনুষ্ঠান আযান প্রবর্তিত হয়।

এই বৎসরেই বিখ্যাত ইহুদী পণ্ডিত আবদুল্লাহ্ বিন্ সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন আমি রসুলের কথা শুনি তখনই তাঁর বর্ণনা থেকে ও তাঁর নাম থেকে ও তাঁর আবির্ভাবের সময় থেকে আমি বুঝেছিলাম যে তিনি হচ্ছেন সেই নবী যাঁর প্রতীক্ষা

† মোস্তফা চরিত দ্রষ্টব্য।

আমরা করছিলাম। আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম, কিন্তু এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলি নি তাঁর মদিনায় না আসা পর্যন্ত।······আমি সোজা তাঁর কাছে গিয়ে মুসলমান হলাম আর বাড়ী ফিরে আমার পরিজনদের ইসলাম গ্রহণ করতে বল্লাম।" কিন্তু আবদুল্লাহ্ বিন্ সালাম তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ইহুদীদের কাছে রাষ্ট্র না ক'রে হযরতকে তাদের ডেকে জানতে বলেন ইহুদ সমাজে তাঁর (আবদুল্লাহ্ বিন্ সালামের) কি স্থান। হযরতের প্রশ্নে ইহুদীরা বল্লেঃ আবদুল্লাহ্ বিন্ সালাম আমাদের প্রধান, আমাদের প্রধানের পুত্র, তিনি আমাদের ধর্মনেতা—বিদ্বান। তখন আবদুল্লাহ্ তাদের সামনে এসে বল্লেনঃ "হে ইহুদী সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌কে ভয় করো আর তিনি যা পাঠিয়েছেন তা গ্রহণ করো, কেন না আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা জানো তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রসুল, তওরাতে তাঁর বর্ণনা পাবে, এমন কি তাঁর নামও, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি আল্লাহ্‌র রসুল; আমি তাঁতে বিশ্বাস করি, তাঁকে সত্য বলে জানি, আর তাঁর আনুগত্য স্বীকার করি।" বলাবাহুল্য ইহুদীরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে আর তাকে গালি দেয়।

কিন্তু মদিনায় এসে হযরত তাঁর অপূর্ব শুভবুদ্ধির ও কর্মক্ষমতার প্রভাবে যে অসাধারণ কাজটি করলেন—অসাধারণ শুধু ধর্মের দিক দিয়ে নয় মানব-সভ্যতার দিক দিয়েও—সেটি হচ্ছে মদিনার মুসলমান, ইহুদী, আর অমুসলমানদের সহায়তায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। এ সম্বন্ধে মোস্তফা-চরিতে লেখা হয়েছেঃ

······মদিনার ও তৎপার্শ্ববর্তী পল্লীগুলি তখন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তিনটি, "জাতির" আবাসভূমি। পরস্পর বিপরীত চিন্তা রুচি ও ধর্মভাব সম্পন্ন এহুদী, পৌত্তলিক ও মুসলমানদিগকে দেশের সাধারণ স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গল বিধানের জন্য, একই কর্মকেন্দ্রে সমবেত করিতে হইবে, তাহাদিগকে একটা রাজনৈতিক 'জাতি' বা 'কওমে' পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যে, এক দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়সমূহ, নিজের ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াও,

দেশমাতৃকার সেবা-মন্দিরে একত্র সমবেত হইতে পারে এবং এইরূপ হওয়াই কর্তব্য।

জগতে সর্বপ্রথমে এই আদর্শ স্থাপন করিলেন—হেজাজের মরুপ্রান্তর-বাসী নিরক্ষর মোহম্মদ মোস্তফা। তিনি মদিনার এহুদী, পৌত্তলিক ও মুসলমানদিগকে একত্র করিয়া এক প্রতিজ্ঞাপত্র বা আন্তর্জাতিক সনন্দ······লিপিবদ্ধ করাইলেন, এবং মদিনার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও পরস্পর-বিদ্বেষ-পরায়ণ বিভিন্ন গোত্রের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মানব সকলকে লইয়া এক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই আন্তর্জাতিক সনন্দে, প্রথমে মোহাজের আনছার ও অন্যান্য মুসলমানদিগকে পরস্পরের সম্বন্ধ ও স্বত্বাধিকার এবং তাঁহাদের সমাজগত বিষয়-সমূহের শাসন ও বিচারের বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইল। তাহাতে এই কথাটি পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সকল বিষয়ের মীমাংসার ভার মুসলমান-জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকিবে। পৌত্তলিকদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম করিয়া, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বীকৃত হইল। তবে ইহুদী ও মুসলমান-দিগের ন্যায় তাহাদিগকেও কতকগুলি সাধারণ শর্তে আবদ্ধ করা হইল।······

পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের অধিবাসীদিগকে এবং মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী বিভিন্ন 'জাতি'কে এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করা হয়। ফলতঃ যাহাতে ভাবী যুদ্ধবিগ্রহের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়া যায়, হযরত সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। এই উদ্দেশ্যে হযরত ওদ্দান, বোওয়াত, জুল আশীরা প্রভৃতি স্থানে স্বয়ং গমন করিয়া, সন্ধিপত্রে স্থানীয় অধিবাসীগণের স্বাক্ষর ও সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই বিখ্যাত সনদের একটি অংশের অনুবাদ আমরা দিচ্ছি :

······(দুই পক্ষেরই) সাধারণ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ রত থাকা কালে মুসলমানদের সঙ্গে ইহুদীরা যুদ্ধের খরচ দেবে। মদিনার অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ ইহুদীদের গোত্রগুলো সবাই মিলে

মুসলমানদের সঙ্গে একজাতি হয়েছে। ইহুদীরা নিজেদের ধর্ম অনুসরণ করবে, মুসলমানেরা অনুসরণ করবে নিজেদের ধর্ম। যেমন ইহুদীরা তেমনি তাদের সঙ্গে যারা সংযুক্ত তারাও (নিজেদের ধর্ম অনুসরণ করবে)। কেউ যুদ্ধযাত্রা করবে না মোহম্মদের অনুমতি ব্যতিরেকে। কিন্তু তাদের বৈধ বদলা নেবার অধিকার থাকবে। ইহুদীরা দায়ী থাকবে তাদের যেসব খরচপত্র হবে সেসবের জন্য, মুসলমানরা (দায়ী থাকবে) তাদের খরচপত্রের জন্য, কিন্তু আক্রান্ত হলে একে অন্যের সাহায্যে অগ্রসর হবে। যারা এই সন্ধিবদ্ধ হলো তাদের জন্য মদিনা হবে পবিত্র ও অনাক্রমণীয়। যেসব বিদেশীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তাদের প্রতি তেমনি ব্যবহার করা হবে যেমন ব্যবহার করা হবে আশ্রয়দাতাদের প্রতি, কিন্তু কোনো নারীকে আশ্রয় দেওয়া হবে না তার স্বজনদের অনুমতি ব্যতিরেকে। সমস্ত মতভেদ ও বাদবিসম্বাদের মীমাংসার ভার দেওয়া হবে আল্লাহ্ ও রসুলের উপরে। কেউ মক্কার লোকদের অথবা তাদের পক্ষভুক্ত লোকদের সঙ্গে যোগ দেবে না কেন না সম্মিলিত দলরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে যে মদিনা আক্রমণ করবে তাদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ ও সন্ধি হবে সম্মিলিত ভাবে।...

এই যুগান্তকারী সনদকে কিন্তু অচিরে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হলো। আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা যখন ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলো তখন তাদের মধ্যে যারা ইসলামে প্রকৃতই বিশ্বাসী হয় নি, বরং পূর্বপুরুষের ধারাই আঁকড়ে ছিল, তাদেরও অনেকে সেই জনমতের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করল না। কিন্তু ইসলামের প্রতি তাদের সেই বিমুখতা সুযোগ বুঝে তারা প্রকাশ করতে লাগল। এই দল মোনাফেক—কপট—নামে পরিচিত হলো। —অনেক ইহুদী পণ্ডিতও ইসলামের প্রতি তাদের বিরূপতা প্রকাশ্যভাবে দেখাতে লাগলো হযরতের সামনে নানা কূটতর্কের অবতারণা করে'। ইহুদীরা ও কপটরা কত ভাবে হযরতকে বিব্রত করতে তৎপর হয়েছিল সে সম্বন্ধে বহু কথা

আছে সূরা বাকারায়। কপটদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ বিন্ উবাই। তার বিরোধিতার সঙ্গে আমরা পরে পরে পরিচিত হব। হযরতের মদিনায় আসার পূর্বে আবদুল্লাহ বিন্ উবাই মদিনার রাজারূপে গৃহীত হতে যাচ্ছিল, এমন কি তার জন্য একটি মুকুটও প্রস্তুত করা হয়েছিল। ইবনে ইসহাকের গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই সম্বন্ধে এই বিবৃতিটি আছে ঃ

'হযরত এক গাধায় চড়ে যাচ্ছিলেন অসুস্থ সা'দ বিন্ উবাদাকে দেখতে, হযরতের পেছনে বসেছিলেন যায়েদ, গাধার উপরে যে জিন ছিল তার উপরে ছিল ফাদাকের কাপড়, আর তার লাগামটি ছিল খেজুরের বাকলের। পথে পড়ে আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাইয়ের দুর্গ, তার ছায়ায় সে লোকজন নিয়ে বসে ছিল। সৌজন্য বোধ থেকে হযরত গাধা থেকে নামলেন ও কিছুক্ষণ বসলেন। তিনি কোরআন আবৃত্ত করলেন ও তাকে আহ্বান করলেন আল্লাহর পানে। তাকে তিনি উপদেশ দিলেন, সাবধান করলেন আর তার কাছে সুসংবাদ প্রচার করলেন; কিন্তু সে নাক উঁচিয়ে রইল, একটি কথাও বললে না। হযরতের বলা শেষ হলে সে বল্লে ঃ আপনি যা বল্লেন তা যদি সত্য হত তবে এর চাইতে ভালো আর কিছুই হতো না। কিন্তু নিজের বাড়ীতে বসে থাকুন আর যদি কেউ আপনার কাছে আসে তবে তাকে এসব বলুন, কিন্তু যারা আপনার কাছে যায় না তাদের পীড়াপীড়ি করবেন না, আর কোনো লোকের মজলিসে আসবেন না সেই কথা নিয়ে যা সে পছন্দ করে না। আবদুল্লাহ্ বিন্ রাওয়াহা সেখানে বসে ছিলেন : তিনি ছিলেন মুসলিম, তিনি বল্লেন ঃ আপনি অবশ্যই এই নিয়ে আমাদের বৈঠকে বাসায় ও বাড়ীতে আসবেন, কেন না আল্লাহ্‌র শপথ, এই আমরা ভালবাসি আর এই দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের সম্মানিত করেছেন, আর এর দিকে তিনি আমাদের চালিত করেছেন। যখন আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই দেখলে তার লোকেরা তার বিরোধী হয়েছে সে বল্লে ঃ

'যখন বন্ধু তোমার বিরোধী হয়েছে তখন তুমি অবশ্যই সম্ভ্রমহীন হবে;
আর তোমার শত্রুরা তোমাকে পর্যুদস্ত করবে;

বাজ কি আকাশে উড়তে পারে তার পাখা বাদ দিয়ে ?
যদি তার পালক কাটা যায় তবে সে পড়ে যায় মাটিতে।

হযরত উঠে সা'দ বিন্ উবাদার বাড়ীতে গেলেন। আল্লাহ্‌র শত্রু ইব্‌নে উবাই-এর কথায় তাঁর যে মনঃক্ষোভ হয়েছিল তা তাঁর মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল। সা'দ জানতে চাইলেন কেন হযরতকে ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে, যেন তিনি এমন কোনো কথা শুনেছেন যা তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছে। হযরত ইব্‌নে উবাই যা বলেছিল তা বল্লেন। সা'দ বল্লেন ঃ তার প্রতি কঠোর হবেন না, কেন না আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এমন সময়ে যখন আমরা তার অভিষেকের জন্য একটি মুকুট তৈরী করছিলাম। আল্লাহ্‌র শপথ, সে ভাবছে আপনি তার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন।"

এসবের সঙ্গে যুক্ত হ'ল মুসলমানদের সম্বন্ধে কোরেশদের অনমনীয় মনোভাব। মৌলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁ-র ও হাফিয গোলাম সরওয়ারের গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ও তার দলকে লেখা কোরেশদের এই গোপন-পত্র উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"হে মদীনাবাসী ! (তোমরা আমাদের ধর্মাবলম্বী হইয়াও) আমাদের সেই পরম শত্রু মোহম্মদকে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়াছ। হয় তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, না হয় নিজেদের দেশ হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিবে। আমরা চরম দিব্য করিয়াছি যে যদি এই দুইটি শর্তের কোনো একটি তোমরা অবলম্বন না কর, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের সমস্ত শক্তি লইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিব, তোমাদের যুবকদলকে নিহত করিব এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে বাঁদী বানাইয়া লইব।"

ইব্‌নে ইসহাকের গ্রন্থে আছে—অন্যান্য বিবরণেও আছে—হযরতের প্রচারের আদেশ প্রাপ্তির ১৩ বৎসর কাল পূর্ণ হলে ও তাঁর মদিনায় আগমনের এক বৎসর পরে, আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী তিনি তাঁর শত্রুদের সঙ্গে ও বহুদেববাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

তিনি প্রথম যে অভিযান করেন তার নাম আল্‌আব্‌ওয়া-র অভিযান। এতে তিনি একটি কোরেশ দল ও বানু-যাম্‌রা-র বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। কিন্তু কোরেশদের দেখা পান না। বানু-যাম্‌রা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে। সেখান থেকে মদিনায় পৌঁছবার পূর্বে তিনি হাম্‌যাকে আল্‌-ইসের নিকটবর্তী সমুদ্রতীরে পাঠান মোহাজীরদের ৩০ জন আরোহীকে সঙ্গে দিয়ে। সেখানে আবু জেহেলের তিন শত আরোহীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়; কিন্তু কোনো যুদ্ধ হয় না। এর পরে তিনি অভিযান করেন বুওয়াতের অভিমুখে দুই শত জন মোহাজীর ও আনসার সঙ্গে নিয়ে। এবারও কোনো যুদ্ধ হয় না। এর দুই কি তিন মাস পরে তিনি একটি দল পাঠান ইয়ান্‌-বো উপত্যকায় আল্‌ উশায়েরায়। এবারও কোনো যুদ্ধ হয় না। তিনি সেখানকার বানু-মুদ্‌লিজ ও তাদের মিত্রদের সঙ্গে সন্ধি করেন। এরপর রসুল সা'দ বিন্ আবু-ওয়াক্কাসকে অভিযানে পাঠান ৮ জন মোহাজীর সঙ্গে দিয়ে, তিনি হেজাজের আল-খার্‌রার পর্যন্ত যান। কিন্তু কোনো যুদ্ধ হয় না।

আল-উশায়েরা থেকে হযরতের ফিরবার দিন দশেকের মধ্যে মক্কার কুর্য বিন জাবির আল-ফিহ্‌রি ও তার দলবল মদিনার মাঠ থেকে অনেক উট ও ভেড়া ধরে নিয়ে যায়। হযরত তাদের খোঁজে বদরের নিকটবর্তী সাফাওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত যান কিন্তু কুর্য ও তার দলবলকে ধরতে পারেন না।

এর মাস আড়াই পরে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ জহশের নেতৃত্বে ৮ জন মোহাজীরকে তাঁর সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। তার হাতে দিলেন একটি সীল করা পত্র এই নির্দেশ দিয়ে যে এই পত্র যেন সে না পড়ে দুই দিনের পথ অতিক্রম করার পূর্বে, তারপর এই পত্র খুলে পত্রের লেখা অনুযায়ী যেন কাজ করে, কিন্তু সঙ্গীদের কারো উপরে যেন কোনো জোর-জবরদস্তি না করে।

'আবদুল্লাহ্ দুই দিনের পথ অতিক্রম করে এই পত্র খুলে দেখল তাতে লেখা আছে 'আমার এই পত্র পড়ার পরে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী

নাখলা পর্যন্ত এগিয়ে যাও, সেখানে অপেক্ষা করে কোরেশদের গতিবিধি লক্ষ্য করো'। পত্র পড়ে সে বল্লেঃ শোনার অর্থ আজ্ঞার অনুবর্তী হওয়া। তারপর সে তার সঙ্গীদের বল্লেঃ রসুল আমাকে আদেশ করেছেন নাখলায় গিয়ে কোরেশদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে যেন আমি তাদের সংবাদ তাঁকে দিতে পারি; তোমাদের কাউকে পীড়াপীড়ি করতে তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন; সেজন্য যদি তোমাদের কেউ শহীদ হবার গৌরব লাভ করতে চায় তবে সে এগোক, আর যে চায় না সে ফিরে যাক, আমি তাই করছি যা রসুল আদেশ করেছেন। এই বলে সে অগ্রসর হলো। তার সঙ্গীরাও অগ্রসর হলো—কেউ পিছিয়ে রইল না। একটি উট হারিয়ে যায়, তাতে দুইজন (সা'দ ও উৎবা) সেই উটের খোঁজে রইল, অবশিষ্ট কয়েকজন নাখলায় পৌঁছলো। কিস্‌মিস্‌ চামড়া এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে কোরেশের এক কাফেলা তাদের পাশ দিয়ে গেল। কোরেশের কাফেলায় ছিল আমর বিন্‌ আল্‌ হাযরামি, উসমান বিন্‌ আব্দুল্লাহ ও তার ভ্রাতা নওফল, আল্‌ হাকাম বিন্‌ কাইসান্‌, প্রভৃতি। সেই দিন ছিল রজবের শেষ দিন। অভিযান-কারীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল এবং এই পবিত্র মাসেও কাফেলার কোরেশদের আক্রমণ করতে মনস্থ করলো। তাদের তীরে আমর বিন্‌ আল্‌ হায়রামি নিহত হলো আর ওসমান এবং আল হাকাম আত্মসমর্পণ করল—নওফল (ও আরও কয়েকজন) পালিয়ে গেল। আব্দুল্লাহ ও তার সঙ্গীরা কাফেলা ও দুইজন বন্দীকে নিয়ে মদিনায় এল।

হযরতের কাছে তারা যখন এলো তখন তিনি বল্লেনঃ আমি তোমাদের পবিত্র মাসে যুদ্ধ করতে আদেশ দিই নি। ফলে কাফেলা ও দুইজন বন্দী অমনি রইল, হযরত এই অভিযানকারীদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেন। হযরতের কথায় অভিযানকারীরা হতাশ হলো—তারা ভাবলো তারা ধ্বংস পাবে। তাদের মুসলমান-ভাইরাও তাদের কাজের জন্য নিন্দা করলেন। আর কোরেশরা বলতে লাগলঃ মোহম্মদ ও তার সঙ্গীরা পবিত্র মাসের নিয়ম ভঙ্গ করেছে, তাতে রক্তপাত

করেছে, লুণ্ঠন করেছে, আর লোকদের বন্দী করেছে। তখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ হলো এই বাণী ঃ

তারা তোমাকে পবিত্র মাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে—তাতে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে। বলো ঃ এই মাসে যুদ্ধ করা গুরুতর (সীমালঙ্ঘন), কিন্তু (লোকদের) আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফেরানো, আর তাঁকে অস্বীকার করা, আর (লোকদের) পবিত্র মসজিদ থেকে ফেরানো, আর এর লোকদের তা থেকে বার করে দেওয়া, এসব আল্লাহ্‌র কাছে আরো গুরুতর অপরাধ, আর উৎপীড়ন হত্যার চাইতে গুরুতর। আর তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থামাবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের ধর্ম থেকে তোমাদের ভ্রষ্ট করতে পারে⋯ যদি তা পারে⋯⋯

এই বাণী অবতীর্ণ হলে মুসলমানদের দুশ্চিন্তা দূর হলো, আর হযরত কাফেলা ও বন্দীদের গ্রহণ করলেন। কোরেশ ওসমান ও আল্‌ হাকামকে মুক্তি দেবার কথা বলে পাঠালো। তাতে হযরত বল্লেন ঃ আমরা এদের মুক্তি দেবো না যে পর্যন্ত না আমাদের দুইজন (যে দুইজন উট খোঁজার জন্য ছিল) ফিরে আসে কেন না তাদের বিষয়ে তোমরা অনর্থ করতে পার আমাদের এমন ভয় আছে। যদি তোমরা তাদের হত্যা করো তবে আমরাও তোমাদের দুই বন্ধুকে হত্যা করবো। সেজন্য যখন সা'দ ও উৎবা ফিরে এলো তখন হযরত মুক্তিপণ গ্রহণ করে' বন্দী দুইজনকে মুক্তি দিলেন। এদের দুইজনের মধ্যে আল্‌হাকাম ইসলাম গ্রহণ করে' হযরতের সঙ্গে রইল, সে পরে বীরমৌনায় শহীদ হয়, আর ওসমান মক্কায় ফিরে গেল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌ ও রসুলের জন্য (অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্য) রইল, আর পাঁচ ভাগের চার ভাগ অভিযানকারীরা পেল।

হযরতের মদিনায় আগমনের দ্বিতীয় বৎসরে বদর যুদ্ধের পূর্বে পর্যন্ত কোরেশদের বিরুদ্ধে যেসব "অভিযান" তিনি পাঠিয়েছিলেন প্রাচীন বিবরণে সেসবকে অভিযানই বলা হয়েছে—অর্থাৎ প্রাচীন চরিতকার ও ঐতিহাসিকদের মতে সে-সবের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ও লুণ্ঠন, কেন না

উৎপীড়নকারী কারেশেদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ হযরত মক্কাতেই লাভ করেছিলেন। কিন্তু একালের কোনো কোনো চরিতকারের মতে হযরত যুদ্ধের আদেশ পান মদিনায়, আর এই সব তথাকথিত অভিযানের উদ্দেশ্য যুদ্ধ ও লুণ্ঠন ছিল না, ছিল কোরেশদের গতিবিধি লক্ষ্য করা,—এসবের শেষ অভিযানটিতে ভিন্ন কোনোটিতে কোনো রক্তপাত অথবা লুণ্ঠন হয় নি, আর শেষেরটিতেও রক্তপাত ও লুণ্ঠন হয়েছিল হযরতের আদেশ ব্যতিরেকে।—সবটা ভেবে দেখে আমাদের মনে হয়েছে ঃ বদর যুদ্ধের পূর্বে হযরত যেসব 'অভিযান' পাঠিয়েছিলেন সেসব মুখ্যতঃ ছিল কোরেশ দের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করারই জন্য, তবে সেসবের সাহায্যে মুসলমানদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার কাজেও তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন, কেন না উৎপীড়নকারী কোরেশদের সঙ্গে যুদ্ধের অবস্থাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শেষ অভিযানটি সম্পর্কে হযরত যে বাণী পেলেন তা থেকে তাই প্রতিপন্ন হয়।

হযরত প্রকাশ্য প্রচারের জন্য আদেশ পেয়েও সেই প্রচারে রত হন বেশ কিছু কাল পরে, তেমনি উৎপীড়নকারীদের সংগে যুদ্ধ করার আদেশ পেয়েও সেই আদেশ পুরোপুরি কার্যে পরিণত করতে সময় নেন। সময় নেন শক্তি সংগ্রহের জন্যও বটে আর বিশেষ করে' বিপক্ষকে তাদের আচরণ সম্বন্ধে সমঝে দেখার জন্য। কুর্যের মদিনার মাঠ থেকে উট ও ভেড়া ধরে নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে কোরেশ কোনো কথাই বলে নি।

হযরত যে সংঘর্ষ যথাসম্ভব এড়াতে চেয়েছিলেন, আর সমঝোথা ও মৈত্রী বিশেষভাবে কামনা করেছিলেন এ পর্যন্ত তার অনেক পরিচয় আমরা পেয়েছি। সে-সবের মধ্যে মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ আর মদিনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে'র প্রতিষ্ঠা খুব চোখে পড়ে। কিন্তু উৎপীড়ন, অবমাননা, স্বেচ্ছাচার, এ সবের সামনে নতশির হয়ে থাকা —এ হযরত চান নি, কেন না 'উৎপীড়ন হত্যার চাইতে গুরুতর'। বদর যুদ্ধের পরেও তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় আমরা পাব। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক ইয়োরোপীয় ইসলাম-তত্ত্ববিদ্ হযরতের এই মনোভাবের দিকে তেমন মনোযোগ দেন নি।

এতদিন মুসলমানদের কিবলা ছিল জেরুজালেম, অর্থাৎ তাঁরা নামায পড়তেন জেরুজালেমের দিকে মুখ করে। হযরতের মদিনায় আসবার সতেরো মাস পরে এই কিবলার পরিবর্তন হয়; তখন থেকে মক্কার 'কাবা'র দিকে মুখ করে তাঁরা নামায পড়তে থাকেন। বলা বাহুল্য ইহুদীরা এতে অসন্তুষ্ট হয়, কেন না তারা তাদের 'নামায' সমাধা করতো জেরুজালেমের দিকে মুখ করে।

বদরের যুদ্ধ

দ্বিতীয় হিজরির রমযান মাসে (জানুয়ারী, ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ) ঘটে বদর সমর। এইটিই ইসলামের প্রথম সমর—খুব অর্থপূর্ণ। আবুসুফিয়ান তার প্রকাণ্ড কাফেলায় ৫০ হাজার দিনারের (স্বর্ণ মুদ্রার) বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে সিরিয়া থেকে ফিরছিল। ইব্‌নে ইসহাকের গ্রন্থে আছে, আবুসুফিয়ানের সিরিয়া থেকে ফেরার সংবাদ পেয়ে হযরত মুসলমানদের ডেকে বল্লেন: কোরেশ-কাফেলা তাদের বহু ধনসম্পত্তি নিয়ে আসছে, আক্রমণ করতে যাও, হয়তো আল্লাহ্‌ এটি তোমাদের শিকাররূপে (বৈধ লুণ্ঠন রূপে) দেবেন। আবু সুফিয়ান হযরতের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে যম্‌যম বিন্‌ আমর নামক এক ব্যক্তিকে দ্রুতগামী উটে মক্কায় পাঠিয়ে দেয় এই সংবাদ দিয়ে যে কোরেশ তাদের ধনসম্পদ রক্ষা করতে অগ্রসর হোক—মোহম্মদ ও তার দলবল তা লুটে নেবার আয়োজন করেছে।

যম্‌যম্‌ মক্কায় পৌছে' তার উটের নাক কান কেটে তাকে রক্তাক্ত করলো আর নিজের জামা ছিঁড়ে উটের উপরে থেকে চিৎকার করে বলতে লাগল: কোরেশ! কাফেলার উট! কাফেলার উট! মোহম্মদ আর তার দলবল লুটে নিতে এগিয়েছে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে তোমাদের যে মাল-মাত্তা আছে সব—মনে করিনা তোমরা আর তা পাবে—সাহায্যে এগোও সাহায্যে এগোও। মক্কার লোকেরা অবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে এলো। তারা

বলতে লাগলো ঃ মোহম্মদের দলবল কি ভাবছে যে এও হতে যাচ্ছে ইব্‌নে হাযরামির কাফেলার মতো ? আল্লাহ্‌র দিব্য, তারা শীগশীগিরই জানবে যে ব্যাপারটা তা নয়।—প্রত্যেকে, হয় নিজে অথবা তার প্রতিনিধি, রওনা হলো। প্রধানদের মধ্যে কেবল আবু লাহাব রয়ে গেল, সে তার জায়গায় পাঠালো আল্‌-আস্‌ বিন্‌ হিশামকে, সে আবু লাহাবের কাছে চার হাজার দিরহাম্‌ ধারতো, আবু লাহাবের স্থলাভিষিক্ত হয়ে সে তার ঋণ শোধ করার সুযোগ পেল।

কোরেশ-বাহিনী যম্‌যমের সংবাদ দেবার দুই তিন দিনের মধ্যে যাত্রা করলো। যে সময় কোরেশ মক্কা থেকে বেরুলো প্রায় সেই সময় হযরতও মদিনা থেকে বেরিয়েছিলেন।

পথে কোরেশ-বাহিনী জানতে পারে আবুসুফিয়ানের কাফেলা নিরাপদে এগিয়ে এসেছে, আর আবুসুফিয়ানের এই বার্তাও তারা পেলে যে মক্কার দলের আর এগিয়ে কাজ নেই। তাদের মধ্যে তখন আলোচনা হলো তারা এগোবে, না মক্কায় ফিরে যাবে। তাদের মধ্যে শান্তিকামী দল বল্লে ঃ

যুদ্ধে আমাদের ভাইদের ও জ্ঞাতিদের হত্যা করার পরে জীবনের আর কি অর্থ আমাদের জন্য থাকবে ? এখন আমরা ফিরে যাই এই দায়িত্ব নিয়ে যে নাখলায় নিহত আমর-এর শোণিত-পণ আমরা আদায় করতে তৎপর হব। কিন্তু অন্যেরা—তাদের মধ্যে আবু জেহেল প্রধান—চাইলে কোরেশ-সৈন্য অগ্রসর হোক। তারা বল্লে ঃ আমরা যদি ফিরে যাই তবে বলা হবে আমরা ভীত হয়ে পিছিয়েছি। বরং আমরা বদরে যাব, আর সেখানে জলাশয়ের ধারে তিন দিন পান ভোজন ও উৎসব করব। সমস্ত আরব আমাদের কথা শুনতে পাবে আর এর ফলে আমাদের ভয় করে চলবে।

যোহরা গোত্রের লোকেরা কোরেশ-দলের সঙ্গী হয়েছিল। কোরেশের ধনসম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে দেখে তাদের নেতা বল্লে, আবু

জেহেলের কথা মতো যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এই বলে তারা কোরেশদের ত্যাগ করে ফিরে গেল।

হযরতের নেতৃত্বে মুসলমানরা, কাফেলা নিয়ে আবু স্থফিয়ান, আর কোরেশ সৈন্যদল, সবাই অগ্রসর হচ্ছিল বদরের জলাশয় বা কুয়োগুলোর দিকে। পথে আস-সাফ্রার নিকটবর্তী স্থান থেকে হযরত দুইজনকে বদরে পাঠালেন আবুস্থফিয়ান ও তার কাফেলার সংবাদ জানতে। তারা বদরে পৌঁছে জানতে পেলে আবু স্থফিয়ানের কাফেলা সেখানে পরের দিন অথবা তার পরের দিন পৌঁছবে; এইটি জেনে তাড়াতাড়ি তারা হযরতের কাছে ফিরে এলো ও যা জেনেছিল তা বল্লে।

আবু স্থফিয়ান বদরের নিকটবর্তী হয়ে একাই বদরের জলাশয়ের কাছে এসে তার পূর্বে যে দুইজন সেখানে এসেছিল তাদের কথা শুনতে পেলে, আর উটের নাদা ভেঙে দেখলে তার মধ্যে মদিনার খেজুরের ছোট আঁটি রয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়ে তার কাফেলা নিয়ে ভিন্ন পথে সমুদ্রের ধারে চলে গেল ও এইভাবে মুসলমানদের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ল। এইভাবে নিরাপদ হয়ে সে কোরেশদের সংবাদ পাঠিয়েছিল।

বদরের অদূরবর্তী যাফিরান নামক স্থানে হযরত জানতে পেলেন যে কোরেশ তাদের দলবল নিয়ে তাদের কাফেলা রক্ষা করতে অগ্রসর হয়েছে। তিনি সঙ্গীদের সে কথা জানালেন ও তাঁদের মত চাইলেন। আবু স্থফিয়ান যে নাগালের বাইরে চলে গেছে সে কথা মুসলমানেরা জানতে পারে বদরে পৌঁছে। আবু বকর ও ওমর পর পর উঠে ত্বরিত অগ্রগতির প্রয়োজনের কথা বল্লেন। তার পর আল্ মিকদাদ্ দাঁড়িয়ে যুদ্ধে হযরতকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। হযরত তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন ও আশীর্বাদ করলেন। তার পর তিনি আনসারদের মত চাইলেন, কেন না তারাই ছিল সংখ্যায় বেশি। আরো বিশেষ করে এই জন্য যে আকাবায় যখন তিনি তাদের আনুগত্য লাভ করেছিলেন তার শর্ত ছিল যে নিজেদের অঞ্চলে তারা হযরতের নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকবে, যেমন তারা দায়ী তাদের স্ত্রীদের ও সন্তানসন্ততির রক্ষার জন্য; তাই হযরতের

মনে সন্দেহ ছিল যে মদিনার বাইরে এমন যুদ্ধে তারা যোগ দিতে নাও পারে। তাঁর এই কথা শুনে সা'দ বিন্ মোয়ায বল্লেনঃ আমরা আপনাতে বিশ্বাস করি, আপনার সত্য ঘোষণা করি, আর আমরা সাক্ষ্য দিই যে আপনি যা এনেছেন তাই সত্য, আর আপনাকে আমরা কথা দিয়েছি এবং আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি শুনতে ও আজ্ঞানুবর্তী হতে, অতএব অগ্রসর হোন যেখানে আপনার খুশী, আমরা আপনার সঙ্গে আছি, আল্লাহর শপথ, আপনি যদি আমাদের বলেন সমুদ্র লঙ্ঘন করতে আর আপনি যদি তাতে ঝাঁপ দেন তবে আমরা আপনার সঙ্গে তাতে ঝাঁপ দেবো, আমাদের একজনও পেছনে পড়ে থাকবে না; ফলে আপনার শত্রুদের সম্মুখীন হতে আমরা বিমুখ নই, আমরা যুদ্ধ জানি, লড়াইয়ে নির্ভরযোগ্যও; হতে পারে আল্লাহ আমাদের এমন কিছু আপনাকে দেখাতে দেবেন যা আপনাকে আনন্দ দেবে; সেজন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদের সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করুন। †

সা'দের কথা শুনে হযরত খুশী হলেন ও খুব উৎসাহিত হলেন। তার পর তিনি বল্লেনঃ হিম্মৎ নিয়ে এগিয়ে যাও, কেন না আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে দুই দলের ‡ একটি আমার হবে, আর আল্লাহ্‌র শপথ, আমি যেন দেখছি শত্রুদল ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে। এর পর বদরে পৌঁছে হযরত জানতে পেলেন কোরেশের সৈন্যদল আছে সামনের পাহাড়ের পেছনে, সংখ্যায় তারা হবে ন'শ থেকে হাজার, কেন না, তাদের খাদ্যের জন্য রোজ নটি কি দশটি পশু জবাই হয়, আরো জানতে পেলেন কোরেশ দলে আছে উৎবা, শায়বা, আবুল বখতরি, হাকিম, নওফল, আল্ হারিস বিন্ আমির, তুয়াইমা, আন্ নয্‌র, জামাআ, আবু জেহেল, উমাইয়া, নবিহ্, মুনব্‌বিহ্, সুহায়েল, আমর বিন্ আব্দুল উদ্দ্।

† মৌলানা আকরাম খাঁ বলেছেন, সা'দ ইব্‌নে মোয়ায বদরে উপস্থিত ছিলেন না। —তিনি মদিনায় তাঁর বক্তব্য হযরতকে জানিয়ে থাকবেন।

‡ আবু সুফিয়ানের কাফেলা অথবা কোরেশ সৈন্যদল।

(কোরআন্ ৮ : ৭ দ্রষ্টব্য)।

হযরত লোকদের বল্লেন ঃ মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলো † তোমাদের সামনে ফেলে দিয়েছে।

এই সময়ে বৃষ্টি হলো—কোরেশদের দিকে হলো খুব বেশি, মুসলমানদের দিকে কম, তাতে কোরেশদের গতি ব্যাহত হলো, কিন্তু মুসলমানদের গতি ব্যাহত হলো না।

বদরে পৌঁছে মুসলমানরা তার কুয়ো দখল করে নিলে; তাতে তাদের সুবিধা হলো, কোরেশদের হল অসুবিধা। পরের দিন ভোরে যখন কোরেশ দল পাহাড় অতিক্রম করে নামল, তাদের দেখে হযরত প্রার্থনা করলেন ঃ হে আল্লাহ্, কোরেশ আসছে তাদের অহঙ্কার ও দম্ভ দেখিয়ে তোমার প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করে আর তোমার রসুলকে মিথ্যা-বাদী বলে; হে আল্লাহ্, যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তুমি আমাকে দিয়েছ তা আজ দাও, আজ প্রাতে তাদের ধ্বংস করো।

কোরেশদের দলে যারা শান্তিকামী ছিল তারা যুদ্ধ না করার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করলে উৎবা বিন্ রাবিয়ার নেতৃত্বে। কিন্তু আবু জেহেল কোনো কথাই শুনলো না, সে বরং আমর বিন্ আল হাযরামির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তার ভাইকে উসকিয়ে দিল। সে শোকধ্বনি তুললো—হায় আম্‌র! হায় আম্‌র! তখন যুদ্ধের উত্তেজনা দেখা দিল। আবু জেহেল উৎবাকে কাপুরুষতার অপবাদ দিয়েছিল, সে তার ভাই ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রথম অবতীর্ণ হলো।

প্রথমে কোরেশ পক্ষের থেকে একজন চেষ্টা করে মুসলমানদের দখল-করা কুয়ো বা জলাশয় নষ্ট করতে। হাম্‌যার তরবারির আঘাতে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

এর পর উৎবা অগ্রসর হয়ে দ্বৈরথ যুদ্ধের আহ্বান জানালো। মুসলমানদের তরফ থেকে তিন জন আনসার এগিয়ে এলো। কোরেশ যোদ্ধারা জিজ্ঞাসা করলে ঃ তোমরা কারা? তারা বল্লে ঃ আমরা

† অর্থাৎ মক্কার সব চাইতে গণ্যমান্যদের।

কয়েকজন আনসার। কোরেশ বীররা বল্লেঃ তোমাদের দিয়ে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। কোরেশ নকিব তখন হাঁকলোঃ মোহম্মদ, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পাঠাও আমাদের গোত্রের যারা আমাদের সমকক্ষ তাদের। হযরত বল্লেনঃ ওঠো উবায়দা বিন্ হারিস, ওঠো হাম্‌যা, ওঠো আলী। তাঁরা উঠে কোরেশদের সম্মুখবর্তী হলে তারা জিজ্ঞাসা করলেঃ তোমরা কারা? আর প্রত্যেকের নাম জেনে বল্লেঃ হাঁ এরা সম্ভ্রান্ত আর আমাদের সমকক্ষ। এঁদের মধ্যে উবায়দা ছিলেন বয়সে সব চাইতে বড়, তিনি সম্মুখীন হলেন উৎবা বিন্ রাবিয়ার, আর আলী সম্মুখীন হলেন আল্-ওয়ালিদ্ বিন্ উৎবার। অবিলম্বে হাম্‌যা শায়বাকে হত্যা করলেন, আলী হত্যা করলেন আল্-ওয়ালিদকে। উবায়দা আর উৎবা পরস্পরকে আঘাত করলেন আর পরস্পরকে ঘায়েল করলেন। তখন হাম্‌যা ও আলী তরবারি হস্তে উৎবাকে আক্রমণ করলেন আর তাঁকে নিহত করে তাঁদের সঙ্গীকে নিজেদের মধ্যে নিয়ে এলেন। তাঁর পা কাটা পড়েছিল—তা থেকে মজ্জা বেরিয়ে পড়ছিল। যখন তাঁরা উবায়দাকে হযরতের কাছে আনলেন, তখন উবায়দা হযরতকে বল্লেনঃ হে আল্লাহ্‌র রসুল, আমি কি শহীদ নই? তিনি উত্তর দিলেনঃ নিঃসন্দেহ তুমি শহীদ্।

এরপর দুইদল এগিয়ে পরস্পরের নিকটবর্তী হ'ল। কোরেশ দলে ছিল অন্ততঃ নয় শত যোদ্ধা, তাদের মধ্যে তিন শত অশ্বারোহী—সবাই যোগ্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; আর মুসলমান-সৈন্য ছিল সংখ্যায় তিন শ'র সামান্য কিছু বেশি, অস্ত্রশস্ত্রেও তারা ছিল হীন। হযরত তাঁর সঙ্গীদের আদেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন শত্রুদের আক্রমণ না করে যে পর্যন্ত না তাঁর আদেশ পায় আর শত্রুসৈন্য যদি তাদের ঘেরাও করে তাদের যেন তারা দূরে রাখে তীর চালিয়ে।—তাঁর জন্য খেজুরের পাতা দিয়ে একটি চালা তৈরি করা হয়েছিল। তিনি ও আবু বকর ছিলেন তাতে।

বর্ণিত হয়েছেঃ বদর-যুদ্ধের দিন হযরত মুসলমান সৈন্যদের শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন একটি তীর হাতে নিয়ে। সওয়াদ নামে একজনের পেটে

তীর দিয়ে একটু খোঁচা দিয়ে তিনি বল্লেন ঃ হে সওয়াদ, কাতার ঠিক কর। তখন সওয়াদ বলে ঃ হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনি আমাকে আঘাত দিয়েছেন, আর আল্লাহ্‌ আপনাকে পাঠিয়েছেন ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে, সেজন্য আমাকে প্রতিশোধ নিতে দিন। হযরত তাঁর পেট অনাবৃত ক'রে বল্লেন ঃ তোমার প্রতিশোধ নাও। সওয়াদ তাঁকে আলিঙ্গন করে তাঁর পেটে চুমু খেলে। হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে এমন করলে কেন! সে উত্তর দিলে ঃ হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনি দেখছেন কি আমাদের সামনে, আজকার যুদ্ধে বাঁচতে নাও পারি, আর এই যখন আপনার সঙ্গে আমার শেষ সময়, আমি চাই, আমার গাত্রচর্ম আপনার গাত্রচর্ম স্পর্শ করুক। হযরত তাকে আশীর্বাদ করলেন।

সৈন্যদের কাতার ঠিক করে হযরত তাঁর চালায় প্রবেশ করলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন কেবল আবু বকর। হযরত আকুল হয়ে তাঁর প্রভুর সমীপে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তাঁর প্রভু তাঁকে দিয়েছিলেন তার জন্য। তিনি যা বলেছিলেন তার একটি অংশ এই ঃ হে আল্লাহ, এই দল যদি আজ বিনষ্ট হয়, তবে তোমার উপাসনা করবার আর কেউ থাকবে না।—কিন্তু আবু বকর বল্লেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনি বার বার অনুনয় করছেন এতে আল্লাহ্‌ রুষ্ট হবেন, তার কারণ, আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনাকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।—এই চালার ভিতরে হযরতের একটু তন্দ্রা এসেছিল, জেগে উঠে তিনি বল্লেন ঃ আবু বকর, আনন্দিত হও, আল্লাহ্‌র সাহায্য তোমাদের কাছে পৌঁছেচে, এই তো জিব্রিল ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে চালাচ্ছে, তার দাঁতের উপরে ধুলো জমেছে!

বিপক্ষের শরাঘাতে দুইজন মুসলমান নিহত হলো। তখন হযরত লোকদের সামনে গিয়ে এই বলে তাদের উদ্বুদ্ধ করলেন ঃ যাঁর হাতে মোহম্মদের প্রাণ সেই আল্লাহ্‌র শপথ, আজ যে তাদের বিরুদ্ধে অবিচলিত সাহসে যুদ্ধ করবে, এগোবে, পিছে হঠবে না, আল্লাহ্‌ তাকে প্রবেশ করাবেন বেহেশতে। এতে মুসলমানদের

মনে অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হলো। একজন খেজুর খাচ্ছিল, খেজুর ফেলে দিয়ে সে তলোয়ার হাতে যুদ্ধে ছুটে গেল, আর শহীদ্ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করল। আর একজন হযরতকে জিজ্ঞাসা করেঃ কিসে আল্লাহ্ তাঁর দাসকে দেখে আনন্দের হাসি হাসেন। হযরত উত্তর দিলেনঃ যখন সে বর্ম না পরে শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুনে সে তার বর্ম খুলে ফেলে তলোয়ার হাতে যুদ্ধে ছুটে গেল, আর মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করল।

সৈন্যরা যখন যুদ্ধে অগ্রসর হয়ে পরস্পরের নিকটবর্তী হলো তখন আবূ জেহেল চেঁচিয়ে বল্লেঃ হে আল্লাহ্, আজ প্রাতে ধ্বংস করো তাকে যে আমাদের মধ্যে সব চাইতে বেশি রক্তের বন্ধন ছিন্ন করেছে আর তাই করেছে যা বৈধ নয়। ইবনে ইসহাক বলেছেনঃ এইভাবে আবূ জেহেল নিজেকেই মৃত্যুর মুখে সঁপে দিলে।

তারপর রসুল হাতে এক মুঠো কাঁকর নিয়ে কোরেশ সৈন্যের দিকে ফিরে বল্লেনঃ তাদেব মুখ বিকৃত হোক।—তারপর তিনি সেই কাঁকরগুলো ছুঁড়ে মারলেন আর তাঁর সঙ্গীদের আদেশ দিলেন আক্রমণ করতে।

সেদিনকার যুদ্ধে শত্রুদল পর্যুদস্ত হলো। তাদের প্রধানদের অনেকেই নিহত হলো ও বন্দী হলো।

হযরত সেদিন মুসলমানদের বলেছিলেনঃ বনি হাশিমের কেউ কেউ এবং অন্যেরাও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে; তোমরা যদি কেউ বনি হাশিমের কাউকে পাও, অথবা আবূল বখ্‌তরিকে অথবা আল্ আব্বাসকে তবে তাকে মেরে ফেলো না, কেননা সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছে। আবূ হুযায়ফা বল্লেঃ আমরা কি তবে আমাদের পিতাদের পুত্রদের আর ভাইদের আর পরিজনদের হত্যা করব আর আল্ আব্বাসকে ছেড়ে দেবো? আল্লাহ্‌র শপথ, আমি যদি তার দেখা পাই তবে আমার তলোয়ার মারবো তার চোয়ালে। এই কথা হযরতের কানে পৌঁছলে তিনি হযরত ওমরকে বল্লেনঃ হাফ্‌সের পিতা,

পয়গাম্বরের চাচার মুখে কি তলোয়ার মারা সঙ্গত? ওমর উত্তর দেন: (যে বলেছে) তার মাথা আমাকে উড়িয়ে দিতে দিন; আল্লাহর শপথ, এই লোক কপট মুসলমান। এই কথায় আবু হুযায়ফা খুব ভীত হয়েছিল। আল্-ইয়ামামার যুদ্ধে সে শহীদ্ হয়।

রসুল আবুল বখতরিকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন মক্কায় তিনি যে হযরতের প্রতি বহু সময়ে অনুকূলতা করেছিলেন সেইজন্য। বয়কট তুলে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আনসারদের একজন তাঁর দেখা পায় আর তাঁকে জানায় হযরত তাঁকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আবুল বখতরির সঙ্গে এক সোয়ারিতে যে ছিল তার সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসা করেন: আমার এই বন্ধুর কি হবে? আনসার উত্তর দেয়: রসুল শুধু তোমার সম্বন্ধেই আমাদের আদেশ দিয়েছেন। আবুল বখতরি বল্লেন: তাহলে আমিও মরবো তার সঙ্গে, মক্কার মেয়েলোকেরা না বলুক যে আমি আমার জীবন রক্ষা করার জন্য বন্ধুকে ত্যাগ করেছি।—আনসার গিয়ে হযরতকে জানায় সে আবুল বখতরিকে বন্দী ক'রে আনতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আবুল বখতরি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয় না, ফলে সে মারা গেছে।

আব্দুর রহমান বিন্ আউফের হাতে তাঁর পুরাতন বন্ধু উমাইয়া বিন্ খলফ্ ও তার পুত্র বন্দী হয়। উমাইয়া মক্কায় বেলালের উপরে ঘোর অত্যাচার করতো। সে তাকে দেখে চিৎকার করে লোক জড়ো করে আর আব্দুর রহমান বিন্ আউফের প্রতিবাদ সত্ত্বেও জনতা তাদের কেটে টুকরো টুকরো করে।

কেউ কেউ বলেছে এই যুদ্ধে তারা ফেরেশতাদের অংশ গ্রহণ করতে দেখেছিল, তাদের মাথায় ছিল সাদা পাগড়ী।

শত্রুরা পর্যুদস্ত হলে হযরত আদেশ দেন নিহতদের মধ্যে আবু জেহেলের খোঁজ করতে। তাকে প্রথম দেখতে পান মোয়ায বিন্ আম্‌র বিন যামু। মোয়ায বলেছেন: আমি লোকদের মুখে শুনলাম

আবু জেহেল আছে এক ঘন কাঁটা-ঝোপের মধ্যে, তাকে নাগালে পাওয়া যাচ্ছে না। এই কথা শুনে আমি তার দিকে এগোলাম। তলোয়ারের নাগালের মধ্যে পেয়ে আমি তাকে আঘাত করলাম, তাতে তার পায়ের নলার অর্ধেক কেটে ছিটকে পড়লো। তার পুত্র ইক্‌রামা আমার কাঁধের উপরে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো, তাতে আমার হাত কেটে পড়ে চামড়া থেকে ঝুলতে লাগলো। এই হাত টেনে টেনে সমস্ত দিন আমি যুদ্ধ করলাম; যখন খুব যন্ত্রণা হলো আমি সেই হাতের উপরে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে তা টেনে ছিঁড়ে ফেল্লাম।—এই মোয়ায বিন্ আমর্ হযরত ওসমানের শাসনকাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন।

মোয়ায বিন্ আমর্-এর পরে আর একজন আবু জেহেলের উপরে আঘাত হানে। আবু জেহেলকে মুমূর্ষু অবস্থায় পায় আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌উদ। একে আবু জেহেল এক সময়ে হাতের নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছিল ও ঘুষি মেরেছিল। আবু জেহেলের ঘাড়ে পা দিয়ে সে বল্লে: আল্লাহর শত্রু, আল্লাহ্ তোমাকে তো লজ্জা দিয়েছেন? সে উত্তর দেয়: তিনি আমাকে কেমন করে লজ্জা দিয়েছেন? তোমরা যেসব লোককে মেরেছ আমি কি তাদের থেকে অদ্ভুত কিছু? বলো, যুদ্ধের গতি কি হলো? আব্দুল্লাহ্ তাকে জানায় যুদ্ধে আল্লাহ ও রসুলের জিত হয়েছে। আবদুল্লাহ বলতো আবু জেহেল তাকে বলেছিল: ক্ষুদ্র রাখাল—উঠেছ বড় দূর।—আবদুল্লাহ্ আবু জেহেলের মাথা কেটে হযরতের কাছে এনে বলে: এই আল্লাহর শত্রু আবু জেহেলের মাথা। রসুল আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।

বর্ণিত আছে, বদর ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে উক্‌কাশা বিন্ মিহ্‌সানের হাতে তার তলোয়ার ভেঙে যায়। রসুলের কাছে এলে তিনি তাকে একটি কাঠের লাঠি দেন ও তাই দিয়ে যুদ্ধ করতে বলেন। সেইটি নিয়ে ঘুরোতে ঘুরোতে তা তার হাতে হয়ে উঠলো এক দীর্ঘ মজবুত চকচকে তলোয়ার আর তাই দিয়ে সে যুদ্ধ করল—যে পর্যন্ত না আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দিলেন।

রসুলের আদেশে মৃত সবাইকে একটি গর্তে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু উমাইয়া বিন্ খলফ্‌কে ফেলা হয় নি কেন না, তার শরীর তার বর্মের মধ্যে এত ফুলে গিয়েছিল যে তা থেকে বার করতে গেলে তা ছিঁড়ে যাচ্ছিল, কাজেই তা যেখানে ছিল সেখানেই তারা রেখে দিল, আর তা ঢেকে দিল মাটি ও পাথর দিয়ে।

তাদের যখন গর্তে ফেলা হচ্ছিল তখন রসুল দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—হে গর্তের অধিবাসীরা, তোমরা কি দেখেছ যে আল্লাহ্ যার ভয় দেখিয়েছিলেন তা সত্য? আমি দেখছি আমার প্রভু আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য হয়েছে। তাঁর সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি মৃতদের বলছেন? তিনি উত্তর দেন, তারা জানে যার কথা তাদের তিনি বলছিলেন তা সত্য।

একটি বিবরণে আছে রসুলের সঙ্গীরা মধ্যরাত্রে তাঁকে বলতে শুনেছিলেন: হে গর্তের অধিবাসীরা—হে উৎবা, হে শায়বা, হে উমাইয়া, হে আবু জেহেল, (যাদের গর্তে ফেলা হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের নাম ক'রে ক'রে বলেছিলেন) তোমরা কি বুঝেছ আল্লাহ তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য? আমার প্রভু আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমি বুঝেছি তা সত্য। মুসলমানরা বলেছিলেন: আপনি কি মৃত দেহদের সম্বোধন করছেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের চাইতে বেশি ভালো শোনো না, কিন্তু তারা আমার কথার জবাব দিতে পারে না।

যখন রসুল তাদের গর্তে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন তখন উৎবার দেহ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বর্ণিত হয়েছে: হযরত, উৎবার পুত্র আবু হুযায়ফা-র মুখপানে চেয়ে দেখলেন সে দুঃখিত হয়েছে আর তার রং বদলে গেছে। হযরত এই ধরনের কিছু বলেছিলেন: তোমার পিতার ভাগ্য দেখে তুমি হয়ত খুব আঘাত পেয়েছ। আবু হুযায়ফা উত্তর দিয়েছিল: না, আমার পিতার সম্বন্ধে ও তাঁর মৃত্যুর সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু আমার পিতাকে আমি জানতাম

একজন জ্ঞানবান মার্জিতরুচি ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক বলে, সেজন্য আমি আশা করেছিলাম যে তিনি ইসলামের দিকে আসবেন। কিন্তু যখন আমি দেখলাম কি তাঁর ভাগ্যে ঘটেছে আর তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছেন অবিশ্বাসী অবস্থায়, তাঁর সম্বন্ধে আমার এমন আশা পোষণ করার পরে, তখন তাতে আমি দুঃখিত হয়েছি। রসুল তাকে আশীর্বাদ করলেন ও তার সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বল্লেন।

বদরে এমন কয়েকজন লোক মারা পড়েছিল যারা এক সময়ে মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু হযরত যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন তাদের আপন জনেরা তাদের আটকে রেখে ধর্মত্যাগী করেছিল। সম্ভবতঃ তাদের সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

> নিঃসন্দেহ ফেরেশতারা যাদের গ্রহণ করে (মৃত্যুতে), আর তারা ছিল নিজেদের প্রতি অন্যায়কারী, (ফেরেশতারা) তাদের জিজ্ঞাসা করবে কি অবস্থায় তোমরা ছিলে? তারা বলবেঃ আমরা সংসারে ছিলাম দুর্বল। তারা বলবেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি বিস্তৃত ছিল না যার ফলে তোমরা দেশান্তরে যেতে পারতে? কাজেই এরাই তারা যাদের বাসস্থান জাহান্নাম--
>
> আর মন্দ সেই আশ্রয়—(৪ ঃ ৯৭)

লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কলহ দেখা দিয়েছিল। যারা সে সব সংগ্রহ করেছিল আর যারা যুদ্ধ করেছিল ও শত্রুর পশ্চাৎধাবন করেছিল তারা বলতে লাগল লুণ্ঠিত দ্রব্যে তাদের বেশি অধিকার। যারা হযরতকে পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত ছিল তারাও বলতে লাগল লুণ্ঠিত দ্রব্যে তারা সমান ভাগ পাবে। তখন অবতীর্ণ হয়েছিল সুরা আন্‌ফালের এই আয়াত ঃ

> তারা তোমাকে যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো যুদ্ধ লব্ধ সামগ্রীগুলো আল্লাহ ও রসুলের জন্য। সেজন্য আল্লাহর সীমারক্ষা করো আর তোমাদের মতভেদের বিষয়ে মীমাংসা

কোরে ফেলো আর আল্লাহ ও তাঁর বাণীবাহকের অনুবর্তী হও যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৮ ঃ ১)

আর জেনো যা কিছু বস্তু তোমরা যুদ্ধে লাভ করো তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য আর রসুলের জন্য আর (রসুলের) নিকট-আত্মীয়দের জন্য আর অনাথ আর নিঃস্ব আর পথচারীদের জন্য, যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হও আর তাতে যা আমি অবতীর্ণ করেছিলাম আমার দাসের কাছে সেই মীমাংসাকারী দিনে যেদিন দুই দল মিলেছিল ; আর আল্লাহ সব-কিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন। (৮ ঃ ৪১)।

লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ করা হলো আস-সাফরায়। সবের এক পঞ্চমাংশ প্রাপ্য ছিল আল্লাহ্ ও রসুলের, অর্থাৎ রাষ্ট্রের, অবশিষ্ট অংশ সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হল যোদ্ধাদের মধ্যে। অশ্বারোহী তার ঘোড়ার জন্য পেল আরো দুই ভাগ। প্রত্যেকে পেল একটি উট সরঞ্জাম সমেত, অথবা দুইটি উট সরঞ্জাম ভিন্ন। হযরত পেলেন আবু জেহেলের উট ও যুলফিকার তরবারি †।

পথে আন্-নযর আর উক্‌বা এই দুইজন বন্দীর শিরশ্ছেদ হয়।

বিজয়ের বার্তাসহ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ রওয়াহা ও যায়েদকে মদিনার দুই অঞ্চলে পাঠান। যায়েদ মদিনায় পৌঁছে যখন চেঁচিয়ে বলেছিলেন ঃ উৎবা, শায়বা, আবু জেহেল, আবুল বখতরি, উমাইয়া, নুবাই, মুনাব্বিহ এই সব কোরেশ-প্রধান নিহত হয়েছে, তখন তাঁর পুত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ বাবা, এ সব কি সত্যি ? হাঁ, সত্যি— বলেছিলেন যায়েদ।—এই সময় মদিনার লোকেরা ব্যস্ত ছিল হযরতের কন্যা রুকাইয়া-কে কবরস্থ করা নিয়ে। তিনি অসুস্থ ছিলেন সেজন্য তাঁর স্বামী ওস্‌মান বিন্ আফফান যুদ্ধে যেতে পারেন নি।—হযরতের মদিনায় পৌঁছার একদিন পরে বন্দীরা পৌঁছে। নেতৃস্থানীয় আবু ইয়াযিদ সুহায়েল বিন্ আমরকে বন্দী করে আনা হয়েছিল। তাকে ঘরের কোণে ঘাড়ের সঙ্গে হাত-বাঁধা অবস্থায়

† যুয়ব দ্রষ্টব্য।

দেখে হযরতের পত্নী বিবি সওদার খুব দুঃখ হয়। তখনো পর্দার আদেশ আসে নি। তিনি বলে ওঠেনঃ আবু ইয়াযিদ, তুমি ধরা দিয়েছিলে সহজে, তোমার যোগ্যভাবে মৃত্যু বরণ করা উচিত ছিল। বিবি সওদা বলেন; সহসা হযরতের কণ্ঠস্বরে আমি চমকিত হলাম, তিনি বলেছিলেনঃ সওদা, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে চাও? বিবি সওদা বল্লেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ আবু ইয়াযিদ্‌কে এই অবস্থায় দেখে আমি আর ধৈর্য ধরতে পারি নি. সেজন্য আমি তাকে ওকথা বলেছিলাম। (আবু ইয়াযিদকে কিছু বেশি বাঁধা হয়েছিল, কেন না সে পালাতে চেষ্টা করেছিল)।

হযরত বন্দীদের তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। একজন বন্দীর উক্তি এইঃ বদর থেকে আমাকে আনা হলে আমি ছিলাম একদল আনসারের সঙ্গে; নবীর নির্দেশের অনুবর্তী হয়ে সকালে ও সন্ধ্যায় খাবার সময়ে তারা আমাকে দিতো রুটি আর নিজেরা খেত খেজুর; যদি কারো এক টুক্‌রো রুটি থাকতো সে আমাকে তা দিত; আমি লজ্জাবোধ করে তাদের একজনকে ফিরিয়ে দিতাম; কিন্তু সেই রুটি স্পর্শ না ক'রে সে আমাকে ফিরিয়ে দিত।

বহু কোরেশ-প্রধান বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এই সংবাদ যখন মক্কায় পৌঁছলো তখন অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চায় নি। আবু লাহাবের মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। আক্রমণের প্রচণ্ডতার সামনে কোরেশপক্ষ দাঁড়াতেই পারে নি, এই সংবাদ শুনে একজন বলেঃ ফেরেশ-তারা এই যুদ্ধে নেমেছিল। আবু লাহাব তার মুখে চড় মারে, আর তার পক্ষের লোকের কাছে মারও খায়। কয়েক দিনের মধ্যে আবু লাহাবের গা দিয়ে ফুস্কুড়ি বেরোয়, আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। কয়েক দিন তার শব অমনি পড়ে থাকে; শেষে তার ছেলেরা অতি কষ্টে তাকে মাটি চাপা দেয়।

আবু সুফিয়ানের এক পুত্র যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল। একজন মুসলমান হজ করতে যায়; আবু সুফিযান তাকে বন্দী করে রাখে আর তার ছেলেকে ছেড়ে দেওয়া হলে তাকে ছেড়ে দেয়।

বন্দীদের মধ্যে ছিলেন আবুল আস বিন্ আল্-রবি, তিনি ছিলেন হযরতের জামাতা, তাঁর কন্যা বিবি যয়নাবের স্বামী। আবুল আস মক্কার গণমান্যদের অন্যতম ছিলেন। তাঁকে মুক্ত করার জন্য হযরতের কন্যা যয়নাব মুক্তিপণ পাঠান আর তাঁর মায়ের দেওয়া হার পাঠিয়ে দেন। এই হার দেখে হযরত ভাবে অভিভূত হন। তিনি লোকদের বলেন: তোমরা যদি যয়নাবের স্বামীকে মুক্তি দিতে পারো আর তার অর্থও তাকে ফেরৎ দিতে পারো তবে দাও। সবাই তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন আর আবুল আসকে মুক্তি দিলেন এবং হযরতের কন্যাকে তাঁর অর্থ পাঠিয়ে দিলেন।

আবুল আসের সঙ্গে হযরতের কথা হয়েছিল যে তিনি বিবি যয়নাবকে মদিনায় হযরতের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তাঁকে যখন মক্কা থেকে উটে করে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন হাববার বিন্ আল্ আসোয়াদ বর্শা উঁচিয়ে তাঁকে ভয় দেখায়। যয়নাব গর্ভবতী ছিলেন, এতে তাঁর গর্ভপাত হয়। এর পরে যয়নাবকে গোপনে মদিনায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর স্বামী আবুল আস্ বহুদেববাদী ছিলেন, হযরতের মক্কা-বিজয়ের কিছু পূর্বে পর্যন্ত। সেই সময়ে নিজের টাকা ও কোরেশদের টাকা নিয়ে তিনি সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যান আর তাঁর ফিরবার পথে মুসলমানদের এক অভিযানকারী দল তাঁর সব লুটে নেয়। কিন্তু আবুল আস পালিয়ে যান ও গোপনে মদিনায় বিবি যয়নাবের শরণার্থী হন। বিবি যয়নাব তাঁকে আশ্রয় দেন আর সে কথা উচ্চ কণ্ঠে বলেন, কেন না তাঁর ধারণায় নগণ্যতম মুসলমানেরও অধিকার ছিল অন্যকে আশ্রয় দেবার। হযরত জানতে পেরে বলেন: যয়নাব তাঁর অতিথির সম্বর্ধনা করুক, কিন্তু অমুসলমান অবস্থায় আবুল আস্ তার জন্য বৈধ নয়। আবুল আসের যেসব মাল লুটে নেওয়া হয়েছিল তাঁকে তা ফেরৎ দেওয়া হোক এই

অনুরোধ আবুল আস্ বিবি যয়নাবকে জানিয়েছিলেন। যারা আবুল আসের মাল লুটে নিয়েছিল তাদের ডেকে হযরত বলেন ঃ এই লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আছে, যদি তোমরা তাকে তার মাল ফেরৎ দাও তবে তা ভালই হবে, কিন্তু যদি না দাও তবে এই যুদ্ধে লব্ধ মাল আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন, তোমাদের তাতে অধিকার আছে। অভিযানকারীরা বল্লে তারা আবুল আসের মাল খুশী মনেই ফিরিয়ে দেবে। আর তারা বড় ছোটো যা-কিছু নিয়েছিল সব ফিরিয়ে দিলে। আস্ মক্কায় গিয়ে যার যা প্রাপ্য সব ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কারো কিছু পাওনা আছে কি না। তারা বল্লে ঃ না, আল্লাহ তোমাকে পুরস্কার দিন, তুমি যে বিশ্বস্ত ও সদাশয় তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তখন আবুল আস্ বল্লেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য নেই আর মোহম্মদ তাঁর দাস ও প্রেরিত, আমি যখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম তখনই মুসলমান হতে পারতাম, কিন্তু তোমরা তাহলে ভাবতেও পারতে, আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার ফন্দি করেছি ; কিন্তু এখন তোমাদের মাল আল্লাহ্ তোমাদের দিয়ে দিয়েছেন ও আমি দায় থেকে মুক্ত হয়েছি, আর আমি আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণ করি। এই বলে তিনি হযরতের কাছে চলে গেলেন।

বদরে যারা বন্দী হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ, এই ইবনে ইসহাকের মত। মতান্তরে কোরেশ পক্ষে ৭০ জন নিহত হয়েছিল আর ৭০ জন বন্দী হয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছিল বন্দীদের হত্যা করা হবে, না, তাদের জন্য মুক্তিপণ নেওয়া হবে।

"আবু বকর নিবেদন করিলেন—হযরত! ইহারা সকলেই আমাদিগের স্বজন ও আত্মীয়। আমার মতে কিছু কিছু অর্থ লইয়া ইহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত। ইহাতে আমাদিগের সাধারণ তহবিলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইবে। পক্ষান্তরে অল্পদিনের মধ্যে ইহাদিগের সকলের পক্ষে এছলাম গ্রহণ করাও সম্ভব। এখানে বলা আবশ্যক যে হযরত ভক্তপ্রবর আবুবকরের নিকট ছাহাবাগণের অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন।

তখন ওমরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন—খাত্তাবের পুত্র, আপনার কি মত ? ওমর সম্ভ্রমে নিবেদন করিলেন—"আমি আবু-বকরের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। ইহারা এছলামের চিরশত্রু এবং মুসলমানগণের প্রাণের বৈরী। আমাদিগকে নির্যাতিত করিতে আল্লাহ্‌র রসুলকে হত্যা করার চেষ্টা করিতে এবং আল্লাহর সত্যধর্মকে জগতের পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে ইহারা সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। এগুলি অন্যায় অধর্ম ও অত্যাচারের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি—এগুলিকে অবিলম্বে হত্যা করিয়া ফেলা হউক। প্রত্যেক মুসলমান উলঙ্গ তরবারী হস্তে দণ্ডায়মান হউক, এবং নিজহস্তে নিজের আত্মীয়বর্গের মুণ্ডপাত করুক—আমার ইহাই মত।……

আবু বকর ছাহাবাগণের সাধারণ মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। এতএব ওমরের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া আবু বকরের অভিমত অনুসারে হযরত মুক্তিপণ গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।" †

বন্দীরা অনেকেই মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের মুক্ত করলো—মুক্তি-পণের পরিমাণ ছিল এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম। কয়েক জনকে মুক্তি দেওয়া হলো বিনা পণেই। একজন দরিদ্রকে মুক্তি দেওয়া হলো এই শর্তে যে সে আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। কয়েক জন ইসলাম গ্রহণ করল ও তার ফলে মুক্তি পেল। কয়েক জনকে এই শর্তে মুক্তি দেওয়া হলো যে তারা প্রত্যেকে মদিনার দশটি বালককে লিখতে শেখাবে।

আল্-আব্বাস ও তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আকিল বিন্ আবু তালেব এবং নওফল বিন্ আল হারিস এই যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। হযরত আল-আব্বাসকে মুক্তিপণ দিতে বল্লেন। আল্-আব্বাস বল্লেন ঃ আমি মুসলমান ছিলাম, কিন্তু লোকেরা আমাকে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল। হযরত বল্লেন ঃ বাহ্যতঃ আপনি ছিলেন আমাদের বিরুদ্ধে সেজন্য মুক্তিপণ দিতে হবে।

---

† মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য ঃ

আল্‌-আব্বাস বলেনঃ তাঁর টাকা পয়সা কিছুই নেই। হযরত জিজ্ঞাসা করেনঃ মক্কায় আপনি আল্‌-হারিসের কন্যা উম্‌মুল-ফযলের কাছে যে টাকা রেখে এসেছেন সে টাকা কোথায়? এতে আল্‌-আব্বাস বলে ওঠেনঃ আমি আর উম্মুল-ফযল ভিন্ন কেউ এই টাকার কথা জানে না, আমি এখন (নিশ্চিতরূপে) জানলাম যে তুমি আল্লাহর রসুল। আল্‌-আব্বাস তাঁর ও তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্রের মুক্তিপণ দিলেন।

পথে যে দুইজনের শিরশ্ছেদ হয়েছিল তাদের প্রতি নৃশংস আচরণ করা হয়েছিল এই কথা মূয়র বলেছেন। তাদের মধ্যে আন্‌-নয্‌র যে মুসলমানদের উপরে উৎপীড়ন করতো তাঁর গ্রন্থেই তার উল্লেখ আছে। উক্‌বার অপরাধও সেই ধরণের ছিল। কিন্তু সে যখন দণ্ডাজ্ঞা পেয়ে হযরতকে বলেঃ আমার ছোট্টো মেয়ের কি হবে? কে, তার খবরদারি করবে? তার উত্তরে হযরত নাকি বলেনঃ তার খবরদারি করবে দোযখের আগুন।—এটি অবশ্য গুরু অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগের মূল্য দেওয়া কঠিন, কেন না পিতার অপরাধের জন্য সন্তান দায়ী নয় এটি হযরতের এক বিশিষ্ট শিক্ষা। তা ছাড়া শিশুদের প্রতি হযরত সব সময় সদয় ব্যবহার করতেন। অবশ্য তাঁর মেজাজ যে কখনো খারাপ হতো না এমন কথা বলা সঙ্গত হবে না। কিন্তু দেখা গেছে ক্রোধের ফলে কোনো অসঙ্গত বা কড়া কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুলে পরক্ষণেই সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন হতেন। ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে ইব্‌নে ইসহাকে। তবে হযরত সম্বন্ধে, ইতিহাসেরই হোক আর হাদিসেরই হোক সব বিবরণ যে নির্ভরযোগ্য নয়, সে কথা আমরা জানতে পেরেছি। †

বদরে হেরে কোরেশ প্রথমে শোক করে নি। আবু সুফিয়ান তাদের বলেঃ তোমাদের যারা হত হয়েছে তাদের জন্য শোক কোরো না, কবিরাও তাদের জন্য শোকগাথা রচনা না করুক, যদি গাথা রচনা করে' শোক করে তবে মোহম্মদ ও তার দলবলের প্রতি তোমাদের ক্রোধ ও শত্রুতা কমে যাবে···আমি তেল স্পর্শ করবো না

† মৌলানা আকরাম খাঁর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আমার স্ত্রীদের থেকেও দূরে থাকবো যে পর্যন্ত না পুনরায় মোহম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করি।—তার স্ত্রী হিন্দকে লোকেরা যখন বল্লে, কেন তুমি তোমার বাবা উৎবা আর তোমার চাচা আর তোমার ভাইয়ের জন্য শোক করো না? হিন্দ উত্তর দেয়ঃ তোমাদের পুনরায় মোহম্মদের ও তার দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত আমি চোখের পানী ফেলবো না, যদি চোখের পানী আমার অন্তরের ব্যথা মুছে নিতে পারতো তবে তোমাদের মতো আমিও শোক করতাম। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে তার চুলে তেল দেবে না আবু সুফিয়ানের শয্যার নিকটবর্তী হবে না যে পর্যন্ত না সৈন্যদল মদিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে।

উমের মক্কায় মুসলমানদের উপরে খুব উৎপীড়ন করতো। বদর যুদ্ধে তার পুত্র মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। উমের তার মহাজন সাফওয়ানের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে যে সে মদিনায় গিয়ে হযরতকে হত্যা করবে। সাফওয়ান বলে এই কাজে সফল হলে সে উমেরের ঋণ মাফ করে দেবে ও তার পরিবারের ভার নেবে। উমের তার তরবারিতে ধার দিয়ে ও তা বিষাক্ত করে গলায় ঝুলিয়ে মদিনায় যায়। তাকে প্রথম মসজিদের দরজায় দেখতে পান হযরত ওমর আর দেখেই ভাবেন তার দুরভিসন্ধি আছে। তিনি গিয়ে হরযতকে খবর দেন; হযরত তাকে আসতে বলেন। হযরত ওমর তার তলোয়ার ঝোলানোর পেটি ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে আসেন আর আনসারদের বলেন হযরতের পাশে বসতে ও তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে। হযরত ওমরকে বলেন উমেরকে ছেড়ে দিয়ে যেতে……..উমেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ কি মতলব করে এসেছ? উমের বলেঃ তার ছেলে যে বন্দী হয়ে আছে তার প্রতি যেন ভাল ব্যবহার করা হয়। হযরত তার কথা অবিশ্বাস করেন। আর শেষে বলেন সে আর সাফওয়ান গোপনে যে পরামর্শ করেছে তার কথা। তখন উমের বলেঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহ্‌র রসুল; আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলতাম যখন আপনি আল্লাহ্‌র

তরফ থেকে আমাদের কাছে সংবাদ আনতেন আর আমরা সেই প্রত্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করতাম। কিন্তু এই ব্যাপার সম্বন্ধে আমি ও সাফওয়ান ভিন্ন আর কেউ জানে না—আর কেউ নয় আল্লাহ্ই আপনাকে এই সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌রই প্রশংসা যে তিনি আমাকে চালিত করেছেন ইসলামের দিকে।—এর পর উমের মক্কায় ফিরে এসে অনেককে ইসলামে দীক্ষিত করে।

ইবনে ইসহাক বলেছেন: বদর যুদ্ধের পরে সমগ্র সূরা আনফাল অবতীর্ণ হয়। সমগ্র সূরা না হলেও এর অনেক আয়াত বদর যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়—এই একালের পণ্ডিতদের মত। এই সূরার কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে, আরো কয়েকটি আয়াত আমরা উদ্ধৃত করছি—সেসব থেকে ভালো বোঝা যাবে এই প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের কালে কি ধরনের প্রেরণা ও বাণী হযরতের লাভ হয়েছিল:

যেমন—তোমার পালয়িতা তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তোমার গৃহ থেকে সত্যের সঙ্গে যদিও বিশ্বাসীদের এক দল নিঃসন্দেহ অনিচ্ছুক ছিল।

তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করেছিল সত্য সম্বন্ধে তা স্পষ্ট হবার পরে—তারা যেন তাড়িত হয়েছিল মৃত্যুর দিকে (যাকে) তারা দেখছিল।

আর যখন আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুই দলের একটি সম্বন্ধে যে তা তোমাদের হবে ‡ আর তোমরা চেয়েছিলে যা অস্ত্রসজ্জিত নয় তাই তোমাদের হোক, আর আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যা তাঁর বাণীর দ্বারা সত্য হয়েছে তার সত্যতা প্রকাশ করতে আর অবিশ্বাসের শিকড় কেটে দিতে—(৫—৭)

যখন তোমরা তোমাদের পালয়িতার সাহায্য চেয়েছিলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক হাজার একে-অন্যের-অনুসরণকারী ফেরেশতা দিয়ে।

আর আল্লাহ্ এটি দিয়েছিলেন সুসংবাদরূপেই যেন তার দ্বারা

‡ আবু সুফিয়ানের কাফেলা অথবা কোরেশ সৈন্যদল।

তোমাদের অন্তঃকরণ শান্তি লাভ করতে পারে ; আর জয় শুধু আল্লাহ্ থেকে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি—জ্ঞানী। (৯—১০)

যখন তোমাদের পালয়িতা ফেরেশতাদের প্রেরণা দিলেন : আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সেজন্য তাদের দৃঢ় করো যারা বিশ্বাস করে, আমি ভয় নিক্ষেপ করবো তাদের অন্তরে যারা অবিশ্বাস করে ; তার পর গর্দান মারো, আর তাদের প্রত্যেক আঙুলে আঘাত করো।

এটি এই জন্য যে তারা আল্লাহ্‌র ও রসুলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, আর যে কেউ আল্লাহ্ ও রসুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। (১২—১৩)

* * *

আর যে কেউ সেই দিন তাদের দিকে পিঠ ফেরায়— যুদ্ধ করার কারণে অথবা (নিজেদের) দলে যোগ দেবার ইচ্ছায় ভিন্ন—তবে নিঃসন্দেহ সে যোগ্য হয়েছে আল্লাহ্‌র ক্রোধের, আর তার বাসস্থান জাহান্নাম—আর তা হবে এক অবাঞ্ছিত গন্তব্যস্থান।

তবে তোমরা তাদের সংহার করো নি, তাদের সংহার করেছিলেন আল্লাহ্, আর তুমি (হে মোহম্মদ) (কঙ্কর) নিক্ষেপ করোনি যখন নিক্ষেপ করেছিলে কিন্তু নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্ যেন তিনি বিশ্বাসীদের পরীক্ষা করতে পারেন তাঁর তরফ থেকে একটি পরীক্ষার দ্বারা *। (১৬—১৭)।

* * *

(হে কোরেশ) যদি তোমরা বিচার চেয়ে থাকো তবে নিঃসন্দেহ সেই বিচার তোমাদের জন্য এসেছে,আর যদি তোমরা বিরত হও তবে তা হবে তোমাদের জন্য ভালো, আর যদি তোমরা ফিরে আসো (যুদ্ধ করতে) আমরাও তবে ফিরে আসবো, আর তোমাদের সৈন্যদল তোমাদের কোনো কাজে আসবে না সংখ্যায় তারা যতই হোক—আর (জেনো) আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের সঙ্গে। (১৯)

---

* তুলনীয় : কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ···ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব—গীতা।
আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল···আমার দ্বারা এরা পূর্বেই নিহত হয়েছে···।

হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি (আল্লাহ্) তাতে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়, আর জেনো যে আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী, আর তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (২৪)

* * *

আর জেনো যে তোমাদের ধনসম্পত্তি, আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য প্রলোভন, আর আল্লাহ তিনি যাঁর কাছে আছে মহামূল্য পুরস্কার। (২৮)

* * *

যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকটতর দিকে আর তারা ছিল দূরতম দিকে আর কাফেলা ছিল তোমাদের চাইতে নিম্নতর স্থানে, আর যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো কথা হয়ে থাকতো তবে নিঃসন্দেহ তা তোমরা ভঙ্গ করতে পারতে, কিন্তু—যেন আল্লাহ্ ঘটাতে পারেন যা ঘটবার ছিল, যেন যে মরবে সে মরতে পারে স্পষ্ট প্রমাণের ফলে আর যে বাঁচবে সে বাঁচতে পারে স্পষ্ট প্রমাণের ফলে ; আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শোনেন, জানেন।

আর যখন আল্লাহ্ স্বপ্নে তোমাকে তাদের দেখিয়েছিলেন সংখ্যায় অল্প—আর তিনি যদি তাদের তোমাকে দেখাতেন সংখ্যায় অনেক তবে তোমরা নিঃসন্দেহ দুর্বলহৃদয় হয়ে পড়তে আর তোমরা তর্ক করতে ব্যাপারটি সম্বন্ধে ; কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করেছিলেন ; নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞাতা বুকের ভিতরে যা আছে তার।

আর যখন তিনি তোমাদের মুখোমুখি হবার কালে তাদের তোমাদের চোখে দেখিয়েছিলেন অল্পসংখ্যক আর তাদের চোখে তোমাদের দেখিয়েছিলেন যৎসামান্য এইজন্য যেন আল্লাহ্ ঘটাতে পারেন সেই ব্যাপার যা ঘটাবার ছিল, আর আল্লাহ্‌র কাছে সব ব্যাপার ফিরিয়ে আনা হয়। (৪২—৪৪)

হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদের এক (সৈন্য) দলের সঙ্গে দেখা

হয় তখন দৃঢ় হও আর আমাকে খুব স্মরণ করো যেন তোমরা সফল হতে পারো।

আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুবর্তী হও আর বিবাদ কোরো না কেন না তাহলে তোমাদের হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়বে আর তোমাদের শক্তি চলে যাবে, আর ধৈর্যবান হও ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ধৈর্যবানদের সঙ্গে।

আর তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের গৃহ থেকে বেরিয়েছিল গর্বের সঙ্গে আর লোকদের দর্শনীয় হবার জন্য, আর (যারা) বাধা দেয় আল্লাহ্‌র পথে ; আল্লাহ্ ঘিরে আছেন তারা যা করে সব।

(৪৫—৪৭)

* * *

আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝোঁকে তবে তার দিকে ঝোঁকো আর আল্লাহ্‌তে নির্ভর করো ; নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

আর যদি তারা তোমাকে ফাঁকি দিতে চায় তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি তোমাদের বলবৃদ্ধি করেছিলেন তাঁর সহায়তার দ্বারা আর বিশ্বাসীদের দ্বারা ;

আর সম্মিলিত করেছিলেন তাদের হৃদয়। সংসারে যা আছে যদি তার সব তুমি ব্যয় করতে তুমি তাদের হৃদয় সম্মিলিত করতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ্ সম্মিলিত করেছিলেন ; নিঃসন্দেহ তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী ;

(৬১—৬৩)

* * *

হে নবী, বিশ্বাসীদের যুদ্ধে উৎসাহিত করো, যদি তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যবান থাকে তারা পরাজিত করবে দু'শ জন, যদি একশত থাকে তারা পরাজিত করবে এক হাজার জন—তাদের, যারা অবিশ্বাসী, যেহেতু তারা হচ্ছে একটি সম্প্রদায় যারা বোঝে না।

বর্তমানের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হাল্কা করেছেন, আর তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সেজন্য যদি তোমাদের ধৈর্যবান একশত জন থাকে তারা পরাজিত করবে দু'শ জন আর যদি এক হাজার

জন থাকে তারা পরাজিত করবে দু'হাজার জনকে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে —আর আল্লাহ্‌ ধৈর্যবানদের সঙ্গে। (৬৫—৬৬)

কোরআনের বাণী থেকে প্রতিপন্ন হচ্ছে আবু সুফিয়ানের কাফেলা লুণ্ঠনে অথবা কোরেশ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে হযরত তৎপর হয়েছিলেন অন্তরে আল্লাহ্‌র নির্দেশ লাভ করে'। আম্‌র বিন্‌ আল হায্‌রামির নিহত হবার পরে হযরত যে বাণী লাভ করেন তা থেকে তিনি নিঃসন্দেহ হন যে কোরেশ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা থেকে সহজে নিবৃত্ত হবে না; তাই মুসলমানদের সচেষ্ট হতে হবে "অবিশ্বাসের শিকড় কেটে দিতে", অর্থাৎ কোরেশদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। মুসলমানরা অনেকেই প্রথম থেকেই যুদ্ধে অনিচ্ছুক ছিল, আর যখন মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্রদল সম্মুখীন হলো কোরেশপক্ষের এক বিরাট সুসজ্জিত সৈন্যদলের, তখন হযরতও বুঝলেন কত বড় বিপদের সম্মুখীন তাঁর অনুবর্তীরা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশে ও তাঁর উপরে হযরতের ছিল সীমাহীন নির্ভরতা, তাই প্রয়োজন হলে আনসারদের বাদ দিয়েও তিনি কোরেশদের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে এই ব্যাপারটা বোঝা কঠিন, আর হযরতেরও সাধারণ বিচারবুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞান প্রখর ছিল। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশী ছিল আল্লাহ্‌র উপরে তাঁর নির্ভরতা। এই ব্যাপারটি মরমী। সেই মরমী নির্ভরতা তাঁকে শক্তি দিয়েছিল এমন বিপদের সম্মুখীন হতে। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে এ নব জীবন লাভ। উদ্ধৃত আয়াতগুলোর কয়েকটিতে সেই নবজীবন লাভের বার্তা আছে।—মুসলমানরা ছিল আল্লাহ্‌তে ও রসুলে একান্তসমর্পিতচিত্ত, অপর পক্ষে, কোরেশরা যুদ্ধে নেমেছিল "লোকদের দর্শনীয় হবার জন্য" আর তারা ছিল বুদ্ধি-বিবেচনায় হীন, অর্থাৎ শুভবুদ্ধি ও শুভ সংকল্প থেকে দূরে। তাই বিধাতৃ-বিধানে যাদের জিত হবার কথা মুসলমানরা পড়েছিল সেইদলে, আর যাদের হার হবার কথা, কোরেশরা পড়েছিল সেই দলে।

কয়েকটি আয়াতে দেখা যাচ্ছে এই প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের পরে কোরেশদের আহ্বান করা হয়েছে শান্তি ও সমঝোতার পথে। কিন্তু কোরেশ তাতে কান দেয় নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বদর থেকে ওহোদ

বদর যুদ্ধের পরে—মতান্তরে বদর যুদ্ধের পূর্বেই—হযরতের কনিষ্ঠা কন্যা বিবি ফাতেমার বিবাহ হয় মহাবীর আলীর সঙ্গে। এই বিবাহের বিবরণ আমরা মৌলানা ভাই গিরিশ চন্দ্রের হযরতের চরিতকথা থেকে উদ্ধৃত করছি।

"পরমরূপবতী ফাতেমা দেবীর যৌবন কাল, ধনৈশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত কোরেশগণ তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রার্থী, হজরত তাঁহাদের প্রার্থনায় কিছুই মনোযোগ বিধান করিতেছিলেন না, ইহা দেখিয়া একদিন আমির আবুবেকর হজরতের নিকট ফাতেমার বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। হজরত বলেন, 'ঈশ্বরের আজ্ঞার উপর এ কার্য নির্ভর করিতেছে, আমি আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছি।' একদিন ওমরও এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাহাতেও হজরত এইরূপ বলেন। অন্য এক দিবস মন্দিরে আবুবেকর ও ওমর এবং সয়িদ পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করেন যে, 'কোরেশ দলপতিগণ এই কন্যারত্নকে গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত, হজরত কাহারও প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছেন না। আলি এইক্ষণও বিবাহ করেন নাই, এবং বিবাহের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নাই।' আবুবেকর বলিলেন 'আমার বোধ হইতেছে দরিদ্রতাই আলির উদ্বাহে প্রতিবন্ধক হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আলির জন্যই ফাতেমার পরিণয় ক্রিয়ার বিলম্ব হইতেছে, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ আলির সঙ্গে ফাতেমার পরিণয়ই অনুমোদন করিয়াছেন।' তৎপর আবুবেকর সয়িদ ও ওমরকে বলেন, 'চল, আমরা তিন জনে মিলিয়া আলির নিকটে যাই, এবং ফাতেমার সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে উত্তেজনা করি। যদি আলি অর্থাভাববশত আপত্তি করেন আমরা সকলে তাঁহাকে সাহায্য করিব!' আবুবেকরের এই প্রস্তাব ওমর ও সয়িদ সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। তৎপর তাঁহারা তিন জনে মিলিয়া আলির নিকটে

গেলেন। তখন আলি একজন আনসার বন্ধুর উদ্যানে স্বীয় উষ্ট্রযোগে জল সিঞ্চন করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কথা প্রসঙ্গে আবুবেকর বলিলেন, 'আলি, হজরতের তুমি অতিশয় আদরের পাত্র, তাঁহার নিকটে তোমার যেরূপ গৌরব এরূপ অন্য কাহারও নয়। কোরেশবংশীয় প্রধান পুরুষগণ কুমারী ফাতেমার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হইয়াছিলেন, হযরত তাঁহাদের কাহারও প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই, আমার বোধ হইতেছে তিনি তোমার হস্তে ফাতেমাকে সমর্পণ করিতে চাহেন, তুমি কেন ফাতেমার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হইতেছ না? তোমার কি তাহাতে ইচ্ছা নাই?' এই কথা শ্রবণ করিয়া (আলি) অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, 'দেব আবুবেকর, আর বায়ু সঞ্চালন করিবেন না, মনের অগ্নিকে অনেক কষ্টে প্রশমিত করিয়া রাখিয়াছি, এ বিষয়ে আমার ইচ্ছা আছে কি না আপনি আর আমাকে স্মরণ করাইয়া কি দিতেছেন? এই সম্বন্ধের বিষয়ে আমার যেরূপ অভিলাষ বোধ করি অন্য কাহারও তদ্রূপ নয়, কিন্তু দরিদ্রতা ইহার প্রতিবন্ধক হইয়াছে, এই কথা উত্থাপন করিবারও আমার ক্ষমতা নাই।' আবুবেকর বলিলেন, 'আলি, এ প্রকার বলিও না, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের নিকটে পার্থিব সম্পত্তির কোন মূল্য নাই, সম্ভবতঃ অর্থকৃচ্ছ্রতা ও দারিদ্র্য কোন প্রকারে এ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।' এই কথা শুনিয়া আলি স্বীয় উষ্ট্রটিকে গৃহে লইয়া গিয়া বন্ধন করিলেন তৎপর হযরত মোহম্মদের নিকটে চলিয়া গেলেন।... যেমন কাহার কোন বিশেষ অভিলাষ আছে, সে লজ্জাপ্রযুক্ত ব্যক্ত করিতে না পারিয়া অধোমুখে বসিয়া থাকে, সেই ভাবে আলি অবনতমস্তকে উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আলি, বোধ হইতেছে যে, তোমার মনে কোন আকাঙ্ক্ষা আছে, তুমি লজ্জা বশতঃ তাহা বলিতে পারিতেছ না, কি অভিলাষ বল, সঙ্কোচ করিওনা তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে আমি যত্নবান হইব।" তখন আলি বলিলেন, "দেব, আপনি আমাকে শৈশবাবধি জনক জননী হইতে গ্রহণ

করিয়া স্বীয় পবিত্র সহবাসে রাখিয়াছেন এবং আন্তরিক ও বাহ্যিক শিক্ষা দানে আমার কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, যে অনুগ্রহ ও উপকার আমি আপনার নিকটে লাভ করিয়াছি, তাহার দশমাংশও স্বীয় পিতামাতার নিকটে প্রাপ্ত হই নাই। পরমেশ্বর আপনার সাহায্যে আমাকে পৈতৃক অসত্য ধর্ম হইতে মুক্ত করিয়া সত্য ধর্মে আশ্রয় দান করিয়াছেন। আপনি আমার জীবনের সম্বল, সুখ ও শান্তির মূল। দেব, এইক্ষণ তো আমি আপনার পদ সেবাতে নিযুক্ত থাকিয়া সবল ও ভাগ্যবান হইয়াছি, এবং ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ ও সমুন্নতি লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমার নিজের কোনরূপ গৃহ ও গৃহসম্পত্তি নাই, হৃদয়-সখী ভার্যা নাই, যিনি সুখে দুঃখে আমার সঙ্গে সহানুভূতি করিবেন ও আমার মর্মজ্ঞা হইবেন। কিছুকাল হইতে এই ইচ্ছা যে কুমারী ফাতেমার পরিণয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, কিন্তু দুঃসাহসিকতা হইবে ভাবিয়া এ পর্যন্ত প্রকাশ করিতে পারি নাই। ইহা সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি?" আলির মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হজরতের মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি আলির প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আলি, বিবাহ করিতে যাহা যাহা প্রয়োজন তৎসম্বল কি তোমার আছে?" আলি বলিলেন, "আর্য, আপনি আমার অবস্থা যেরূপ জানেন, আমার অন্য কোন আত্মীয় বন্ধু সেরূপ অবগত নহেন। আপনার নিকটে কিছুই গুপ্ত নহে, আমার একটি করবাল, একটি বর্ম ও একটি উষ্ট্র মাত্র আছে। এ সকলের আপনিই অধিপতি, যাহা বিহিত বোধ করেন তাহাই হউক।" হযরত বলিলেন, "তোমার জন্য করবালের প্রয়োজন, অনেক সময় ধর্মদ্রোহী শত্রুর সঙ্গে তোমাকে সংগ্রাম করিতে হইবে। তোমার আরোহণের জন্য উষ্ট্রেরও আবশ্যক। আমি কেবল তোমার বর্মটি চাই, তাহাতেই কার্য সিদ্ধ হইবে। আলি, তোমাকে আমি সুসংবাদ দান করিতেছি যে, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে ফাতেমার বিবাহ মনোনীত করিয়াছেন, স্বর্গে তোমাদের উভয়ের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।"······হযরতের

কন্যার কাবিনস্বরূপ বরের বর্ম নির্ধারিত হইল। আলি বলিলেন, "আমি ইহাতে সম্মতিদান করিলাম। সভাস্থ বন্ধুগণ, আপনারা এবিষয়ে হযরতের সম্মতি জিজ্ঞাসা করুন, এবং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষী থাকুন।" সমাগত সম্ভ্রান্ত মোসলমানগণ হযরতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, এইরূপেই কি উদ্বাহ সম্পাদন বিহিত করিয়াছেন? হযরত হাঁ বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন সভার চতুর্দিক হইতে "ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন," এই ধ্বনি উত্থিত হইল। তদনন্তর হযরত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং আলিকে বলিলেন, "যাও স্বীয় কবচ বিক্রয় করিয়া তাহার মুল্য লইয়া আইস। আলি সেই বর্ম চারিশত দেরহাম মুদ্রা মূল্যে আমির ওসমানের নিকটে বিক্রয় করেন। কেহ কেহ বলেন ওসমান চারিশত ষাট দেরহামে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই কবচ অতি উত্তম ও সুদৃঢ় ছিল, করবালের আঘাত তাহাতে কিছুমাত্র বসিতে পারিত না। বর্ম ওসমানকে প্রদান করিয়া মূল্য গ্রহণ করা হইলে পর ওসমান বলিলেন, "আলি, তুমিই এই বর্মের উপযুক্ত পাত্র, তোমার অঙ্গেই ইহা শোভা পায়, ইহা আমি তোমাকেই প্রত্যর্পণ করিলাম।" আলি আমির ওসমানের এই প্রীতি ও বদান্যতা দেখিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান করিলেন, এবং তখনই হযরতের নিকটে যাইয়া মুদ্রা ও বর্ম দুইই তাঁহার নিকটে রাখিয়া দিলেন। হযরত মোহম্মদ কবচ বিক্রয় না করিয়া মুদ্রা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া গেল ইহা জিজ্ঞাসা করিলে আলি ওসমানের বদান্যতার কথা জানাইলেন। হযরত শুনিয়া পুলকিত অন্তরে ওসমানকে আশীর্বাদ করিলেন। তিনি উক্ত মুদ্রাপুঞ্জ হইতে কিছু মুদ্রা গ্রহণ করিয়া আবু বকরের হস্তে প্রদান পূর্বক বিবাহিত কন্যার জন্য উপঢৌকন সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। দ্রব্যজাত বহন করিয়া আনিবার জন্য সোলেমান ও বেলালকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইলেন। আবু বকর তদ্দারা ফাতেমার নিমিত্ত এই সকল যৌতুক সংগ্রহ করিলেন, যথা—সুকোমল ঊর্ণাপুঞ্জে নির্মিত মেসর দেশীয় শয্যাবিশেষ, এবং একটি চর্মময় গদি যাহার ভিতরে খোর্মা-বল্কলের

তন্তু সকল নিহিত ছিল, এবং খবিরের এক কম্বল, এবং কতকগুলি মৃন্ময়পাত্র ও একটি কৌষেয় যবনিকা। আবু বকর এ সমস্ত হযরতের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। হযরত এই সকল সামগ্রী দর্শন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন: “পরমেশ্বর, যাহাদের মৃন্ময়পাত্র প্রিয়-সামগ্রী সেই সমস্ত লোককে তুমি আশীর্বাদ কর।” অনন্তর তিনি ইচ্ছানুরূপ অন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত ক্রয় করিবার জন্য অবশিষ্ট মুদ্রা ওম্ম সোলমার হস্তে অর্পণ করিলেন। কিছু সুগন্ধ দ্রব্য ক্রীত হইল। ……আলি বলিয়াছেন যে, “ফাতেমা কখন আমাকে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত করিয়া তোলেন নাই, যে পর্যন্ত জীবিত ছিলেন কখন কোনরূপ অবাধ্যতাচরণ করেন নাই, এবং আমিও কোন দিন তাঁহাকে ব্যথিত করি নাই।”

বদরের যুদ্ধ ও ওহোদের যুদ্ধ এই দুয়ের মধ্যে হযরত কয়েকটি ‘অভিযান’ করেন, কিন্তু সে সবে কোনো যুদ্ধ হয় না। সে সবের মধ্যে আল্-সভিক-এর অভিযান ঘটে এই কারণে: আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করেছিল প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সে মাথায় তেল দেবে না ও স্ত্রীস্পর্শও করবে না। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে দুইশত কোরেশ সওয়ার নিয়ে মদিনার দিকে যাত্রা করল, আর মদিনার নিকটে একটি গুপ্ত স্থানে তাদের লুকিয়ে রেখে একা রাত্রে গোপনে ইহুদীপল্লীতে প্রবেশ করলো। হুয়াই বিন্ আখ্‌তাবের দ্বারে আঘাত করে সে বিফলমনোরথ হ'ল, কিন্তু সাল্লাম বিন্ মিশকাম তাকে অভ্যর্থনা জানালো। তার কাছ থেকে মুসলমানদের সম্বন্ধে গোপনীয় সংবাদ জেনে সে ফিরে এসে তার সৈন্যদের কয়েকজনকে পাঠাল, তারা মদিনার পার্শ্ববর্তী একটি জায়গায় কিছু খেজুর গাছ নষ্ট করলো ও তাদের শস্যাদি পুড়িয়ে দিলো আর দুইজন চাষীকে হত্যা করলো। সংবাদ পেয়ে হযরত তাঁর অনুচরসহ তাদের পশ্চাৎধাবন করেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান পালিয়ে যায়। চলে যাবার সময় ভার লাঘব করার জন্য তারা অনেক ছাতুর বস্তা ফেলে যায়। তাই থেকে এই অভিযান নাম পায় ‘সভিকে’র বা ‘ছাতু’র অভিযান।

বদরে হযরতের ও মুসলমানদের জয়লাভ ইহুদীরা অনেকে প্রীতির চোখে দেখে নি। তারা মুসলমানদের কুৎসা প্রভৃতি রটনায় অগ্রণী হলো। এই কুৎসাকারীদের কাউকে কাউকে মুসলমানেরা হত্যা করলো। এই বিদ্রোহী দলের মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক'াব বিন্ আশরাফ। সে ছিল একজন ইহুদী-প্রধান আর কবি। বদরের বিজয়-সংবাদ মদিনায় ঘোষিত হলে সে বলেছিল : এ কি সত্যি ? ..এরা আরবদের প্রধান, রাজার মতো ছিল এদের মর্যাদা, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি মোহম্মদ এদের মেরে ফেলে থাকে তবে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া ভালো। যখন সে জানলো যে মুসলমানদের বদরে বিজয়লাভ সত্য ঘটনা তখন সে মক্কায় চলে গেল আর হযরতের ঘোর বিরুদ্ধাচারী হয়ে আর নিহত কোরেশদের জন্য শোকগাথা রচনা ক'রে সেসব পাঠ করে চললো। এর পর সে মুসলমানমেয়েদের নামে অপমানকর কবিতা লিখে চললো। ইব্‌নে ইসহাকে আছে হযরত বলেন : কে আমাকে আশরাফের পুত্র থেকে অব্যাহতি দেবে ? মোহম্মদ বিন্ মাসলামা বল্লে : আপনার হয়ে আমি তার ব্যবস্থা করবো হে আল্লাহ্‌র রসুল, আমি তাকে নিহত করবো। হযরত বলেন : যদি পারো তাই করো। তিন দিন ভাবনা চিন্তা করে সে হযরতকে জানায়—এ ব্যাপারে তাদের মিথ্যা কথা বলতে হবে। হযরত নাকি উত্তর দেন : যা ইচ্ছা বলো, কেন না এ ব্যাপারে তোমাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

কা'ব বিন্ আশরাফের এই প্রাণদণ্ড নিয়ে স্বভাবতঃই অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ইয়োরোপীয় ইসলামতত্ত্ববিদ্ স্ট্যান্‌লি লেনপুল এই মন্তব্য করেছেন :

তখন মদিনায় কোনো পুলিশের অথবা আদালতের ব্যবস্থা ছিল না, সেজন্য মোহম্মদের কোনো অনুচরকেই মৃত্যুর দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করতে হয়েছিল, আর এইটিই সঙ্গত ছিল যে এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করা হবে লোকের দৃষ্টি আর তার আনুষঙ্গিক হৈ-হল্লা, আরো রক্তপাত, ও প্রতিশোধ-গ্রহণ, এ সবের সম্ভাবনা যথাসম্ভব এড়িয়ে। (মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য)

বনি কাইনুকার নির্বাসন

বদর ও ওহোদের যুদ্ধের মধ্যে বড় ঘটনা বনি কাইনুকা নামক ইহুদী গোত্রের মদিনা থেকে নির্বাসন। এ সম্বন্ধে ইব্‌নে ইসহাকে ও ইবনে হিশামে আছেঃ হযরত বনি কাইনুকাদের তাদের বাজারে সমবেত করে বলেনঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়, সাবধান হও পাছে আল্লাহ্‌ তোমাদের উপরে তেমন অসন্তোষ অবতীর্ণ করেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন কোরেশদের উপরে আর আনুগত্য স্বীকার করো। তোমরা জানো আমি একজন প্রেরিত পয়গাম্বর, তোমাদের গ্রন্থে ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকারে আমার উল্লেখ আছে। তারা উত্তর দেয়ঃ মোহম্মদ, মনে হচ্ছে তুমি ভাবছ আমরা তোমার অধীনস্থ লোক, এমন লোকের সঙ্গে তোমার মোকাবেলা হয়েছে, ও তাদের তুমি হারিয়ে দিয়েছ যারা যুদ্ধের কিছুই জানতো না, সেজন্য নিজেকে ভুলিয়ো না, কেন না, আল্লাহর শপথ, আমাদের সঙ্গে যদি তোমার যুদ্ধ হয় তবে বুঝবে আমরা শক্ত লোক।—ইব্‌নে হিশামে আছে বনি কাইনুকার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে এইভাবেঃ একজন আরব স্ত্রীলোক বনিকাইনুকাদের বাজারে কিছু জিনিস বিক্রি করতে যায় ও বিক্রির পরে সে বনিকাইনুকা গোত্রের একজন স্বর্ণকারের দোকানে বসে। সেই স্বর্ণকার মেয়েটির অজ্ঞাতসারে তার বস্ত্রের এক প্রান্ত তার পেছনে আটকে দেয়, ফলে মেয়েটি যখন উঠে দাঁড়ালো তখন অনাবৃত হয়ে পড়ল। তা দেখে সমবেত লোকেরা হাসতে লাগলো। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠলো, আর মুসলমানদের এক জন স্বর্ণকারের উপরে লাফিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করলে। ইহুদীরাও মুসলমানটির উপরে লাফিয়ে পড়ল ও তাকে নিহত করলো। ফলে নিহত মুসলমানের পরিজন ক্রুদ্ধ মুসলমানদের সাহায্য চাইলে ইহুদীদের বিরুদ্ধে।

ইব্‌নে ইসহাকে আছে, হযরত মুসলমানদের নিয়ে বনিকাইনুকার দুর্গ অবরোধ করেন। পনেরো দিন অবরুদ্ধ থেকে তারা বিনা শর্তে আত্ম-সমর্পণ করে। তারা যখন হযরতের করতলগত হয়েছে তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই এসে হযরতকে বলেঃ মোহম্মদ, আমার দলের লোকদের প্রতি

সদয় ব্যবহার করুন। কিন্তু হযরত তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। সে পুনরায় সেই অনুরোধ করলে, আর পুনরায় হযরত তার দিক থেকে মুখ ফেরালেন। তাতে সে হযরতের বর্মের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তাঁকে ধরে ফেললে। হযরত এতে এত ক্রুদ্ধ হলেন যে তাঁর মুখ কালিবর্ণ হলো। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বল্লে ঃ না, আল্লাহ্‌র শপথ আমি আপনাকে ছাড়বো না, যে পর্যন্ত না আপনি আমার লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। এরা চার শত লোক বর্ম-ছাড়া আর তিন শত লোক বর্ম পরে' আমার সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে রক্ষা করেছে, আপনি কি এক প্রাতে তাদের শেষ করে দেবেন?...হযরত বল্লেন ঃ তাদের তোমাকে দিয়ে দিলাম।†

তারা সিরিয়ার সীমানার কাছে গিয়ে বসবাস করে। তাদের কোনো চাষের জমি ছিল না, তাদের থেকে মুসলমানদের লাভ হয় প্রধানতঃ বর্ম আর স্বর্ণকারের জিনিসপত্র।

বদর ও ওহোদের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নজ্‌দের আল্ কারাদা নামক স্থানে যায়েদের কোরেশদের কাফেলা লুণ্ঠন। বদর যুদ্ধের পরে কোরেশ তাদের সিরিয়ার বাণিজ্য চালাচ্ছিল অভ্যস্ত পথ বাদ দিয়ে ইরাকের পথে। সংবাদ পেয়ে হযরত সেই কাফেলার খোঁজে যায়েদকে পাঠান। এই কাফেলায় ছিল আবু সুফিয়ান—অনেক রূপো নিয়ে সে যাচ্ছিল। তার সবই যায়েদের হস্তগত হয়। আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা পালিয়ে যায়।

ওহোদের যুদ্ধ

ওহোদের যুদ্ধ সম্বন্ধে ইব্‌নে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে ঃ বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে আবদুল্লাহ্, ইকরিমা, সাফওয়ান ও অন্যান্য লোক কাফেলা-নিয়ে-ফিরে-আসা আবু সুফিয়ানের কাছে বিশেষভাবে, ও মক্কার লোকদের কাছে ব্যাপকভাবে, এই আবেদন করলে ঃ মোহম্মদ তোমাদের প্রতি অন্যায় করেছে, তোমাদের প্রধানদের মেরে ফেলেছে, সেজন্য এই অর্থ

† ভিন্ন মত মোস্তফা-চরিতে দ্রষ্টব্য।

দিয়ে তার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে দাও যেন আমরা যাদের হারিয়েছি তাদের বদলা নিতে পারি। কোরেশের এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কোরআনে বলা হয়ঃ

আর যারা অবিশ্বাস করে তারা তাদের ধনসম্পত্তি ব্যয় করে(লোকদের) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দেবার জন্য। এইভাবেই তারা ব্যয় করবে, তারপর এটি হবে তাদের জন্য অনুশোচনার ব্যাপার, তারপর তারা হবে পরাজিত। আর যারা অবিশ্বাস করে তারা একসঙ্গে তাড়িত হবে জাহান্নামে— (৮ঃ ৩৬)।

এইভাবে কোরেশ আর কিছু কিছু উপজাতি রসুলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো। আবু আয্‌যা আল্ যুমাহি নামক বদর যুদ্ধের এক বন্দীকে তার দারিদ্র্যের জন্য হযরত বিনাপণে মুক্তি দিয়েছিলেন। সে ছিল একজন কবি। তাকে সাফওয়ান বল্লেঃ আবু আয্‌যা, তুমি একজন কবি সেজন্য তুমি আমাদের সাহায্য করো তোমার জিহ্বা দিয়ে আর আমাদের সঙ্গে চলো। সে বল্লেঃ মোহম্মদ আমাকে মুক্তি দিয়েছে, আমি তার বিরুদ্ধে যেতে চাই না। সাফওয়ান বল্লেঃ না শুধু তোমার উপস্থিতির দ্বারা আমাদের সাহায্য করো, আর আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি যদি ফিরে আসি তোমার দারিদ্র্য ঘোচাবো আর যদি তুমি মারা যাও তবে তোমার মেয়েরা হবে যেন আমার মেয়েরা। ভালো মন্দ যা আমার জন্য ঘটবে তা তোমার জন্যও ঘটবে। আয্‌যা কোরেশদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লোকদের যুদ্ধে উদ্বোধিত করে চললো।

বদর যুদ্ধে তুয়াইমা বিন্ আদী নিহত হয়েছিল। তার ভ্রাতুষ্পুত্র জুবের বিন্ মুতিম্ আপন আবিসিনীয় ক্রীতদাস ওহ্‌শিকে ডেকে বল্লেঃ—এই ওহশির বর্শা ছিল অব্যর্থলক্ষ্য—তুমি এই কোরেশসৈন্যের সঙ্গে যাও আর তুমি যদি বদলা স্বরূপ মোহম্মদের চাচা হাম্‌যাকে নিহত করতে পারো তবে তোমাকে মুক্তি দেব।—কোরেশ তাদের বাছাই করা যোদ্ধাদের নিয়ে আর কৃষ্ণকায় সৈন্যদের নিয়ে, আর বনি কিনানা গোত্রের মিত্রদের ও অন্য কিছু লোকেদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করল।

তাদের সঙ্গে যাত্রা করল উটের হাওদার উপরে নারীরা, যোদ্ধাদের ক্রোধ আরো বাড়িয়ে দেবার জন্য, আর যোদ্ধারা যেন পালিয়ে না আসে সেইজন্যও। এই যোদ্ধা-দলের নেতা ছিল আবু সুফিয়ান—তার সঙ্গে চললো তার পত্নী হিন্দ। আবু জেহেলের পুত্র ইকরিমা, হিশামের পুত্র আল্ হারিস, সাফওয়ান, আমর বিন্ আল্-আস প্রভৃতি কোরেশ-প্রধানের পত্নীরাও সেইদিন যুদ্ধ যাত্রা করেছিল। যাবার সময় ওহশিকে পার্শ্বে দেখলেই হিন্দ তাকে বলছিল ; এসো এসো, তোমার নিজের প্রতিশোধ ও আমাদের প্রতিশোধ নাও। —তিন হাজার যোদ্ধা নিয়ে কোরেশ যাত্রা করেছিল। সেই যোদ্ধাদলের সাত শ জন ছিল বর্মধারী, দুই শত জন ছিল অশ্বারোহী, অবশিষ্টরা চলেছিল উটে। সেই দলে ছিল মদিনার সন্ন্যাসী আবু আমির—মদিনায় হযরতের সাদর সম্বর্ধনা দেখে সে আউস গোত্রের কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে মক্কায় চলে যায়। সে কোরেশদের বুঝিয়েছিল তাকে দেখলেই মদিনার লোকদের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হবে।

কোরেশদের এই যুদ্ধযাত্রার সংবাদ হযরতের চাচা আল আব্বাস গোপনে এক দ্রুতগামী উষ্ট্রারোহীকে দিয়ে মদিনায় পাঠান। কোরেশ-সৈন্য এসে মদিনার অদূরবর্তী ওহোদ পাহাড়ের তলদেশে ছাউনি করলে। তাদের ঘোড়া ও উট মদিনার শস্যক্ষেত নষ্ট করতে লাগল, কিন্তু মদিনাবাসীদের ধৈর্য অটুট রইল। কোরেশ-দল চাচ্ছিল মুসলমানরা শহরের বাইরে এসে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করুক। নিজেদের সংখ্যাধিক্যের উপরে তারা খুব নির্ভর করেছিল। কোরেশসৈন্যের বিপুল সংখ্যার কথা মুসলমানরাও জানল, আর তারা সতর্ক হল।

কোরেশসৈন্য এসে ছাউনি করেছিল বৃহস্পতিবারে। পর দিন ভোরে হযরত সঙ্গীদের ডাকালেন পরামর্শের জন্য। আব্দুল্লাহ বিন্ উবাইকেও ডাকা হলো। হযরত বল্লেনঃ আমি এক স্বপ্ন দেখেছি যা শুভ-সূচক···সুরক্ষিত শহরের মধ্যে আমরা আছি নিরাপদে, কিন্তু বাইরে বিঘ্ন বিপত্তি। মোহাজীর ও আনসারদের মধ্যে যাঁরা বয়সে প্রবীণ তাঁরা হযরতের সঙ্গে

একমত হলেন। আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই বল্লে ঃ হে রসুল, আমাদের নগরী যেন অধৃষ্যা কুমারী। এর বাইরে গিয়ে আমরা সব সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, ভিতরে থেকে আমরা আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছি। কোরেশরা তাদের মতো থাকুক, যদি তারা অপেক্ষা করে তবে অপেক্ষা করবে এক অসুবিধাজনক জায়গায়, শেষে বিফলমনোরথ হয়ে তারা চলে যাবে। —যেসব বাসিন্দা নগর-প্রাচীরের বাইরে ছিল তাদেরও নগর-প্রাচীরের ভিতরে আনবার কথা হলো—কোরেশ যদি কাছে আসে তখন তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে তীর মেরে আর দেয়াল ও ছাদের উপর থেকে পাথর ছুঁড়ে।

যারা বয়সে নবীন এই সিদ্ধান্ত তাদের মনঃপূত হলো না। তারা বলতে লাগল ঃ এতে আমরা সমস্ত আরবের উপহাসের পাত্র হব, এ চিরদিনের জন্য আমাদের জন্য এক কলঙ্কের কথা হবে, আর আমাদের অপমান করবার স্পর্ধা শত্রুর আরো বেড়ে যাবে। হাম্যা বল্লেনঃ আমরা বদরে ছিলাম সংখ্যায় অল্প, কিন্তু এখন আমরা সংখ্যায় অনেক, নিশ্চয় এই দিনের জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষা করেছি আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি ; তিনি শত্রুদের আমাদের একেবারে মধ্যে পাঠিয়েছেন আমাদের শিকাররূপে। —জুমার নামাযের পরে হযরত লোকেদের বল্লেন ঃ ধৈর্যবান হলে আল্লাহ্ তাদের বিজয় দেবেন। এর পর হযরত তাঁর গৃহে প্রবেশ করে তাঁর বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করলেন, তাঁর কটিবন্ধে বিলম্বিত হল তরবারি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর ও ওমর, তাঁদের নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে কতক লোক তাদের জেদের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল, তারা বলছিল উপরোধ করে রসুলকে তাঁর মতের বিরুদ্ধে তারা নিয়েছে যা তাদের জন্য সঙ্গত হয়নি। তারা হযরতের কাছে তাদের দোষ স্বীকার করলে আর বল্লে হযরত যদি শহরের মধ্যে থাকেন তবে তারা তাঁর বিরুদ্ধাচারী হবে না। হযরত বল্লেন ঃ একজন রসুলের পক্ষে এ যোগ্য নয় যে বর্ম পরার পরে যুদ্ধ না করে তিনি তা খুলে রাখবেন। তিনি তাঁর এক হাজার অনুবর্তী নিয়ে মদিনা ও

ওহোদের মধ্যবর্তী আল-শাউত নামক স্থানে পৌঁছলে, আবদুল্লাহ বিন্ উবাই এই সৈন্যদলের এক তৃতীয়াংশ সরিয়ে নিল এই বলে ঃ রসুল ওদের কথা শুনেছেন আর আমার কথা অমান্য করেছেন, হে লোকসকল, আমি বুঝি না কেন আমরা আমাদের জীবন এখানে নষ্ট করব। —যারা ছিল দোমনা আর কপট তারা আবদুল্লাহ বিন্ উবাইয়ের অনুবর্তী হলো। হযরতের দলে রইল প্রায় সাত শত যোদ্ধা, তাদের মধ্যে এক শত জন ছিল বর্মধারী। কিন্তু এরা সবাই ছিল অকপট।

ওহোদের খদ পার হয়ে হযরত পর্ব্বতের দিকে উঁচু জমিতে স্থান গ্রহণ করলেন, তিনি বল্লেন, আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না।

মুসলমান সৈন্যদলের পেছনে রইল ওহোদ পাহাড়। কাজেই সেটি তাদের জন্য সুবিধাজনক হলো, কিন্তু তাদের বাঁয়ের দিক থেকে শত্রুর আসবার পথ ছিল। সেখানে হযরত স্থাপন করলেন পঞ্চাশ জন বাছাই-করা তীরন্দাজ, তাদের নির্দেশ দিলেন ঃ আমাদের পশ্চাৎভাগ রক্ষা করবে আর এখান থেকে নড়বে না; যদি দেখ আমরা শত্রুর পশ্চাৎধাবন করছি আর তাদের মালমাত্তা লুটে নিচ্ছি তাতে তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে না, আর যদি ওরা আমাদের পেছনে ধাওয়া করে আর আমরা হেরে যাই তবু আমাদের সাহায্যের জন্য তোমরা এগোবে না। এর পর হযরত পরিধান করলেন আরো একটি বর্ম আর পতাকা দিলেন বিখ্যাত ইসলাম-প্রচারক মুস্আব বিন্ ওমেরের হাতে।

পূর্বেই বলা হয়েছে কোরেশদলে ছিল তিন হাজার যোদ্ধা; তাদের দুই শত জন অশ্বারোহীর বাম পার্শ্বের অধিনায়ক ছিল খালেদ বিন্ আল্ওয়ালিদ; আর দক্ষিণ পার্শ্বের অধিনায়ক ছিল আবু জেহেলের পুত্র ইক্‌রিমা।

যুদ্ধের ময়দানে একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে হযরত বল্লেন ঃ এর হক্ সমেত (এর যোগ্য ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে) কে এটি গ্রহণ করতে পারবে? কয়েকজন তলোয়ারখানা নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন;

তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওমর ও আয্‌যুবের বিন্‌ আল্‌ আওয়াম; কিন্তু তাঁদের দেওয়া হলো না। তার পর আবু দোযানা উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন: এই তলোয়ারের হক্‌ কি, হে আল্লাহ্‌র রসুল? তিনি বল্লেন: এর দ্বারা শত্রু সংহার করে চলবে যে পর্যন্ত না এ বেঁকে যায়। আবু দোযানা বল্লেন: তিনি এই তলোয়ার নেবেন তার হক্‌ সমেত। তাঁকে সেই তলোয়ার দেওয়া হল। আবু দোযানা ছিলেন সাহসী কিন্তু গর্বিত। তলোয়ার হাতে নিয়ে সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যে তিনি খুব আস্ফালন ক'রে বেড়াতে লাগলেন। কথিত আছে আবু দোযানাকে দেখে হযরত বলেছিলেন: এই চলন আল্লাহ্‌ অপছন্দ করেন আজকার এমন সময়ে ব্যতীত।

যুদ্ধের প্রারম্ভে আবু সুফিয়ান বলে পাঠিয়েছিল: হে আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা, আমার জ্ঞাতিভ্রাতার সঙ্গে আমাকে মোকাবিলা করতে দাও, তাহলেই আমরা তোমাদের ত্যাগ করে চলে যাবো, কেন না তোমাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারা তাকে কড়া উত্তর দেয়।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রাক্কালে 'সন্ন্যাসী' আবু আমির কৃষ্ণবর্ণ সৈন্যদের আর মক্কার দাসদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে বল্লে: হে আউস গোত্রের লোক, আমি আবু আমির। তারা উত্তর দিলে: ওরে ভণ্ড ধূর্ত, আল্লাহ্‌ তোর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট ক'রে দিন। তাদের কথা শুনে আবু আমির বল্লে: দেখছি আমার লোকদের ছেড়ে আসার পরে তাদের খারাবি ঘটেছে। সে যথাসাধ্য যুদ্ধ করলে—মুসলমানদের দিকে খুব পাথর ছুঁড়লে।

কোরেশদলের পতাকা বহন করছিল আবদুল ওয্‌যার পৌত্র তাল্‌হা। আবু আমিরকে তার দলবল সমেত পেছনে হটে যেতে বলে সে একা দ্বৈরথ যুদ্ধে অগ্রসর হল। আলি তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর একা এক আঘাতে তাকে ভূতলশায়ী করলেন। মুসলমান দলে উচ্চ আল্লাহু-আকবর ধ্বনি উঠল। তাল্‌হার পরে

অগ্রসর হলো তার ভাই ওসমান, সে নারীদের অধ্যক্ষ্যতা করছিল ; হিন্দের নেতৃত্বে নারীরা ঢোলক বাজিয়ে গেয়ে চলেছিল ঃ

অগ্রসর হও হে আব্‌দুদ্‌দারের বংশধরগণ,
অগ্রসর হও হে আমাদের পশ্চাৎরক্ষীদল,
হানো তোমাদের প্রত্যেকের ধারালো বর্শা।
যদি অগ্রসর হও তবে তোমাদের আলিঙ্গন দেব ;
তোমাদের জন্য বিছাবো কোমল গালিচা—
যদি পিছে হটো তবে তোমাদের ত্যাগ করব,
ত্যাগ করব—আর কখনো ভালবাসব না।

হাম্‌যা ওসমানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন আর অল্পক্ষণেই ওসমানের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটালো। হাম্‌যা বীরদর্পে হাঁকতে লাগলেন ঃ আমি তাঁর পুত্র যিনি হজ-যাত্রীদের পানী খাওয়াতেন। (আব্দুল মোত্তালেবের উপরে ন্যস্ত ছিল এই ভার)। তাল্‌হা-পরিবারের দুই ভাই তিন পুত্র একের পর এক কোরেশদের পতাকা ধারণ করল। আর পরপর নিহত হল।

ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। আবু দোযানা যুদ্ধ করতে করতে শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। যাকেই সামনে পেলেন তাকেই তিনি নিহত করে চলেছিলেন। তাঁর সামনে পড়ে এমন একজন কোরেশ-যোদ্ধা বহু মুসলমান যার হাতে নিহত হয়েছিল। আবু দোযানা ও সেই যোদ্ধা পরস্পরকে আঘাত করলেন, কোরেশ-যোদ্ধার তলোয়ার আবু দোযানার ঢালে আটকে গেল, সেই অবকাশে আবু দোযানা তাকে নিহত করলেন।

যুদ্ধ করতে করতে আবু দোযানার তলোয়ার উদ্যত হয়েছিল হিন্দের মাথার উপরে। এ সম্বন্ধে আবু দোযানা বলেছেন ঃ দেখলাম একজন খুব চেঁচিয়ে শত্রুদলকে উত্তেজিত করছে। তার উপরে তলোয়ার তুলতেই সে আর্তনাদ করে উঠল.—আহ্‌হা এ যে দেখছি মেয়েলোক। নবীর তলোয়ার সম্বন্ধে আমার এতখানি সম্ভ্রমবোধ ছিল যে একজন নারীকে তা দিয়ে আঘাত করতে বিরত হলাম।

হাম্‌যা যুদ্ধ করে চলেছিলেন। বহু কোরেশসৈন্য তাঁর তরবারির আঘাতে সেদিন নিহত হয়েছিল। কিন্তু আড়ালে থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে চলেছিল ওহ্‌শি। যখন হাম্‌যা আবু নিয়ারের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন সুযোগ বুঝে ওহ্‌শি তাঁকে বর্শা ছুঁড়ে মারে। তার অব্যর্থ-লক্ষ্য বর্শায় হাম্‌যার তলপেট বিদ্ধ হল। আবু নিয়ারকে নিহত করে তিনি ওহ্‌শির দিকে অগ্রসর হলেন, কিন্তু এগোতে পারলেন না, পড়ে গেলেন। ওহ্‌শি বলেছে, হাম্‌যার দেহ প্রাণহীন হলে আমি গিয়ে আমার বর্শা নিয়ে এলাম আর ছাউনিতে চলে গেলাম, কেন না আর কারো সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

বহু পরে ওহ্‌শি মুসলমান হয়েছিল। হযরত তাকে ক্ষমা করেছিলেন। তবে বলেছিলেন সে যেন তাঁর সামনে না আসে।

মুসলমান পক্ষের পতাকা বহন করছিলেন মোস্‌আব। তাঁকে নিহত করে ইব্‌নে কামিয়া। নিহত করে ইব্‌নে কামিয়া কোরেশদলে গিয়ে বলে: আমি মোহম্মদকে হত্যা করেছি: তার কারণ হযরতের সঙ্গে মোস্‌আবের চেহারার মিল ছিল।

এই সংবাদ খুব রাষ্ট্র হয়। আনসার দলের হান্‌যালা বিন্‌ আবু আমেরের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় আবু সুফিয়ান। কিন্তু আবু সুফিয়ানকে হানযালা যখন কাবু করে ফেলেছে তখন শাদ্দাদ্‌ বিন্‌ আস্‌ওয়াদ অগ্রসর হয়ে হানযালাকে নিহত করে। এই হানযালা সম্বন্ধে বিবৃত হয়েছে—হযরত তার সম্বন্ধে বলেছিলেন: হানযালার আবশ্যিক স্নানের প্রয়োজন ছিল, মৃত্যুর পরে তাকে স্নান করিয়ে দেয় ফেরেশতারা।

মুসলমান পক্ষ, বিশেষ করে আলী, হাম্‌যা, আবু দোযানা আর আয্‌-যুবের, মহাবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছিলেন। ফলে কোরেশ-পক্ষ পিছে হট্‌লো আর ছত্রভঙ্গ হল। তারা তাদের ছাউনি ছেড়ে চলে গেল। তখন মুসলমান সৈন্যেরা আরম্ভ করলো লুণ্ঠন। তা দেখে তাদের পশ্চাৎরক্ষা তীরন্দাজদলেরও অনেকে, হযরতের নির্দেশ ভুলে, লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হল। তীরন্দাজ দলের এমন ছত্রভঙ্গ দশা লক্ষ্য করে

খালেদ তার অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে মুহূর্তে এগিয়ে এল আর যে কয়েকজন তীরন্দাজ ঘাঁটি রক্ষা করছিল তাদের পর্যুদস্ত করে ছত্রভঙ্গ মুসলমানদের উপরে এসে পড়ল। সেই সঙ্গে ধ্বনি উঠেছিল: মোহম্মদ নিহত হয়েছে। মুহূর্তে মুসলমানদের দশা সংকটাপন্ন হল—বিজয় পরিণত হল বিপর্যয়ে।

মুসলমানরা পালাতে আরম্ভ করেছিল। অনেকে মারা পড়ল। পেছন থেকে হযরত তাদের ডাকছিলেন: কোথায় যাচ্ছ, ফিরে এসো, আমি আল্লাহ্‌র রসুল, ফেরো; —কিন্তু তারা পালাচ্ছিলই।

এর পর শত্রুদলের কাজ হল হযরতের উপরে আক্রমণ চালানো, কেন না শীগগিরই তারা জানতে পেরেছিল মোহম্মদ নিহত হয়েছে এ সংবাদ সত্য নয়। মোস্তফা চরিতে বলা হয়েছে:

"মোহম্মদ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া কোরেশ সৈন্যদল এতক্ষণ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের একদল যখন দেখিল যে এ সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, তিনি তাহাদিগের সম্মুখে অক্ষত দেহে দণ্ডায়মান আছেন—তখন তাহারা আর সকলকে ত্যাগ করিয়া সমবেত ভাবে হযরতের উপর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।··· কিন্তু মুসলমানগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিফলমনোরথ করিয়া দিতে লাগিলেন। ভক্তকুল-শিরোমণি 'ছা'আদ অব্যর্থ-লক্ষ্য তীরন্দাজ, তিনি হজরতের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যদিগের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দুইখানা ধনুক ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি অন্যের নিকট হইতে নূতন ধনুক সংগ্রহ করিয়া তীর চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে ছাআদ একাই সেদিন ন্যূনাধিক এক সহস্র বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। আবু তাল্‌হাও মদিনার বিখ্যাত তীরন্দাজ। তিনি কাফেরদিগের অস্ত্র বর্ষণ দর্শনে বিচলিত হইয়া নিজের গাণ্ডীব হজরতের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন এবং ঢাল লইয়া হজরতের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। হজরত এক একবার ঢালের আড়াল হইতে মুখ বাহির

করিয়া যুদ্ধের অবস্থা দেখিতে যান, আর আবু তাল্‌হা চমকিত হইয়া বলেন ঃ প্রভু ! বাহির হইবেন না।

......এই সময় আবু তাল্‌হা হজরতের প্রতি নিক্ষিপ্ত বাণগুলি নিজের বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আবু দোজ্জানার বীরত্বের কথা পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এই বিপদের সময় তিনিও আসিয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণপণে শত্রুপক্ষের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। একজন শত্রু হজরতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্ষা নিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া আবুদোজ্জানা কুব্জ হইয়া নিজের দেহ দ্বারা হজরতকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। চক্ষের পলকে বর্শাটি আবুদোজ্জানার পৃষ্ঠদেশে বিদ্ধ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপে শত্রুপক্ষের বাণ ও বর্শার আঘাতে আবুদোজ্জানার পৃষ্ঠদেশ জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল।"

ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ভোগের পরে ওম্মে আমারা নাম্নী এক মহিলা অসাধাবণ শৌর্যবীর্যের আর হযরতের প্রতি অসাধারণ আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন: তাঁর সম্বন্ধে মোস্তফা চরিতে বর্ণিত হয়েছে :

"...বিবি আয়েশা প্রভৃতি মোছলেম মহিলাগণের সহিত ইনিও শুশ্রূষা-কারিণীরূপে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আহত সৈনিকগণকে জলদান এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য প্রকার সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন যে, মুসলমানগণ পরাজিত হইয়াছে এবং কোরেশসৈন্য হজরতকে অক্রেমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ওম্মেন আমারা কাঁধের মশক ও হাতের জলপাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং তীরধনুক ও তরবারি লইয়া হজরতের নিকট ছুটিয়া গেলেন। তখন মুষ্টিমেয় ভক্ত প্রাণপণ করিয়া হজরতের দেহরক্ষা করিতেছিলেন। ওম্মে আমারা সিংহিনীর ন্যায় বিক্রমসহকারে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে বাণ বর্ষণ করিয়া কোরেশদিগকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। শেষে যখন তীরে আর কুলাইল না, তখন

তিনি উলঙ্গ তরবারী হস্তে অগ্রগামী কোরেশদিগের উপর আপতিত হইলেন। শত্রুদিগের বর্শা ও তরবারির আঘাতে তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত ও জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই মোছলেম বীরাঙ্গনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ওহোদ যুদ্ধের বর্ণনা কালে স্বয়ং হজরত বলিয়াছেন ঃ— সেই বিপদের সময় আমি দক্ষিণে বামে যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি ওম্মে আমারা আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করিতেছে।"

কিন্তু এই ক্ষুদ্র রক্ষীদলের উপরে এসে পড়ল মোসআবের হত্যাকারী ইব্‌নে কামিয়া ও তার দলবল। ইব্‌নে হিশামে আছে ঃ উৎবা বিন্ আবু ওয়াক্কাসের নিক্ষিপ্ত পাথরে হযরতের নিচের ঠোঁটে আঘাত লাগে আর তাঁর ডানদিকের নিচের একটি সামনের দাঁত ভেঙে যায়; আব্দুল্লাহ বিন্ শিহাব আহত করে তাঁর কপাল, আর ইব্‌নে কামিয়ার তলোয়ারের আঘাতে তাঁর মাথার আবরণের দুটি আংটা তাঁর চিবুকের হাড়ের মধ্যে বসে যায়। ইব্‌নে কামিয়ার সেই আঘাত হাত দিয়ে ঠেকিয়েছিলেন তাল্‌হা ইব্‌নে ওবেদুল্লাহ, তাতে তাঁর আঙুলগুলো জন্মের মতো অকেজো হয়ে যায়।

আবু আমির মুসলমানদের জন্য গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল : তারই এক গর্তে হযরত পড়ে যান। তাঁর বদনমণ্ডল থেকে রক্ত ঝরছিল; তিনি হাত দিয়ে তা মুছে ফেলছিলেন আর বলছিলেন, কেমন করে সেই জাতির ভালো হতে পারে যারা তাদের পয়গাম্বরের মুখ রক্তরঞ্জিত করেছে যখন তিনি তাদের আহ্বান করছেন তাদের প্রতিপালকের দিকে। তখন তাঁর লাভ হয় এই প্রত্যাদেশ ঃ

> এটি তোমার ব্যাপার আদৌ নয় যে তিনি তাদের দিকে (সদয়ভাবে) ফিরবেন, না, শাস্তি দেবেন; যদিও নিঃসন্দেহ তারা অন্যায়কারী।†

† ৩: ১২৭

তাল্হা বিন্ ওবেদুল্লাহ সম্বন্ধে হযরত সেদিন বলেছিলেন : একজন শহীদ্কে যদি কেউ মাটির উপরে চলতে ফিরতে দেখতে চায় তবে সে দেখুক তালহা বিন্ ওবেদুল্লাহকে।

আবু উবায়দা বিন্ আল্-জার্রাহ্ হযরতের চিবুক থেকে সেই দুটি আংটা দাঁত দিয়ে তোলেন, তাতে তাঁর দুটি দাঁত ভেঙে যায়।

মুসলমানদের এই ভাগ্যবিড়ম্বনার পরে হযরতকে প্রথম চিনতে পারেন কাব বিন্ মালিক। তিনি বলেছেন : হযরতের শিরস্ত্রাণের নীচে তাঁর দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছিল। তাঁকে দেখে কাব চেঁচিয়ে বলেন : সাহসে বুক বাঁধো মুসলমানেরা, এই যে আল্লাহর রসুল! কিন্তু হযরত তাঁকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করেন।

নবীকে চিনতে পেরে মুসলমানেরা তাঁকে সংকীর্ণ উপত্যকার দিকে নিয়ে গেলেন, তখন তাঁর দিকে এগিয়ে আসে উবাই বিন্ খলফ এই বলতে বলতে : মোহম্মদ কোথায়, সে রেহাই পেলে আমি রেহাই পেতে চাই না। মুসলমানেরা বল্লেন : আমরা একজন কি তার দিকে এগোবো? নবী বল্লেন : তাকে কিছু বলো না; আর উবাই যখন এগিয়ে এলো তখন আল-হারিসের কাছ থেকে বর্শা নিয়ে তার ঘাড়ে এক খোঁচা দিলেন, তাতে সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল।

উবাইয়ের ঘাড়ে সামান্য আঁচড় লেগেছিল, কিন্তু তার ধারণা হয়েছিল সে এই আঘাতে মারা যাবে। মক্কার পথে সে মারা যায়।

যখন রসুল সংকীর্ণ উপত্যকার মুখের কাছে পৌছলেন তখন আলি ঢালে করে পানি নিয়ে এলেন; কিন্তু সেই পানি থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল, হযরত তা পান করলেন না, তা দিয়ে মুখের রক্ত ধুয়ে ফেললেন ও মাথায় ঢাললেন।

হযরত যখন এই উপত্যকায় ছিলেন তখন পাহাড়ের উপরে একদল কোরেশ সৈন্য এসে পড়ে। ওমর ও কয়েকজন মোহাজীর তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন।

নীচে থেকে পাহাড়ের উপরে উঠতে হযরতকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন আহত তালহা বিন্ উবেছুল্লাহ। পাহাড়ের উপরে মুসলমানেরা কিছু নিরাপদ বোধ করেন—তাঁদের অনেকের তন্দ্রা আসে। কোরআনে তার বর্ণনা আছে।

বিপর্যস্ত হয়েও বহু মুসলমান সেদিন অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

মুখয়বিক নামে একজন ইহুদী হযরতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নি। ওহোদের যুদ্ধের দিন সে হযরতের সপক্ষে যুদ্ধ করে ও নিহত হয়।

উসেবিম নামে এক বহুদেববাদী এ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নি। কিন্তু ওহোদের দিন সে তলোয়ার নিয়ে হযরতের পক্ষে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করে আর দেহে বহু আঘাত পায়। তাকে দেখে লোকেরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে কেন সে যুদ্ধে যোগদান করেছিল—তার গোত্রের লোকদের ভালোর জন্যে অথবা ইসলামের প্রতি অনুরাগের জন্য? সে উত্তর দেয়ঃ ইসলামের প্রতি অনুরাগের জন্য; আমি আল্লাহতে ও রসুলে বিশ্বাসী হই ও মুসলমান হই, তার পর তলোয়ার নিয়ে রসুলের পক্ষে যুদ্ধ করে এমন আহত হয়েছি। তার সম্বন্ধে বলা হয়ঃ নামায আদৌ না পড়ে সে বেহেশ্তবাসী হয়েছিল।

এরপর হিন্দ ও তাঁর সঙ্গিনীরা হযরতের মৃত সঙ্গীদের শব বিকলাঙ্গ করতে তৎপর হল। তাদের নাক কান কেটে হিন্দ পায়ের মল ও গলার হার বানালো আর তার নিজের মল ও হার দিল ওহশিকে। সে হাম্‌যার কলিজা বার করে তা চিবোলো, আর তা গিলতে না পেরে ফেলে দিল। তার পরে এক উঁচু পাহাড়ের মাথায় চড়ে চিৎকার করে বলতে লাগলঃ

বদরের প্রতিশোধ তোমাদের দিয়েছি, ...

যুদ্ধের পরে যে যুদ্ধ হয় তা ভয়ঙ্কর।

...আমি আমার প্রতিশোধ-স্পৃহা তৃপ্ত করেছি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছি,

ওরে ওহশি, তুই আমার বুকের জ্বালা জুড়িয়েছিস……

যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে যাবার কালে আবু স্থফিয়ান পাহাড়ের উপরে উঠে চেঁচিয়ে বল্লে ঃ খুব করেছ তোমরা, যুদ্ধে হার জিতের বদলাবদলি হয়; আজকের দিন সেই দিনের বদলা। হে হুবাল, তোমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন কর। রস্থল ওমরকে বল্লেন উঠে দাঁড়িয়ে তার উত্তর দিতে ও বলতে ঃ আল্লাহ মহোত্তম—মহিমান্বিত; আমরা তুল্য নই, আমাদের মৃতেরা বেহেশতে আর তোমাদের মৃতেরা দোযখে। আবু স্থফিয়ান তখন ওমরকে তার কাছে ডাকলে। হযরত তাঁকে বল্লেন ঃ গিয়ে দেখ কি তার মতলব। তিনি কাছে গেলে আবু স্থফিয়ান বল্লে ঃ ওমর, আল্লাহর নামে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি আমরা কি মোহম্মদকে নিহত করতে পেরেছি? তিনি বল্লেন, আল্লাহর শপথ, তোমরা পারো নি, তুমি এখন যা বলছ তা তিনি শুনছেন। আবু স্থফিয়ান বল্লে ঃ ইবনে কামিয়ার কথার চাইতে তোমার কথা আমি বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করি।

এরপর আবু স্থফিয়ান চেঁচিয়ে বল্লে ঃ তোমাদের মৃতদের কয়েকজনের দেহ বিকলাঙ্গ করা হয়েছে; আল্লাহর শপথ এতে আমি সন্তুষ্টও নই ক্রুদ্ধও নই, এ আমি নিষেধও করিনি এর হুকুমও দিই নি। তারপর আবুস্থফিয়ান ও তার সঙ্গীরা চলে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বল্লে ঃ তোমাদের সঙ্গে সামনে বছরে দেখা হচ্ছে বদরে। রস্থল তাঁর একজন সঙ্গীকে বলতে বল্লেন ঃ হাঁ, এই আমাদের দুই দলের মধ্যে কথা রইল।

রস্থল হামযার মৃতদেহের খোঁজে বেরুলেন আর দেখলেন উপত্যকার তলদেশে তা পড়ে আছে বিদীর্ণ অবস্থায়, তাতে তাঁর কলিজা নেই, তাঁর নাক কান কাটা। হযরত খুব শোকাভিভূত হলেন ও বল্লেন…যদি আল্লাহ ভবিষ্যতে কোরেশদের উপরে আমাকে বিজয়ী করেন তবে তাদের ত্রিশ জনকে বিকলাঙ্গ করব। তাঁর সঙ্গীরাও অনুরূপ কথা বল্লেন। বিবৃত হয়েছে এই সময়ে অবতীর্ণ হয় এই বাণী ঃ

আর যদি তোমরা প্রতিঘাত কর তবে তোমাদের যতটা আঘাত দিয়েছিল তার মতো দাও, আর যদি ধৈর্য ধর, নিঃসন্দেহ তা ভালো

যারা ধৈর্যবান তাদের জন্য।

আর ধৈর্য ধর, আর তোমার ধৈর্য আল্লাহ থেকে বৈ নয়, আর তাদের সম্বন্ধে দুঃখ কোরো না, আর বিপন্ন বোধ কোরো না তারা যে চক্রান্ত করে সে জন্য। (১৬ঃ ১২৬-৭)

এর ফলে হযরত তাদের ক্ষমা করলেন ও ধৈর্য ধারণ করলেন। আর নিহতদের বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদের কবর দেওয়া হল—তাদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্র হল তাদের কাফন। এক কবরে দুই তিন জনের গোর দেওয়া হল। ইব্‌নে ইসহাকে আছে শহীদদের জানাজা পড়া হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বস্ত হাদিসের মতে জানাজা পড়া হয় নি।

মদিনায় ফিরবার সময় হযরতের পথে পড়ে বনি দিনার গোত্রের একজন স্ত্রীলোক। তার স্বামী, ভাই ও পিতা ওহোদক্ষেত্রে মারা গিয়েছিল, তাদের সংবাদ শুনে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলে রসুলের কি হয়েছে। যখন সে শুনলে যে তিনি নিরাপদে আছেন তখন সে তাঁকে দেখতে চাইল এবং দেখে বল্লেঃ যখন আপনি নিরাপদে আছেন তখন আর সব দুর্ভাগ্য তুচ্ছ।

ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল শাওয়ালের মাঝামাঝি শনিবারে। পরদিন ভোরের আযানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের জানানো হলো শত্রুর পশ্চাৎ-ধাবনের জন্য তৈরি হতে, আর বলা হলো এই যুদ্ধ যাত্রায় তারাই যোগদান করবে যারা পূর্বদিনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। ইব্‌নে ইসহাকে আছে হযরত এই যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন শত্রুদের এই দেখাবার জন্য যে মুসলমানরা হীনবল হয় নি।

এই যাত্রায় হযরত মদিনা থেকে আট মাইল দূরবর্তী হামরাউল-আসাদ পর্যন্ত যান।

তিহামার খুযাআ গোত্রের মুসলমান ও অমুসলমান সবাই হযরতের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ ছিল। তাদের গোত্রের মা'বাদ তখনও ছিল বহুদেববাদী। সে এসে হযরতকে সান্ত্বনা দিলে ও তাঁর শুভকামনা করলে আর হাম্-

রাউল-আসাদে হযরতকে রেখে সে গেল আল-রাউহায় আবু সুফিয়ানের কাছে। আবু সুফিয়ান ও তার দলবল তর্কবিতর্কের পর ঠিক করেছিল যে তারা মদিনা আক্রমণ করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করবে। মা'বাদকে সে জিজ্ঞাসা করলেঃ খবর কি? মা'বাদ বল্লেঃ মোহম্মদ ও তার দলবল এমন এক সৈন্যদল নিয়ে আসছে যাদের তুল্য সৈন্যদল আমি পূর্বে দেখি নি; যারা তার সঙ্গে আগে যোগ দেয় নি তারাও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আবু সুফিয়ান অবিশ্বাস করলে। কিন্তু মা'বাদের কথায় পুনরায় আক্রমণের চেষ্টা না করে মক্কায় ফিরে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলে।

সোম মঙ্গল ও বুধবার হামরাউল-আসাদে কাটিয়ে হযরত মদিনায় ফেরেন।

হাম্‌রাউল-আসাদে কোরেশ পক্ষের একজন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। সে আমাদের সুপরিচিত কবি আবহুল আযযা। বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য সে প্রাণদণ্ড লাভ করে।

মদিনায় কোরেশ পক্ষের আর একজনও বন্দী হয়—সে মা'আবিযা। তাকে চলে যাবার জন্য তিন দিনের সময় দেওয়া হয়।
কিন্তু তার যাওয়া হয় না। তারও প্রাণদণ্ড হয়।

এই পর্যন্ত জুমার নামাযের দিন আবদুল্লাহ বিন্ উবাই একটি বিশেষ স্থানে বসতো আর জুমায় হযরতের খোতবা (ভাষণ) দানের পরে উঠে বলতোঃ হে জনগণ, ইনি আল্লাহর নবী, তোমাদের মধ্যে তাঁকে দিয়ে আল্লাহ তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়েছেন, সেজন্য তাঁকে সাহায্য করো, আর তাঁর বলবৃদ্ধি কর, আর তাঁর হুকুম মানো। এই ধারাই সে এতদিন অনুসরণ করে আসছিল। কিন্তু সেদিন সে যখন বক্তৃতা দিতে উঠল তখন মুসলমানরা তার কাপড় ধরে টেনে বল্লেঃ বসে পড় আল্লাহর শত্রু, যা করেছ এর পরে আর এ তোমার শোভা পায় না। আবদুল্লাহ বিন্ উবাই মসজিদ্ ছেড়ে চলে যায়।

ওহোদের দিন ছিল মুসলমানদের জন্য এক শক্ত পরীক্ষার দিন। কিন্তু সেই দিন বাছাই হয়ে গিয়েছিল কারা বিশ্বাসী আর কারা কপট।

ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের নিহত হয়েছিল ৭০ জন। তাদের মধ্যে চার জন ছিল মোহাজীর, আর কোরেশদের নিহত হয়েছিল ২২ জন;— এই ইব্‌নে ইসহাক ও ইব্‌নে হিশামের মত। ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের যে পরাভব ঘটেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কোরআনের বাণীতেও তার পরিচয় রয়েছে। তবে ওহোদে কোরেশদের বিজয় লাভ হলেও পূর্ণ বিজয় বলতে যা বোঝায় তা তাদের লাভ হয় নি। তারা যে মুসলমানদের পুনরায় আক্রমণ না করে মক্কায় ফিরে গেল এতেও রয়েছে তার প্রমাণ।

বর্ণিত হয়েছে সূরা আল্-ই-ইমরানের ষাটটি আয়াত ওহোদ যুদ্ধ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। সেই সব আয়াতের কয়েকটি আমরা উদ্ধৃত করছি:

"আর আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করেছিলেন বদরে যখন তোমরা ছিলে দুর্দশাগ্রস্ত—সেজন্য আল্লাহর সীমা রক্ষা করে চলো যেন তোমরা ধন্যবাদ দিতে পারো।

যখন তুমি বিশ্বাসীদের বলেছিলে: এইটি কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে তোমাদের পালয়িতা তোমাদের সাহায্য করবেন তিন হাজার নেমে-আসা ফেরেশতা দিয়ে? আর যদি তোমরা ধৈর্যবান হও আর সীমারক্ষা করো আর তারা তোমাদের উপরে এসে পড়ে প্রবল বেগে—তোমাদের পালয়িতা তোমাদের সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার দলনকারী ফেরেশতা দিয়ে।

আর আল্লাহ্ এটি করেন নি তোমাদের জন্য সুসংবাদ ব্যতীত আর যেন তোমাদের হৃদয় এর দ্বারা সান্ত্বনা পায়; আর বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে থেকে—(তিনি) মহাশক্তি, জ্ঞানবান।

যেন তিনি তাদের একদলকে সংহার করতে পারেন অথবা অপমানিত করতে পারেন যার ফলে তারা ফিরে যাবে বিফলমনোরথ হয়ে।...

আর অবসাদগ্রস্ত হয়ো না আর অনুশোচনা কোরো না, আর তোমরাই স্থান পাবে উপরে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

তোমরা যদি আঘাত পেয়ে থাকো তবে তুল্য আঘাত পীড়া দিয়েছে অবিশ্বাসী লোকদের, আর আমি এই সব দিন মানুষদের কাছে আনি পালাক্রমে, আর যেন আল্লাহ জানতে পারেন কারা বিশ্বাসী আর তাদের মধ্যে থেকে সাক্ষী রাখতে পারেন; আর আল্লাহ ভালোবাসেন না অন্যায়কারীদের।

আর যেন সংশোধিত করতে পারেন যারা বিশ্বাসী তাদের, আর নিষ্ফল করতে পারেন অবিশ্বাসীদের।

অথবা তোমরা কি মনে করো যে তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করবে তোমাদের মধ্যে কারা সংগ্রাম করেছে আল্লাহর তা জানবার পূর্বেই? আর জানবার পূর্বে কারা ধৈর্যবান?

আর নিঃসন্দেহ তোমরা মৃত্যু কামনা করতে তার সঙ্গে (যুদ্ধক্ষেত্রে) দেখা হবার পূর্বে। এখন নিঃসন্দেহ তা তোমরা দেখেছ—আর তোমরা দেখতে থাকো।

আর মোহম্মদ একজন বাণীবাহক বৈ নন।

নিঃসন্দেহ তাঁর পূর্বে পয়গাম্বররা গত হয়ে গেছেন, যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পশ্চাৎপদ হবে? আর যে কেউ পশ্চাৎপদ হয় সে আল্লাহ্‌কে কোনো আঘাত দেয় না আদৌ, আর আল্লাহ্ পুরস্কার দেবেন কৃতজ্ঞদের।

আর কোনো লোকের মৃত্যু হয় না আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত, মৃত্যুর নির্ধারিত সময় লিখিত আছে, আর যে কেউ চায় ইহজীবনের পুরস্কার আমি তাকে তা দিই, আর যে কেউ চায় পরলোকের পুরস্কার আমি তা তাকে দিই, আর আমি পুরস্কৃত করবো কৃতজ্ঞদের।

আরো কত বাণীবাহক যুদ্ধ করেছেন—তাঁদের সঙ্গে ছিল পালিয়তার বহু অনুগত জন, আর আল্লাহ্‌র পথে যা তাদের উপরে পড়েছিল তার

জন্য তারা অবসাদগ্রস্ত হয় নি, তারা দুর্বলও হয় নি, তারা নিজেদের হীনও করে নি ; আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন ধৈর্যশীলদের।

আর এ ভিন্ন তারা আর কিছু বলে নি : হে আমাদের পালয়িতা, ক্ষমা করো আমাদের অপরাধ ও আমাদের কাজে আমাদের সীমালঙ্ঘন, আর দৃঢ় করো আমাদের পদক্ষেপ, আর আমাদের সাহায্য করো অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছিলেন যখন তোমরা তাঁর ইচ্ছায় তাদের হত্যা করেছিলে : শেষে তোমরা সাহসহীন হলে আর তোমরা আদেশ সম্বন্ধে বিরোধ করলে আর অবাধ্য হলে যা তোমরা ভালবাস আল্লাহ্ তা তোমাদের দেখাবার পরে ; তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা এই দুনিয়া চাচ্ছিল, আর তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা পরকাল চাচ্ছিল ; তারপর যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন সেজন্য তোমাদের তাদের থেকে পলায়নপর করলেন। আর নিঃসন্দেহ তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন ; আর আল্লাহ্ অশেষকৃপাময় বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে।

যখন তোমরা পাহাড়ে উঠছিলে আর কারো জন্য অপেক্ষা করছিলে না, আর পয়গাম্বর পিছন থেকে তোমাদের ডাকছিলেন ; এরপর তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের বিষাদের উপরে বিষাদ পুরস্কার দিলেন, যেন তোমরা অনুশোচনা না কর যা পাও নি আর তোমাদের উপর যা এসে পড়েছে —সেসবের জন্য ; আর আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

এরপর বিষাদের পরে তিনি তোমাদের উপরে অবতীর্ণ করলেন শান্তি —তোমাদের একদলের উপরে এলো তন্দ্রা—আর একদলের নিজেদের মন তাদের উৎকণ্ঠিত করেছিল, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অসঙ্গতভাবে অজ্ঞানমূলক চিন্তা পোষণ করেছিল এই বলে : এই ব্যাপারে আমাদের কি কোনো কিছু আছে ? বলো : নিঃসন্দেহ ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহর। তারা নিজেদের মধ্যে যে চিন্তা লুকিয়ে রেখেছে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করছে না ; তাদের বক্তব্য : এই ব্যাপারে যদি আমাদের কোনো-

কিছু থাকতো তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলো ঃ যদি তোমাদের নিজেদের বাড়ীতেও থাকতে তবে যাদের জন্য প্রাণঘাত লিখিত হয়েছে নিঃসন্দেহ তারা তাদের সেই স্থানে গিয়ে হাজির হতো ; (এসব ঘটেছে এইজন্য যে) আল্লাহ্ যেন যাচাই করতে পারেন যা আছে তোমাদের বুকের ভিতরে আর শোধিত করতে পারেন যা আছে তোমাদের অন্তরে ; আর আল্লাহ্ জানেন যা আছে বুকের ভিতরে।

... ...

আর যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত হও অথবা মারা যাও—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্র কাছে থেকে ক্ষমা আর করুণা উৎকৃষ্টতর তারা যা সঞ্চয় করে তার চাইতে।

আর কি এসে যায় যদি আল্লাহ্র পথে নিহত হও অথবা মারা যাও যখন আল্লাহ্র কাছে তোমরা একত্রিত হবে ?

এটি আল্লাহ্র করুণার ফলে যে তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে, যদি রুক্ষ ও কঠোর-হৃদয় হতে তবে নিঃসন্দেহ তারা তোমার চারপাশ থেকে চলে যেতো। অতএব তাদের মার্জনা করো, আর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো, আর যখন সংকল্প গ্রহণ করেছ তখন আল্লাহ্র উপরে নির্ভর করো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন নির্ভরশীলদের।

... ...

আর যেদিন দুই সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন যা ঘটেছিল তা আল্লাহ্র জ্ঞাতসারে, যেন তিনি বিশ্বাসীদের জানতে পারেন।

আর যেন তিনি কপটদের জানতে পারেন ; আর তাদের বলা হয়েছিল ঃ এসো, আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো অথবা নিজেদের রক্ষা করো, তারা বলেছিল ঃ যদি আমরা যুদ্ধ করতে জানতাম নিঃসন্দেহ তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা বিশ্বাসের চাইতে অবিশ্বাসের নিকটতর হয়েছিল। তারা মুখে যা বলে তা নেই তাদের অন্তরে, আর আল্লাহ্ ভালো জানেন যা তারা লুকোচ্ছে।

যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত ভেবো না। না, তারা বেঁচে আছে, আল্লাহ্‌র কাছে থেকে (তারা) জীবিকা পায়।”

ওহোদের প্রতিক্রিয়া

ওহোদে মুসলমানদের পরাভব ঘটেছে দেখে কোনো কোনো আরব গোত্র মুসলমানদের আক্রমণ করবার উদ্যোগ করল। বানু আসাদ গোত্রের দুই ভাই তুলাইহা ও সালামার এমন উদ্যোগের কথা হযরতের কর্ণগোচর হল। তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালেন এক শ’ পঞ্চাশ জন যোদ্ধা, আর সালাম বিন্ আবদুল আসাদ হলেন তাদের পতাকাবাহী। এই দল সন্তর্পণে অগ্রসর হল ও অতর্কিতে শত্রুদের আক্রমণ করল। বানু আসাদ কতকগুলো পশু ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। বলা বাহুল্য সেসব পশু মুসলমানদের হস্তগত হল।

এরপর আর এক আক্রমণের আয়োজন হয় মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী ওরানায় অথবা নাখলায়—সুফিয়ান ইব্‌নে খালিদের নেতৃত্বে। তার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন আবদুল্লাহ্‌ বিন্ হুনেস। তিনি একাই গিয়ে কৌশলে খালেদ বিন্ সুফিয়ানকে হত্যা করেন।

চতুর্থ হিজরীতে মুসলমানদের প্রতি দুটি বড় রকমের বিশ্বাস-ঘাতকতা ঘটে, একটি আল্ রাজীতে (ইব্‌নে ইসহাকের মতে এটি তৃতীয় হিজরীর ঘটনা), অপরটি বীর মাউনায়। রাজীর ঘটনাটি এই ঃ আদল ও আল্-কারা গোত্রের কয়েকজন এসে হযরতকে বলে যে তাদের মধ্যে এরই মধ্যে কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেছে ; তারা তাঁকে অনুরোধ করে তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে পাঠিয়ে দিতে তাদের কোরআন এবং ইসলামীয় নিয়মকানুন শিক্ষা দেবার জন্য। তিনি তাঁর এই ছয়জন সঙ্গীকে পাঠালেন ঃ মার্তহাদ, খালিদ্ বিন্ আল্ বুকের, আসীম, খুবায়েব, যায়েদ বিন্ আল্ দাতহীন্না আর আবদুল্লাহ্‌ বিন্ তারিক—মার্তহাদ হলেন এদের নেতা। এই দল হিজাযের হুযেল বংশের জলাশয় পর্যন্ত গেলে তাদের এসে আক্রমণ

করল হুযেল গোত্রের লোকেরা। মুসলমানরা প্রস্তুত ছিল না, তবু তাদের বাধা দেবার জন্য তারা তলোয়ার ধরল। আততায়ীরা তাদের বোঝালো তাদের (মুসলমানদের) হত্যা করবার মতলব তাদের নয়, কিন্তু মুসলমানরা তাদের বিশ্বাস করল না। যায়েদ, খুবায়েব ও আব্দ ল্লাহ্ ভিন্ন সবাই নিহত হলো; এরা তিনজন বন্দী হল। পথে আব্দল্লাহ্ নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নিহত হয়। খুবায়েব ও যায়েদকে মক্কায় নিয়ে যাওয়া হয়।

যায়েদকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলে কোরেশের বহু লোক তার হত্যা দেখতে আসে। আবু সুফিয়ান তাকে বলে ঃ যায়েদ, তুমি কি চাও না যে তোমার জায়গায় মোহম্মদকে পেয়ে তার মুণ্ডচ্ছেদ আমরা করি আর তুমি নিরাপদে থাক তোমার পরিজনদের সঙ্গে? যায়েদ উত্তর দেয়; আল্লাহ্‌র শপথ, আমি চাই না আমার যে স্থান লাভ হয়েছে তা মোহম্মদের লাভ হয়, আমি চাই না যে তাঁর গায়ে একটি কাঁটার খোঁচা লাগে আর আমি নিরাপদে থাকি আমার পরিজনের মধ্যে। আবু সুফিয়ান বলতোঃ মোহম্মদের শিষ্যরা তাকে যেমন ভালবাসে এমন ভালবাসতে আর কাউকে দেখিনি।

খুবায়েবকে ক্রুসবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে খুবায়েব দুই রাকাত নামায পড়ার অনুমতি চায়। তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। নামাযান্তে সে বলে ঃ আমি আরো বেশিক্ষণ ধরে নামায পড়তাম যদি আমার এই সন্দেহ না হতো যে তোমরা ভাববে আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাযে দেরি করছি।

বীর মাউনার ঘটনাটি এই ঃ

আবু বরা আমির বিন্ মালিক বিন্ জাফর মদিনায় এসে হযরতকে কিছু উপহার দেয়। হযরত সেই উপহার গ্রহণ করেন না কেন না সে ছিল বহুদেববাদী। হযরত তার কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা করেন ও তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন। আবু বরা বলে ঃ মোহম্মদ, আপনি যাতে

আমাকে আহ্বান করছেন তা খুব ভালো, আপনি যদি আপনার কিছু সঙ্গীদের নেজ্‌দের লোকদের কাছে পাঠান, আর তারা তাদের কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা করে তবে আমি আশা করি যে তারা অনুকূলতা প্রকাশ করবে। হযরত বলেন ঃ নেজ্‌দের লোকেরা তাঁর লোকদের মেরে ফেলতে পারে। তাতে আবু্ বরা বলে ঃ সে তাদের জন্য জামিন্ থাকবে। সুতরাং হযরত চল্লিশ জন, (মতান্তরে ৭০ জন) খুব নিষ্ঠাবান মুসলমানদের পাঠালেন। এঁদের সম্বন্ধে মোস্তফা-চরিতে বলা হয়েছে ঃ

"এই মহাজনগণ দিনের বেলায় কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন এবং সেই আয় দ্বারা আছহাবে ছোফ্‌ফার উদাসীন সাধকগণের জন্য অন্নের সংস্থান করিয়া দিতেন। রাত্রিকালে তাঁহারা কোরআন অধ্যয়ন অধ্যাপন এবং উপাসনা ও নামাযে ব্যাপৃত থাকিতেন।"

এই দল বীর মাউনায় গিয়ে উট থেকে নামলেন ও হারাম বিন্ মিলহান্‌কে হযরতের পত্রসহ আমির বিন্ তুফেলের কাছে পাঠালেন। সে পত্র না পড়েই হারামকে হত্যা করলে। তারপর সে বানু আমির গোত্রকে এই ইসলাম-প্রচারক দলের বিরুদ্ধে আহ্বান করল। তারা আবু্ বরার অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে অস্বীকার করল। এরপর আমির বিন্ তুফেল বানু সুলায়েম প্রমুখ গোত্রের সাহায্য চাইলে আর তাদের সাহায্যে এই প্রচারকদের ঘেরাও করলে। প্রচারকরা প্রাণপণে যুদ্ধ করে সবাই মারা গেলেন কেবল কাব বিন্ যায়েদ মৃতদের মধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রইলেন; তিনি পরে খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন।

আমর বিন্ উমাইয়া ও আউফ গোত্রের একজন আনসার এই সময়ে এই প্রচারক দলের উট চরাচ্ছিল। ফিরে এসে সব দেখে আনসার লোকটি আততায়ীদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে নিহত হল, আর আমর্ বন্দী হয়ে কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করে মুক্তি পেল।

ফিরবার পথে আমরের সঙ্গে দেখা হয় বানু আমির গোত্রের দুই ব্যক্তির। আমর্ তাদের দুইজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে প্রতিশোধ নেবার জন্য, কিন্তু সে জানতো না যে বানু আমিরের সঙ্গে হযরত মৈত্রীবদ্ধ

ছিলেন। ব্যাপারটা জেনে হযরত বলেন: নিহত দুইজনের জন্য তাঁকে হত্যার মূল্য দিতে হবে।

ইব্‌নে ইসহাকে আছে: আবু বরা যখন শুনলো যে আমির বিন্ তুফেল তার অঙ্গীকারকে এমনভাবে নষ্ট করেছে, আর হযরতের সঙ্গীদের হত্যা করেছে, তখন সে খুব বিচলিত হয়েছিল। আবু বরা পরে আমির বিন্ তুফেলকে বর্শার আঘাতে হত্যা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বর্শা আমির বিন্ তুফেলের উরুতে বিদ্ধ হয়।

বনি নাযিরের নির্বাসন

বনি নাযিরের নির্বাসন সম্পর্কে ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন

বনি নাযিরের সঙ্গে বনি আমিরের এক পারস্পরিক সমঝোতা ছিল। বানু আমিরের দুইজন লোককে আমর্ বিন্ উমাইয়া আল্ দাম্‌রি হত্যা করে, আমরা জেনেছি। সেই হত্যার মূল্য চোকানো সম্বন্ধে কথা বলতে হযরত বানু নাযিরের কাছে যান। তারা বলে: হযরত এ ব্যাপারে যে নির্দেশ দেবেন তাই তারা মেনে নেবে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তারা এই ষড়যন্ত্র করে: এমন সুযোগ আর পাবে না, কাজেই একজন ছাদের উপরে গিয়ে তার মাথার উপরে একটি পাথর ফেলে দাও ও এইভাবে তার থেকে উদ্ধার পাও। হযরত তাদের এক বাড়ীর দেয়ালের পাশে বসেছিলেন। আমর্ বিন্ জিহাশ্ বিন্ কাব এই পাথর ফেলার ভার নেয়। হযরতের সঙ্গে ছিলেন তাঁর কিছুসংখ্যক সঙ্গী—তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর, ওমর এবং আলি। ইব্‌নে ইসহাকে বলা হয়েছে: এই ইহুদীরা কি ষড়যন্ত্র করছিল হযরত দৈব বাণীতে তা জানতে পারেন আর জেনে এই বলে তিনি রওনা হলেন: তোমরা যেও না যে পর্যন্ত না আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসি। তাঁর সঙ্গীরা অনেকক্ষণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করে তাঁর খোঁজ নিতে প্রবৃত্ত হলেন আর একটি লোকের মুখে শুনলেন সে হযরতকে মদিনায় প্রবেশ করতে দেখেছে। এরপর হযরতের সঙ্গীরা হযরতের মুখে শুনলেন ইহুদীরা তাঁর সম্বন্ধে যে মতলব এঁটেছে

তার কথা। হযরত সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে ও বানু নাযিরের বিরুদ্ধে অভিযান করতে।+

ইহুদীরা তাদের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের দুর্গ ছয় রাত্রি অবরোধ করা হয়েছিল। হযরত তাদের খেজুর গাছ কাটতে ও পোড়াতে আদেশ দেন। ইহুদীরা তাঁকে ডেকে বলেন : মোহম্মদ, তুমি দায়িত্বহীন ধ্বংসের কাজ নিষেধ করেছ আর যারা তা করে তাদের নিন্দা করেছ, তবে তুমি আমাদের খেজুর গাছগুলো কাটছ আর পোড়াচ্ছ কেন? তাদের এই অভিযোগের উল্লেখ আমরা কোরআনের বাণীতে দেখব।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাই প্রভৃতি অনেকে বনি নাযিরকে বলে পাঠায়ঃ তোমরা অবিচলিত থাকো, নিজেদের রক্ষা করো, আমরা তোমাদের ত্যাগ করব না, তোমরা যদি আক্রান্ত হও তবে তোমাদের সঙ্গে আমরাও যুদ্ধে লিপ্ত হব, আর যদি তোমাদের তাড়িয়ে দেয় তবে আমরাও সঙ্গে যাব। কিন্তু বনি নাযিরের এই বন্ধুরা কেউ কিছু করে না। আর আল্লাহ্ বনি নাযিরের অন্তরে প্রবেশ করালেন ভয়।—বনি নাযির হযরতকে বলে পাঠায়ঃ তারা নির্ব্বাসিত হতে রাজি আছে এই শর্তে যে তাদের প্রাণ রক্ষা করা হবে আর তাদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত উটে যা বয়ে নেওয়া যায় তাদের এমন সব সম্পত্তি নিয়ে যেতে দেওয়া হবে। হযরত এতে স্বীকৃত হন। তারা তাদের বাড়ীর দরজাগুলো পর্যন্ত উটের পিঠে বোঝাই করে একদল খয়বরে অন্যদল সিরিয়ায় যায়। ইবনে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে : বনি নাযির মহাধুমধাম করে ঢোলক বাজিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেছিল।+

বনি নাযিরের কাছ-থেকে-পাওয়া সম্পত্তি প্রধানত গরীব মোহাজিরদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

বনি নাযির সম্বন্ধে হযরত যেসব বাণী লাভ করেন সেসব পাওয়া

। ভিন্ন মতের জন্য মোস্তফা-চরিত দেখুন।

+ মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য ।

যাবে কোরআন শরীফের ৫৯ সংখ্যক সূরায়। আমরা তা থেকে কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করছি :

"আল্লাহর মহিমা কীর্তন করে যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে, আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

তিনি গ্রন্থধারীদের যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের নিজেদের গৃহ থেকে বার করে দিয়েছিলেন প্রথম নির্ব্বাসনে। তুমি ভাবো নি যে তারা চলে যাবে, আর তারা সুনিশ্চিত ছিল তাদের দুর্গ তাদের রক্ষা করবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের কাছে পৌঁছেছিলেন এমন স্থান থেকে যা তারা আশঙ্কা করে নি, আর তাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করেছিলেন, ফলে তারা তাদের গৃহগুলি বিনষ্ট করেছিল তাদের নিজেদের হাত দিয়ে আর বিশ্বাসীদের হাত দিয়ে। সেজন্য শিক্ষা গ্রহণ করো হে দৃষ্টিমানগণ।

আর যদি এ না হতো যে আল্লাহ্‌ তাদের জন্য নির্ব্বাসন বিধান করেছেন তবে নিশ্চয় তিনি তাদের শাস্তি দিতেন এই সংসারে, আর পরকালে তাদের জন্য আছে আগুনের শাস্তি—

এইজন্য যে তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধতা করেছিল, আর যে কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধতা করে তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ শাস্তিদানে কঠোর।

যা কিছু খেজুর গাছ তোমরা কেটে ফেলেছিলে অথবা তাদের মূলের উপর খাড়া রেখেছিলে, তা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে যেন তিনি দিশাহারা করতে পারেন সীমা-অতিক্রম-কারীদের। * আর যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রীরূপে তাদের থেকে আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলকে যা দিয়েছিলেন তার জন্য তোমরা কোনো ঘোড়া অথবা আরোহিযুক্ত উট ধাওয়া করাও নি ; আর আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলকে নির্দেশ দেন যার বিরুদ্ধে তিনি ইচ্ছা করেন, আর সব কিছুর উপরে আল্লাহ্‌ ক্ষমতাবান।

*লীনা শ্রেণীর খেজুর গাছ কাটা হয়েছিল—সেগুলো উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খেজুর গাছ নয়। (ইব্‌নে ইসহাক দ্রষ্টব্য।)

আর আল্লাহ্ তাঁর পয়গাম্বরকে শহরের লোকদের থেকে যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রীরূপে যা দেন তা আল্লাহ্‌র জন্য, আর রসুলের জন্য, আর নিকট আত্মীয়দের জন্য, আর অনাথ, নিঃস্ব আর পথচারীদের জন্য, ফলে তা যেন তোমাদের মধ্যেকার ধনীদের বস্তু না হয়; আর পয়গাম্বর যা তোমাদের দেন তাই গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন, নিরস্ত থাকো, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ প্রতিফল দানে কঠোর,—

(তা) সেই নিঃস্বদের জন্য যারা দেশত্যাগ করেছিল, যাদের তাদের গৃহ ও সম্পত্তি থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল, যারা অন্বেষণ করে আল্লাহ্‌র প্রাচুর্যের আর (তাঁর) প্রসন্নতার, আর সাহায্য করে আল্লাহ্‌কে ও তাঁর বাণীবাহককে; এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ।

আর যারা তাদের পূর্বে এই শহরে (মদিনায়) ও ধর্মে প্রবেশ করেছিল তারা তাদের ভালবাসে যারা তাদের কাছে আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে এসেছে, আর তাদের বুকে প্রয়োজন বোধ করে না তাদের যা দেওয়া হয়েছে তার, আর তাদের (দাবি) অগ্রগণ্য মনে করে যদিও দারিদ্র্যে তারা কষ্ট পায়; আর যে কেউ রক্ষা পায় তার অন্তরের কৃপণতা থেকে— এরাই তারা যারা সফলকাম।

... ...

তুমি কি তাদের দেখো নি যারা কপট? তাদের গ্রন্থধারী ভাইদের যারা অবিশ্বাসী তারা তাদের বলেঃ তোমাদের যদি তাড়িয়ে দেওয়া হয়, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে যাবো, আর তোমাদের সম্পর্কে আমরা কারো অনুবর্তী হবো না, আর যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবো। আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

এরা যদি বিতাড়িত হয়, তারা এদের সঙ্গে যাবে না, আর যদি এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়, তারা এদের সাহায্য করবে না, আর যদি

সাহায্য করে, তারা নিশ্চয়ই পিঠ ফেরাবে ; তারপর তাদের সাহায্য করা হবে না।

ভয়রূপে তোমরা তাদের বুকে আল্লাহ্‌র চাইতে আরো ভীষণ—এইজন্য যে সম্প্রদায় হিসাবে তারা অবোধ।

তারা সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না সুরক্ষিত বসতি অথবা দেওয়ালের আড়ালে থেকে ভিন্ন ; তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ খুব প্রবল ; তুমি তাদের ভাবতে পারো এক দেহ, আর তাদের হৃদয় বিযুক্ত, এ. এইজন্য যে তারা একটি সম্প্রদায় যারা বুদ্ধিহীন।”

বনি নাযির গোত্রের মদিনা থেকে চলে যাবার কালে অবতীর্ণ হয় কোরআন শরীফের এই বিখ্যাত বাণী : ধর্মে বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ...। এই সম্বন্ধে মোস্তফা-চরিতে বলা হয়েছে :

এছলামের পূর্বে মদিনায় মৃতবৎসা স্ত্রীলোকেরা 'মানসা' করিত যে, তাহাদের সন্তান বাঁচিলে তাহাকে এহুদীধর্মে দীক্ষিত করিবে। বান্নু নাযির বংশের এহুদগণ যখন মদিনা হইতে দেশান্তরিত হয়, তখনও আনছারদিগের পুত্রগণ (বর্ণিতরূপে) এহুদ সমাজভুক্ত হইয়াছিল। তখন একদিকে আনছারগণ বলিতে লাগিলেন—আমরা আমাদিগের পুত্রগুলিকে এহুদীদের সঙ্গে যাইতে দিব না, অন্যদিকে এহুদীরা বলিতে লাগিল—ইহারা আমাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে এতএব আমরা উহাদিগকে ছাড়িয়া যাইব না। কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি সেই সময় অবতীর্ণ হইল :—

লা-ইক্‌রাহা ফিদ্দীন ; কাদ্‌ত্তাবাইয়ানার রুশহ্‌দু মিনাল্‌ গাইই ;...

(ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই ; নিঃসন্দেহ সত্যপথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্তির পথ থেকে)।

তখন হযরত বলিলেন—ঐ যুবকগুলি নিজেদের স্বাধীন মতানুসারে কাজ করুক। তাহারা ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সমাজে প্রবেশ করিতে পারে। আর যদি তাহারা এহুদীধর্মকে পছন্দ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের আটক করিয়া রাখার অধিকার তোমাদের নাই।

বনি নাযিরের নির্বাসনের পর কিছুদিন মদিনায় অবস্থান করে' হযরত নজ্‌দের গতফান গোত্রের মুহ্‌রিব ও বনি সালাবা-র বিরুদ্ধে অভিযান করেন। দুই সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়, কিন্তু কোনো যুদ্ধ হয় না। এই অভিযানে শত্রুভয়ের জন্য নামায সংক্ষিপ্ত করার বিধান আসে।

এই বৎসরে শাবান মাসে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য হযরত বদরে যান। তিনি সেখানে নয় রাত্রি অপেক্ষা করেন। আবুসুফিয়ান ও তার দলবল মক্কা থেকে বেরিয়ে মাজান্না পর্যন্ত—মতান্তরে উসফান পর্যন্ত—গমন করে। কিন্তু আবুসুফিয়ানের নির্দেশে তারা ফিরে যায়, কেন না সেই বৎসর ছিল দুর্বৎসর, পশুদের চরবার সুবিধা ছিল না। মক্কার লোকেরা তাদের এই সৈন্যদলের নাম দেয় "ছাতুর ঘন শরবতের সৈন্যদল," কেন না, তাদের মতে এই সৈন্যদল ছাতুর ঘন শরবত খাবার জন্য বেরিয়েছিল।

এই বৎসর সুরাপান মুসলমানদের জন্য অবৈধ ঘোষিত হয়। এ সম্বন্ধে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ

> এ পর্যন্ত মোসলমানগণ সুরাপান করিয়া আসিয়াছেন, অনেকে মদ্য পানে ঘোর মাতাল হইতেন, এবং সুরাপান করা বৈধ বলিয়া জানিতেন। এ বৎসর সুরাপানের অবৈধতা বিষয়ে হযরত মোহম্মদ প্রত্যাদেশ লাভ করেন। হযরতের আদেশক্রমে মদিনার পথে ঘাটে বাজারে এইরূপ ঘোষণা করা হয়, "লোক-সকল, জানিবে এইক্ষণ হইতে সুরা পান অবৈধ হইয়াছে।" সেই মুহূর্তে যাহারা মদ্য পান করিতেছিল, তৎক্ষণাৎ একেবারে সকলে পানপাত্র হইতে হাত উঠাইয়া লইল, অনেকে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিল। যে যে গৃহে সুরা ছিল সমুদায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। বাজারে ও পথে জলস্রোতের ন্যায় সুরার স্রোত চলিল। মদ্য শয়তানের জল কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক ধর্মনাশক গুরুতর পাপের প্রবর্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। হায়, তদানীন্তন

মোসলমানদিগের কোমল সরল বিশ্বাস ও হযরতের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। যখন তিনি সুরা পান নিষিদ্ধ ও পাপ বলিলেন, তৎক্ষণাৎ চিরকালের অভ্যস্ত সুরা পান তাহারা একেবারে পরিত্যাগ করিল। এইক্ষণ শত শত সুরা-পান নিবারণী সভা, আচার্য্য ও উপাচার্য্যের এবং বড় বড় বক্তাদিগের উপদেশ ও বক্তৃতা প্রায় কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইয়াও বিশেষ ফল দর্শিতেছে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এরপর হযরত কয়েক মাস মদিনায় অবস্থান করে সিরিয়ার নিকটবর্তী দুমাতুল জন্দল অভিযান করেন (পঞ্চম হিজরীতে)। সেখানে কয়েকটি দস্যুদল লুঠতরাজ করছিল, তারা মুসলমান সৈন্য-দের আগমনে যুদ্ধ না করে পালিয়ে যায়।

বিবি যয়নাবের বিবাহ

এই বৎসর হযরত বিবি যয়নাবকে বিবাহ করেন। যয়নাব ছিলেন তাঁর ফুফুর কন্যা, রূপলাবণ্যবতী, হযরতের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে এমন আশা তিনি অন্তরে পোষণ করতেন। কিন্তু হযরত তাঁর বিবাহ দেন তাঁর পালিত পুত্র দাসত্বমুক্ত যায়েদের সঙ্গে। এই বিবাহ সুখের হয় নি। কাজেই কালে কালে যায়েদ যয়নাবকে তালাক দেন। তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত তাঁকে বিবাহ করেন। হযরতের এই বহু-আলোচিত বিবাহ সম্বন্ধে আমরাও পরে কিছু আলোচনা করব।

পরিখার যুদ্ধ

এই বৎসর শাওয়াল চান্দ্র মাসে ঘটে বিখ্যাত পরিখার যুদ্ধ —এর অন্য নাম উপজাতিবৃন্দের যুদ্ধ, কেন না কোরেশদের সঙ্গে বহু উপজাতি এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল।

সাল্লাম বিন আবুল হুকায়েক, হুয়াঈ বিন আখতাব, প্রমুখ নাযির গোত্রের ইহুদী নেতারা মক্কায় গিয়ে কোরেশদের আহ্বান জানায় তাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে মোহম্মদকে আক্রমণ করতে, যেন

তার হাত থেকে তারা নিস্তার পেতে পারে। কোরেশ তাদের বলে, হে ইহুদীগণ ঃ তোমরাই হচ্ছ আদি গ্রন্থধারী, আর মোহম্মদের সঙ্গে আমাদের বিরোধের প্রকৃতি সম্বন্ধেও তোমরা অবগত আছ, বল আমাদের ধর্ম ভাল, না, তার ধর্ম ভাল। ইহুদী নেতারা উত্তর দেয় ঃ নিঃসন্দেহ তোমাদের ধর্ম মোহম্মদের ধর্মের চাইতে ভাল আর তোমাদের পথই বেশি ঠিক। + এইসব কথা শুনে কোরেশরা খুব খুশি হলো আর হযরতের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে তৎপর হলো। তারপর এই ইহুদী দল গেল গতফান গোত্রের কাছে, আর বল্লে ঃ কোরেশ তাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজি হয়েছে। ফলে গতফানও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। আর গতফানের সঙ্গে যোগ ছিল বনি আসদ, বনি সলিম, বনি সা-আদ প্রভৃতি গোত্রের। মোট প্রায় দশ হাজার সৈন্য আবুসুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনা আক্রমণ করতে যাত্রা করল—তাদের মধ্যে অশ্বারোহী ছিল তিনশত আর উষ্ট্রারোহী ছিল পনেরো শত।

এই বিরাট সৈন্যদলের অভিযানের কথা হযরতের কর্ণগোচর হলো। এত শীগগির এত বড় একটা আক্রমণের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর পারশ্যদেশীয় ভক্ত সালমানের পরামর্শে—ইনি ইসলাম গ্রহণ করেন হযরতের মদিনায় আগমনের পরই—হযরত তাঁর অনুবর্তীদের নিয়ে মদিনা প্রায় বেষ্টন করে একটি পরিখা-খননের কার্যে ব্যাপৃত হলেন। মদিনার পিছনে ছিল সাল্‌আ পর্বত, সেদিক বাদ দিয়ে প্রায় ছয় হাজার হাত লম্বা একটি পরিখা মুসলমানরা খনন করেন। (মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য)। এই পরিখা খননের কাজে কপটরা স্বতঃই শিথিলতা দেখিয়েছিল। কিন্তু যাঁরা ছিলেন

+ দ্রষ্টব্য: কোরআন: তুমি কি তাদের দেখ নাই যাদের গ্রন্থের এক অংশ দেওয়া হয়েছে? তারা বিশ্বাস করে প্রতিমায় ও মিথ্যা দেবতাদের, আর যারা অবিশ্বাসী তাদের বলে: এরা বেশি ঠিক পথে আছে যারা বিশ্বাসী (মুসলমান) তাদের চাইতে। (৪:৫১)

হযরতের প্রকৃত অনুবর্তী তাঁদের আন্তরিক শ্রমের ফলে এই দীর্ঘ পরিখা খনন সুসম্পন্ন হয়। হযরত নিজে এই খনন-কার্যে যোগদান করেন। পারসিক সালমান বলেছেন: আমি গাঁইতি হাতে খোদাইয়ের কাজে ব্যাপৃত ছিলাম। একটি পাথর আমার জন্য খুব বড় বাধা হলো। হযরত কাছেই ছিলেন—তিনি দেখছিলেন আমার মেহনত। তিনি খাদে নেমে আমার হাত থেকে গাঁইতি নিয়ে এমন কোপ মারলেন যে গাঁইতির নিচে আগুন জ্বলে উঠলো। এমন ঘটলো দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার। আমি বল্লাম: হে পিতামাতার চাইতে প্রিয়তর, আপনার গাঁইতির আঘাতের নিচেকার এমন আলোকের অর্থ কি? তিনি বল্লেন: সাল্মান, তুমি তাহলে সত্যই তা দেখেছ? প্রথম আলোকছটার অর্থ আল্লাহ্ আমার জন্য ইয়েমেন রাজ্য খুলে দিয়েছেন, দ্বিতীয় আলোকছটার অর্থ সিরিয়া ও পশ্চিম অঞ্চল খুলে দিয়েছেন, আর তৃতীয় আলোকছটার অর্থ পূর্ব অঞ্চল খুলে দিয়েছেন।

পরিখা খননের কাজ শেষ হলে কোরেশ ও তাদের মিত্ররা দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনার অদূরে ছাউনি গাড়লো। মুসলমান দলে ছিল তিন হাজার সৈন্য, তারা ছিল পরিখার এপারে আর নারীদের ও শিশুদের রাখা হলো দুর্গগুলিতে।

কুখ্যাত হুয়াই বিন আখতাব এলো কোরেযা গোত্রের ইহুদীদের নেতা কাব বিন্ আসাদের সঙ্গে কথা বলতে। কা'ব বিন আসাদ হযরতের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। হুয়াইয়ের আগমনের সংবাদ শুনে কা'ব তার দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল, বল্লে: হুয়াইকে দেখলে অশুভ ঘটে; বল্লে: হযরতের সঙ্গে যে সন্ধি সে করেছে তা ভঙ্গ করতে পারে না, কেন না হযরতকে সে সব সময়েই পেয়েছে বিশ্বস্ত। শেষে বহু অনুনয়ে বিনয়ে সে হুয়াইকে ভিতরে আসতে দিল। হুয়াই তাকে বোঝালো কেমন করে কোরেশ ও গতফান ও অন্যান্য দলের সঙ্গে তার খুব নির্ভরযোগ্য চুক্তি হয়েছে যে মোহম্মদ ও তার দলবলকে

নিঃশেষ না করে তারা ফিরবে না। হুয়াইয়ের অনুনয়ে ও যুক্তিতর্কে শেষ পর্যন্ত কা'ব হযরতের সঙ্গে তার সন্ধি ভঙ্গ করলো।

সংবাদ পেয়ে হযরত আউস ও খাযরাজ গোত্রের নেতাদের কা'ব-এর কাছে পাঠালেন। তাঁরা এসে দেখলেন অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। ইহুদীরা হযরতের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে বল্লে: আল্লাহ্‌র রসুল কে? মোহম্মদের সঙ্গে আমাদের কোনো সন্ধি বা চুক্তি হয় নি। তাঁরা ফিরে গিয়ে সব কথা হযরতকে বল্লেন। হযরত বল্লেন: আল্লাহু আকবর—আল্লাহ্ মহত্তম, আনন্দিত হও হে মুসলমানগণ।

অবস্থা প্রকৃতই সঙ্গীন হয়ে উঠল। মদিনার মুসলমানদের কারো কারো মনে সংশয় দেখা দিল। একজন বল্লে: আমাদের বাড়ীগুলো মদিনার বাইরে অরক্ষিত জায়গায়, আমাদের বাড়ীতে ফিরে যাবার অনুমতি দিন।

কোরেশ-দলের ও মুসলমানদের এইভাবে কাটলো বিশ দিনেরও বেশি—প্রায় এক মাস। মাঝে মাঝে তীর নিক্ষেপ ভিন্ন যুদ্ধের আর কোনো লক্ষণ দেখা দিল না। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে হযরত এক সময়ে গতফানদের কাছে প্রস্তাব করতে চাইলেন যে মদিনার উৎপন্ন খেজুরের তিন ভাগের এক ভাগ তিনি তাদের দেবেন, এই শর্তে যে তারা আক্রমণ ত্যাগ করবে। কিন্তু আউস ও খাযরাজ গোত্রের সা'দ বিন মোয়ায আর সা'দ বিন্ উবাদা হযরতের কাছে জানতে চাইলেন এই প্রস্তাব তিনি করছেন আল্লাহ্‌র হুকুমে অথবা নিজের থেকে। হযরত বল্লেন: নিজের থেকেই তিনি এই প্রস্তাব করছেন, শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য। সা'দ বিন মোয়ায বল্লেন: আমরা যখন বহুদেববাদী ছিলাম তখন এরা আমাদের কাছ থেকে একটি খেজুরও পায় নি অতিথিরূপে ভিন্ন অথবা না কিনে। আর এখন আল্লাহ্ আমাদের সম্মানিত করেছেন ইসলাম দিয়ে আর আপনাকে দিয়ে—আর এখন আমরা আমাদের

সম্পত্তি দেব তাদের? আমরা তাদের তলোয়ার ভিন্ন কিছুই দেব না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করেন। হযরত বল্লেন: তাই হবে।

শেষে কোরেশ দলের বিখ্যাত যোদ্ধা আম্‌র্ বিন আবদু উদ্দ্, ইকরামা বিন আবু জেহেল, প্রভৃতি কয়েকজন ঘোড়া চালিয়ে পরিখার পাশে এসে থামলো। তারা বলে উঠলো: এমন ফন্দি আরবরা কখনো অবলম্বন করে নি।

পরিখার একটি কম-প্রশস্ত জায়গায় তারা তাদের ঘোড়ায় চাবুক লাগান যেন ঘোড়া তা ডিঙিয়ে যায়। এদের মধ্যে আমর ছিল অতি খ্যাতনামা যোদ্ধা। বদরে সে যুদ্ধ করে' আহত হয়েছিল, ওহোদে সে যোগ দেয় নি। এই পরিখার যুদ্ধে সে তার মর্যাদানুযায়ী পোষাক পরে মুসলমান পক্ষের যে কেউকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করলো।

তার আহ্বান শুনে বর্ম-পরিহিত আলী তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য হযরতের অনুমতি চাইলেন। হযরত তাঁকে বসে থাকতে বল্লেন কেন না যুদ্ধে আহ্বান করেছিল আমর। আমর পুনরায় আহ্বান জানালো এই শ্লেষ উচ্চরণ করে: কোথায় তোমাদের সেই বাগান যারা যুদ্ধে হারে তারা যেখানে যায়। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কাউকে কি পাঠাতে পারো না? আলী পুনরায় হযরতের অনুমতি চাইলেন, আর পুনরায় হযরত তাঁকে বল্লেন বসে থাকতে। তৃতীয়বার আমর আহ্বান জানালো এই বলে:

ডাকতে ডাকতে আমার গলা গেল ভেঙে,
কেউ কি তোমাদের দলে আছে যে আমার আহ্‌বানে সাড়া দেবে?
আমি এখানে দাঁড়িয়েছি রণপ্রার্থী যোদ্ধারূপে,
কিন্তু দেখছি তথাকথিত সাহসীরা ভীরু।
আমি সব সময় সামনে গিয়ে হাজির হয়েছি—যুদ্ধ আরম্ভ হবার পুর্ব্বে;
সাহস আর উদারতা সত্যই যোদ্ধার সেরা গুণ।

আলী তার সঙ্গে যদ্ধে হযরতের অনুমতি চাইলেন—হোকনা সে. আমর। হযরত তাঁকে যেতে দিলেন। আলী বলতে বলতে অগ্রসর হল্যেন:

ব্যস্ত হয়ো না। কোনো কমহিম্মতওয়ালা
আসে নি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে।
এসেছে সংকল্পবান ও দৃষ্টিমান লোক।
সফলকামের আশ্রয় সত্য।

আমর তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, আর পরিচয় পেয়ে বল্লে : ভাই-পো, তোমার কোনো চাচাকে পাঠাও যে তোমার চাইতে বয়সে বড়, আমি তোমার রক্তপাত করতে চাই না। আলী উত্তর দিলেন : আমি চাই। আমর্ তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তার তলোয়ার তুললো—তলোয়ার আগুনের মতো দীপ্তি পাচ্ছিল। আলী বল্লেন : আমি কেমন করে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি যখন তুমি আছ ঘোড়ার পিঠে; নেমে সমভূমিতে দাঁড়াও। আমর্ ঘোড়া থেকে নেমে আলীর দিকে অগ্রসর হলো। আলী তার ঢাল নিয়ে এগোলেন। আমর্ আলীকে যে আঘাত করলে তা আলীর ঢালে কেটে বসলো আর তাতে তাঁর মাথায়ও আঘাত লাগলো, কিন্তু আলীর আঘাত লাগলো আম্‌রের গর্দানে, তাতে সে মাটিতে পড়ে গেল। ধুলা উড়ল—আর হযরত শুনলেন আল্লাহু আকবর ধ্বনি; বুঝলেন আলী আমরকে নিহত করেছেন। যখন আলী হাসিমুখে হযরতের কাছে ফিরে এলেন তখন ওমর জিজ্ঞাসা করলেন আমরের বর্মটি খুলে নেওয়া হয়েছে কি না, কেন না সেই বর্ম ছিল আরবদের মধ্যে সেরা বর্ম। তাতে আলী উত্তর দিলেন : আমি যখন তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম তখন সে উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল, আমি লজ্জায় তার বর্ম খুলি নি, তাছাড়া সে আমার রক্ত-পাত করতে চায় নি, কেন না আমার পিতা ছিলেন তার একজন বন্ধু।

আম্‌রের দশা দেখে ইকরিমা তার বল্লম ফেলে পালিয়ে যায়।

সাদ বিন মোয়ায সেদিন পরেছিলেন একটি খাটো বর্ম—এত খাটো যে তাঁর হাতের সামনের অংশ অনাবৃত ছিল। বিপক্ষের একটি তীর এসে তাঁর হাতে বিদ্ধ হয়। তাঁর কথা পরে আসবে।

• একটি বিবরণে পাওয়া যায় হযরতের সভাকবি হাস্‌সান সেদিন সাহসের পরিচয় দেন নি আদৌ।

হযরতের ও তাঁর অনুবর্তীদের দিন কাটছিল খুব উৎকণ্ঠায়। এ সম্বন্ধে কোরআনে বলা হয়েছে :

"আর যখন তারা এসে পড়েছিল তোমাদের উপর থেকে আর তোমাদের নিচে থেকে আর যখন চোখগুলো হয়েছিল দিশাহারা আর হৃদয়গুলো হয়েছিল কণ্ঠাগত আর তোমরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে বৃথা চিন্তা পোষণ করছিলে।

সেখানে বিশ্বাসীরা পরীক্ষিত হয়েছিল, আর তারা আন্দোলিত হয়েছিল কঠিন আন্দোলনে।

আর যখন কপটরা আর যাদের হৃদয়ে আছে ব্যাধি তারা বলতে আরম্ভ করেছিল ঃ আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল আমাদের (বিজয়ের) প্রতিশ্রুতি দেয়নি কেবল প্রতারণা করার জন্য ভিন্ন ; আর যখন তাদের একটি দল বলেছিল : ওহে ইয়াস্‌রিবের লোকেরা তোমাদের জন্য (এখানে) দাঁড়াবার জায়গা নেই, সেজন্য ফিরে যাও ; আর তাদের একদল পয়গাম্বরের অনুমতি চেয়েছিল এই বলে : নিঃসন্দেহ আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত। আর তারা অরক্ষিত ছিল না, তারা কেবল পালাতে চাচ্ছিল।

আর যদি শত্রু সব দিক থেকে এসে পড়তো আর তাদের বলতো বিশ্বাসঘাতকতা করতে তবে তারা তা করতো, আর তাতে ইতস্ততঃ করতো সামান্য সময়ই। (৩৩ঃ ১০—১৪)"

এই সময়ে গতফান গোত্রের নুয়াইম বিন্ মাস্‌উদ হযরতের কাছে এসে বল্লে, সে মুসলমান হয়েছে, কিন্তু তার লোকেরা তা জানে না, হযরত যদি তাকে কোনো আদেশ করেন তবে তা সে সম্পন্ন করবে। হযরত বল্লেন : তুমি আমাদের বহুজনের মধ্যে একজন, সেজন্য গিয়ে শত্রুদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে অবিশ্বাস সৃষ্টি করো যদি তা সম্ভবপর হয়, যাতে তারা আমাদের থেকে ফিরে যায়—যুদ্ধ তো ছলনা। এর পর নুয়াইম গেল বনি কোরেযার কাছে। সে যখন বহুদেববাদী ছিল তখন তাদের সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল। সে গিয়ে তাদের মধ্যেকার সেই প্রীতির বন্ধনের

কথা বললো। যখন তারা বল্লে যে তাকে তারা সন্দেহ করে না— তখন সে বল্লেঃ তোমরা এখানকার লোক, স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি নিয়ে এখানেই বসবাস করছ, এ জায়গা ছেড়ে তোমরা অন্য কোথাও যেতে পারো না, কিন্তু কোরেশ ও গতফান বিদেশী, তাদের স্ত্রীরা, সন্তানরা কেউই তোমাদের মতো এখানে থাকে না, তারা এসেছে মোহম্মদ ও তার দলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। যদি তাদের কোনো সুবিধা ঘটে তবে তার পুরো সদ্ব্যবহার তারা করবে, কিন্তু যদি মন্দ কিছু ঘটে তবে তোমাদের ফেলে তারা দেশে চলে যাবে। তখন মোহম্মদের সঙ্গে তোমরা একা পেরে উঠবে না। সেজন্য তাদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ কোরো না যে পর্যন্ত না তাদের কয়েকজন প্রধানকে তারা তোমাদের কাছে জামিন রাখে— মোহম্মদকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত। ইহুদীরা বল্লেঃ এ উত্তম পরামর্শ।

তারপর সে কোরেশদের কাছে গিয়ে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গের লোকদের বল্লেঃ তোমাদের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ তা তোমরা জানো আর জানো আমি মোহম্মদকে ত্যাগ করে এসেছি। কিন্তু আমি এমন কিছু কথা শুনেছি তোমাদের সাবধান করার জন্য যা বলা আমি কর্তব্য মনে করি, কিন্তু বিষয়টি গোপন রাখতে হবে। তারা তাতে স্বীকৃত হলে সে বল্লেঃ আমার কথাগুলো ভাল করে' লক্ষ্য করো; ইহুদীরা মোহম্মদকে বলে' পাঠিয়েছে যে, তারা যে তার বিরুদ্ধে গিয়েছিল সেজন্য তারা অনুতপ্ত, তারা আরও বলে' পাঠিয়েছে, যদি বলো তবে কোরেশ ও গতফানদের কিছু সংখ্যক প্রধানকে ধরে' তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই তুমি তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করো, তারপর আমরা তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারবো তাদের অবশিষ্ট লোকদের নিঃশেষ করতে। মোহম্মদ তাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে সেজন্য ইহুদীরা যদি তোমাদের কাছে কয়েকজনকে জামিন চায় তবে কাউকে পাঠাবে না।

তারপর সে গেল গতফানদের কাছে, গিয়ে বল্লেঃ তোমরা আমার আপনার লোক, আমার পরিজন, আমি মনে করি না তোমরা আমাকে

সন্দেহ করতে পারে। তারা স্বীকার করলে সে সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তখন সে গতফানদের বল্লে যা সে বলেছিল কোরেশদের।

আক্রমণে বিলম্ব হচ্ছে দেখে আবুসুফিয়ান ও গতফান-প্রধানরা ইক্‌রিমা ও আরো কয়েকজনকে দিয়ে বনি কোরেযাকে বলে পাঠালো, তাদের কোনো স্থায়ী ছাউনি নেই, অনেক ঘোড়া উট মরে যাচ্ছে, সেজন্য আর বিলম্ব না করে বনি কোরেযার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই যেন তারা মোহম্মদকে চিরদিনের মতো খতম করতে পারে। বনি কোরেযা বল্লেঃ আজ সাব্বাথের দিন, এই দিনে তারা কিছুই করতে পারে না, এই দিনের নিয়ম ভঙ্গ করে' তাদের পূর্বপুরুষের কি হয়েছিল তা সবাই জানে; তারা আরো জানালোঃ আমরা তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মোহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের কয়েকজনকে আমাদের কাছে জামিন রাখো মোহম্মদকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত, কেননা যুদ্ধ যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যায় তাহলে তোমরা তোমাদের দেশে চলে যাবে আর আমাদের ফেলে যাবে মোহম্মদের কাছে যার সঙ্গে আমরা একা পেরে উঠবো না। দূতরা যখন বনি কোরেযার এই জবাব নিয়ে এলো তখন কোরেশ ও গতফান বুঝলো নুয়াইমের কথা ঠিক; তারা বনি কোরেযাকে বলে পাঠালোঃ তারা বনি কোরেযার কাছে কাউকে জামিন রাখবে না, যদি তারা যুদ্ধ করতে চায় তবে তারা এসে যুদ্ধ করুক। তাদের এই উত্তর শুনে বনি কোরেযা বুঝলো নুয়াইমের কথাই ঠিক; তারা বলে পাঠালো জামিন না রাখলে তারা মোহম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না।—যখন সম্মিলিত উপদল ও বনি কোরেযার মধ্যে এমন অবিশ্বাস দেখা দিল তখন শুরু হলো এক বিষম তুষার-ঝড়, সেই তুষার-ঝড়ে কোরেশ গতফান প্রভৃতির ছাউনি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তাদের রান্নার হাঁড়িকুঁড়ি হয় ভেঙে গেল, নয় কাদায় ভর্তি হল।

হযরত যখন জানতে পারলেন আক্রমণকারী দলদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তখন তিনি হুযায়ফা বিন্ আল্‌-ইয়ামানকে পাঠালেন

শত্রুসৈন্যরা সেই রাত্রিকালে কি করছে তা দেখতে, কিন্তু নিজের থেকে আর কিছু না করতে। হুযায়ফা গিয়ে দেখলেন আবু্ সুফিয়ান বলছেঃ কোরেশরা, আমরা তো পাকা ছাউনিতে নই, আমাদের ঘোড়া আর উটগুলো মরছে, বনি কোরেযা তাদের কথার খেলাপ করেছে, তাদের সম্বন্ধে অনেক অশান্তিকর সংবাদ আমাদের কানে আসছে; দেখছ ঝড় কি ভাবে বইছে, তাতে আমাদের হাঁড়িকুঁড়ি, আগুনের ব্যবস্থা, তাঁবু, সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে; এখন চলে যাওয়া যাক—আমি যাচ্ছি। তার উট এক পা ভাঁজ করে' বাঁধা অবস্থায় শুয়ে ছিল, সে গিয়ে তার উপরে চড়লো, উটের বাঁধা পা খুলে গেল যখন সে পুরোপুরি তার পাগুলোর উপরে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। হুযায়ফা বলেছেনঃ রসুল যদি আমাকে আর কিছু করতে নিষেধ না করতেন তবে ইচ্ছা করলে আমি একটি তীর মেরে আবু্ সুফিয়ানের দফা শেষ করতে পারতাম। কোরেশদের চলে যাবার সংবাদ শুনে গতফানও তাদের তাঁবু উঠিয়ে দেশে চলে গেল। ভোরে রসুল আর মুসলমানেরা পরিখা থেকে মদিনায় ফিরে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র রাখলেন।

বনি কোরেযার বিরুদ্ধে অভিযান

ইব্নে ইসহাকে আছেঃ দুপুরের নামাযের সময়ে জিব্রিল হযরতের কাছে এল—জিব্রিলের মাথায় ছিল কারুখচিত পাগড়ি, সে আরোহণ করেছিল একটি খচ্চরে, তার জিন ছিল কিংখাবে মোড়া। সে এসে জিজ্ঞাসা করলে, রসুল যুদ্ধ ত্যাগ করেছেন কি না। যখন হযরত বললেন হাঁ তিনি ত্যাগ করেছেন, তখন জিব্রিল বল্লেঃ ফেরেশতারা এখনও তাদের অস্ত্র ত্যাগ করে নি, হে মোহম্মদ, আল্লাহ্ আপনাকে আদেশ করেছেন বনি কোরেযার বিরুদ্ধে অভিযান করতে, আমি যাচ্ছি তাদের দুর্গমূল নাড়িয়ে দিতে।

রসুল আদেশ করলেনঃ কেউ আসরের (বিকালের) নামায পড়বে না বনি কোরেযার ওখানে না গিয়ে। আলী আগে আগে চললেন নিশান হাতে। তিনি শুনলেন কোরেযার লোকেরা হযরতকে গালাগালি করছে। তিনি হযরতের কাছে ফিরে এসে সে কথা বললেন। হযরত

বল্লেন ঃ আমাকে দেখলে তারা এভাবে কথা বলবে না। তাদের দুর্গের নিকটবর্তী হয়ে হযরত বল্লেন ঃ ওহে মর্কটের ভাইরা, আল্লাহ্ তো তোমাদের লাঞ্ছিত করেছেন আর তাঁর ক্রোধ তোমাদের উপরে পাতিত করেছেন? তারা বল্লে ঃ হে কাসেমের পিতা, আপনি তো অমার্জিত রুচির লোক নন।

হযরত তাদের অবরোধ করে রাখেন পঁচিশ রাত্রি। শেষে তাদের খুব দুর্দশা দেখা দিল ও তাদের অন্তরে ভয় প্রবেশ করলো।

বনি কোরেযার বিচার

কোরেশ ও গতফান চলে গেলে হুয়াই বিন্ আখতাব এসেছিল বনি কোরেযার দুর্গে, কেন না সেই মর্মের অঙ্গীকার সে বনি কোরেযার কাছে করেছিল। যখন তারা দেখলে রসুল কিছুতেই অবরোধ উঠিয়ে নেবেন না তাদের সম্বন্ধে একটা শেষ ব্যবস্থা না করে' তখন কা'ব বিন্ আসাদ্ তাদের বল্লে ঃ হে ইহুদীগণ, দেখতে পাচ্ছ কি অবস্থা তোমাদের হয়েছে; আমি তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখছি, তার যেটি খুশী নাও। (১) এই লোকটিকে সত্য পয়গাম্বর জ্ঞান করে এসো আমরা তাঁর অনুবর্তী হই, কেন না আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা দেখছ তিনি একজন প্রেরিত পুরুষ, এঁর কথা তোমাদের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তাতে তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পত্তি, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি, সবই রক্ষা পাবে। ইহুদীরা বল্লে ঃ আমরা কখনো তওরাতের বিধান ত্যাগ করে' অন্য বিধান গ্রহণ করব না। কা'ব বিন্ আসাদ বল্লে ঃ যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ না করো তবে (২) এসো আমরা আমাদের স্ত্রীদের আর সন্তানসন্ততি সব হত্যা করি আর পুরুষদের পাঠাই তলোয়ার দিয়ে মোহম্মদ ও তার দলবলের বিরুদ্ধে, তাতে আমাদের কোনো পিছুটান থাকবে না আর আমরা লড়াই করবো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ মীমাংসা করেন আমাদের ও মোহম্মদের মধ্যে, আমরা যদি নিহত হই তবে হলাম, তাহলে আমাদের কোনো সন্তানসন্ততি থাকবে না যাদের জন্য আমাদের দুশ্চিন্তা থাকবে,

আর যদি আমরা জয়ী হই তবে স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি আবার পাব। তারা বললে ঃ এই অসহায় জীবদের আমরা মেরে ফেলবো! জীবনের কি অর্থ থাকবে যখন তারা থাকবে না? সে (কা'ব বিন্ আসাদ) বল্লে ঃ যদি এই প্রস্তাব তোমরা গ্রহণ না করো তবে (৩) আজ সাব্বাথের রাত্রি, সম্ভবতঃ মোহম্মদ আর তার দলবল আমাদের তরফ থেকে কোনো আক্রমণের আশঙ্কা করবে না, কাজেই নেমে পড়, হয়তো মোহম্মদ ও তার দলবলকে এক অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা আমরা বিপন্ন করতে পারব। তারা বল্লে ঃ আমরা কি সাব্বাথের নিয়ম লঙ্ঘন করব, সেই নিয়ম লঙ্ঘন করে যখন আমাদের পূর্ববর্তীরা মর্কটে পরিণত হয়েছিল!

এর পর তারা রসুলের কাছে বলে পাঠালো ঃ আমাদের কাছে আউস গোত্রের আবু লুবাবা বিন্ আবদুল মুন্যিরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। রসুল আবু লুবাবাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারা তাকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো, 'স্ত্রীলোকেরা ও ছেলেমেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে এলো—আবু লুবাবার খুব দুঃখ হলো। তারা বল্লে ঃ আবু লুবাবা, মোহম্মদের বিচারের উপরে নির্ভর করা আমাদের জন্য কি ভাল মনে করো? সে বল্লে ঃ হাঁ, এই বলে হাত দিয়ে গলার দিকে ইঙ্গিত করলে—তার অর্থ, গলা কাটা যাবে। কিন্তু এই কথা বলেই আবু লুবাবা বুঝলো সে আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারপর সে তাদের রেখে হযরতের কাছে না গিয়ে মসজিদের থামের সঙ্গে নিজেকে বাঁধলো আর বল্লে ঃ আমি এই স্থান ত্যাগ করব না যে পর্যন্ত না আমি যা করেছি আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেন।

হযরত তার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন; তার বিষয় জেনে তিনি বল্লেন ঃ যদি সে আমার কাছে আসতো তবে তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতাম, কিন্তু যা সে করেছে তার পর ঐ স্থান আমি তাকে ত্যাগ করতে দেব না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন। প্রভাতে আল্লাহ্র তরফ থেকে তার মার্জনার সংবাদ আসে।

প্রভাতে বনি কোরেযা হযরতের বিচারের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। তখন আউস গোত্রের লোকেরা বল্লে ঃ হে আল্লাহ্‌র রসুল, এরা আমাদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ, খাযরাজদের সঙ্গে নয়, আর আপনি জানেন খাযরাজের মিত্রদের প্রতি কিছু দিন আগে আপনি কিরূপ ব্যবহার করেছেন। (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের অনুরোধে বনি কাইনুকার মুক্তি-দানের কথা তারা স্মরণ করিয়ে দিলে)। তিনি বল্লেন ঃ হে আউস গোত্রের লোকেরা, তোমাদেরই একজন যদি বিচার করে তাহলে তো তোমরা সন্তুষ্ট হবে? তারা তাতে স্বীকৃত হলে হযরত বল্লেন ঃ সা'দ বিন্ মোয়ায হচ্ছেন সেই বিচারক।

পরিখার যুদ্ধে সা'দ বিন্ মোয়াযের তীরবিদ্ধ হওয়ার কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। তাঁর শুশ্রূষার স্থান থেকে এক খচ্চরে চড়িয়ে তাঁর লোকেরা তাঁকে হযরতের কাছে এনে বল্লেঃ তোমার মিত্রদের প্রতি সদয়তা দেখাবে রসুল সেজন্যই তোমাকে বিচারক নির্ব্বাচিত করেছেন। তাদের অনুনয়ে সা'দ বল্লেন ঃ সময় এসেছে যখন সা'দ আল্লাহ্‌র কাজে মানুষের নিন্দার কথা ভাববে না।

যখন সা'দ রসুল ও মুসলমানদের কাছে এলেন রসুল তাদের আদেশ করলেন দাঁড়িয়ে তাদের নেতার প্রতি সম্মান দেখাতে। সবাই সম্মান দেখিয়ে বল্লে ঃ হে আমরের পিতা, নবী তোমার উপরে ভার দিয়েছেন তোমার মিত্রদের সম্বন্ধে। সা'দ বল্লেন, তোমরা তো আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করেছ যে আমি যে-রায় দেব তা তোমরা মেনে নেবে? তারা বল্লে ঃ হ্যাঁ। এর পর সা'দ বল্লেন, আর সেই রায় তো মেনে নেবেন যিনি এখানে উপস্থিত আছেন—হযরতের দিকে তাকিয়ে সা'দ এই কথা বল্লেন; সম্ভ্রমহেতু তাঁর নাম উচ্চারণ করলেন না। রসুল বল্লেন ঃ হাঁ। তখন সা'দ বল্লেন ঃ তবে আমি এই রায় দিচ্ছি ঃ তাদের পুরুষরা নিহত হবে, আর তাদের স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের বন্দী করা হবে।

রসুল সা'দকে বল্লেন ঃ আল্লাহ সাত আসমানের উপরে যে রায় দিয়েছেন তুমি সেই রায় দিয়েছ।

তারা আত্মসমর্পণ করলে হযরত তাদের বন্দী অবস্থায় রাখলেন আল্ হারিসের কন্যার গৃহে। ইবনে ইসহাকে উক্ত হয়েছে ঃ কোরেযা গোত্রের ছয় শত থেকে সাত শত অথবা আট শত থেকে নয় শত লোক নিহত হয়েছিল—তাদের মধ্যে ছিল হুয়াই বিন্ আখতাব আর কা'ব বিন্ আসাদ।

বনি কোরেযার ঘটনা মোস্তফা-চরিতে কিছু ভিন্ন ভাবে বিবৃত হয়েছে ; নুয়াইমের দৌত্যকে লেখক অবিশ্বাস্য ভেবেছেন, আর দেখাতে চেষ্টা করেছেন নিহতদের সংখ্যা বিশ্বস্ত হাদিসের মতে তিনশত জনের বেশি ছিল না, আর কোরেযা গোত্রের অনেক ইহুদীকে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নুয়াইমের দৌত্যকে মোস্তফা-চরিত-কার যে অবিশ্বাস্য বিবেচনা করেছেন তাঁর সেই বিচার তেমন মজবুত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, কেন না আক্রমণকারী উপজাতিদের দল থেকে কেউ কেউ যে গোপনে মদিনায় প্রবেশ করেছিল তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। যুদ্ধ ছলনা বৈ নয়, হযরতে আরোপিত এই উক্তি নির্ভরযোগ্য কি না সে সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। তাছাড়া বনি কোরেযার প্রতি দণ্ড সম্বন্ধে আরো কিছু বিষয় আছে, সে সম্বন্ধেও আমরা যথাস্থানে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

অনেক ইহুদী তাদের প্রতি এই দণ্ড অবিচলিভাবে গ্রহণ করেছিল। আল্যাবির নামক এক ইহুদী-প্রধানের এই কাহিনী ইবনে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে। বহুদেববাদিতার কালে আল্যাবির সাবিত বিন্ কায়েসএর প্রাণ রক্ষা করেছিল। সাবিত যাবিরকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে বল্লেঃ আমি তোমার সেই পুরানো উপকারের প্রতিদান দিতে চাই। যাবির বল্লেঃ মহৎ মহতের প্রতিদান দেয়। সাবিত হযরতের কাছে গিয়ে সব কথা বলে যাবিরের কাছে ফিরে এসে বল্লেঃ হযরত তাকে প্রাণভিক্ষা দিয়েছেন। যাবির বল্লেঃ পরিজন ও সন্তানসন্ততি ভিন্ন একজন বুড়ো মানুষের জীবন দিয়ে কি কাজ হতে পারে। সাবিত পুনরায় হযরতের কাছে গেল, হযরত বল্লেনঃ যাবিরকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের ফিরিয়ে

দেওয়া হবে। সে-কথা যাবিরকে বলা হলে সে বল্লেঃ হেজাযে একটি পরিবারের কেমন করে চলতে পারে সম্পত্তি ভিন্ন। সাবিত এসে যাবিরকে জানালে হযরত তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। তখন যাবির জানতে চাইল কা'ব বিন্ আসাদ, হুয়াঈ বিন্ আখতাব, আয্যাল বিন্ সামাওআল প্রভৃতি ইহুদী-প্রধানদের কি হয়েছে। সাবিত জানালো তারা সবাই নিহত হয়েছে। তখন যাবির বল্লেঃ হে সাবিত, তোমার উপরে আমার যে দাবি আছে তা মেটাবার জন্য আমাকে আমার স্বজনদের সঙ্গে মিলিয়ে দাও, কেন না তারা যখন নেই তখন জীবনের আর কোনো আনন্দ নেই, আর এক মুহূর্ত দেরিও আমার সহ্য হচ্ছে না। —সাবিত তার মুণ্ডচ্ছেদ করে।

সাবিত বিন্ কায়েসের এই কবিতা ইবনে ইস্হাকে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

আমার দায়িত্ব নির্বাহ করেছি, আমি হীনতা দেখাইনি
ও অবিচলিত ছিলাম,
যখন অন্যেরা নিষ্ঠার পথ থেকে স্খলিত হয়েছিল।
অন্য যে কোনো লোকের চাইতে যাবিরের দাবি
আমার উপরে ছিল প্রবলতর;
যখন তার দুই হাতের কব্জি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল,
তখন রসুলের কাছে আমি গিয়েছিলাম যেন
তাকে মুক্ত করতে পারি।
রসুল আমাদের জন্য ছিলেন দয়ার সমুদ্র।

ইব্নে ইসহাকের মতে বনি কোরেযার কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোককে নেজ্দে বিক্রয় করে' ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়েছিল।

রায়হানা নাম্নী এক ইহুদী রমণীকে হযরত গ্রহণ করেন তাঁর দাসীরূপে—রায়হানা দাসীরূপে থাকাই ভাল বিবেচনা করেছিল কেন না সে ইহুদী-ধর্ম আঁকড়ে ছিল। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে।

ইহুদী-প্রধান সাল্লাম বিন্ আবুল হুকায়েকও পরিখার যুদ্ধে এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ওহোদ-যুদ্ধের পূর্বে আউস গোত্রের

লোকেরা কা'ব বিন্ আল্-আশ্‌রাফকে হত্যা করে হযরতের ও মুসলমানদের প্রতি তার শত্রুতার জন্য। সাল্লাম বিন্ আবুল হুকায়েককে হত্যা করার ভার খাযরাজ গোত্রের লোকেরা নেয় একান্ত আগ্রহে কেন না এই দুই গোত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতো হযরতকে খুশি করা নিয়ে। সাললাম বিন্ আবুল হুকায়েক ছিল খয়বরে। খাযরাজ গোত্রের লোকেরা সেখানে গিয়ে তাকে হত্যা করে।

আম্‌র বিন্ আল্-আসের ও খালেদের ইসলাম গ্রহণ

পরিখার যুদ্ধ থেকে ফিরে কোরেশবীর আম্‌র বিন্ আল্-আস কিছুসংখ্যক কোরেশকে সংগ্রহ করে বলে: আমার মনে হয় মোহম্মদের এই ব্যাপার বহুদূর পর্যন্ত গড়াবে, কাজেই আমার যা মত সে সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা তা জানতে চাই। আমি মনে করি আমাদের নাজ্জাশির কাছে গিয়ে সেখানে থাকা উচিত। যদি মোহম্মদ আমাদের জাতিকে জয় করে তবে আমরা নাজ্জাশির সঙ্গে থাকব, কেন না মোহম্মদের অধীনতা স্বীকার করার চাইতে তার অধীনতা স্বীকার আমরা ভাল মনে করি, আর যদি আমাদের লোকেরা জয়ী হয় তবে তারা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে। তারা আমার প্রস্তাব ভাল মনে করলে আর নাজ্জাশিকে উপহার দেবার জন্য আমরা অনেকগুলো চামড়া সংগ্রহ করে সেসব নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম।

আমরা যখন নাজ্জাশির কাছে গেলাম তখন সেখানে আসে আম্‌র বিন উমাইয়া আল্ যাম্‌রি, তাকে রসুল পাঠিয়েছিলেন জাফর ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে। নাজ্জাশির সঙ্গে কথা বলে যখন সে বেরিয়ে এলো তখন আমি আমার লোকদের বল্লাম যে নাজ্জাশির সঙ্গে দেখা হলে আমি তাঁকে বলব আম্‌র বিন্ উমাইয়াকে আমাদের হাতে দিতে যেন আমরা তার মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারি, এতে কোরেশরা দেখবে যে আমরা তাদের জন্য একটা বড় কাজ করেছি মোহম্মদের প্রেরিত লোকদের হত্যা করে'। এর পর আমি নাজ্জাশির কাছে গিয়ে সম্মান জানালাম। তিনি

আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন আমার দেশ থেকে কিছু এনেছি কি না। আমি যখন তাঁকে বল্লাম দেশ থেকে অনেকগুলো চামড়া আমি এনেছি তখন তিনি খুব খুশি হলেন। তারপর আমি তাঁকে বল্লামঃ মহারাজ, এইমাত্র একজন লোককে আপনার এখান থেকে চলে যেতে দেখলাম, সে আমাদের শত্রুর দূত, তাই তাকে আমাদের হাতে দিন যেন আমি তাকে হত্যা করতে পারি কেন না সে আমাদের অনেক প্রধানকে মেরে ফেলেছে। এতে নাজ্জাশি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। আমি তখন বল্লামঃ আমার অনুরোধে মহারাজ এত ক্রুদ্ধ হবেন জানলে আমি কখনো এমন অনুরোধ করতাম না। এর পর নাজ্জাশি হযরতের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। ইব্‌নে ইসহাকে আছে নাজ্জাশির হাতেই আমর্‌ বিন্‌ আল্‌-আস্‌ হযরতের প্রতি ও ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে।

এর পর আম্‌র বিন্‌ আল্‌-আস্‌ ইসলাম গ্রহণের জন্য হযরতের সঙ্গে দেখা করতে যাত্রা করে, আর খালেদ বিন্‌ আল্‌ ওয়ালিদের সঙ্গে মিলিত হয় মক্কা-বিজয়ের কিছু পূর্বে। খালেদ তাকে বলেঃ হযরত নিশ্চয়ই পয়গাম্বর, আর আল্লাহ্‌র শপথ, আমি মুসলমান হতে যাচ্ছি—আর কত দেরি করব। আম্‌র্‌ বিন্‌ আল্‌-আস্‌ও তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। তারপর দুইজন মদিনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

তৃতীয় খণ্ড

বিজয়

–

প্রথম পরিচ্ছেদ

বানু মোস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযান

বনি কোরেযার ঘটনার ছয় মাস পরে হযরত বনি লিহ্‌য়ানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন আল্‌রাজির হত্যাকাণ্ডের প্রতিফল দানের জন্য। তিনি অতর্কিতে আক্রমণের সংকল্প করেছিলেন এবং সেইভাবে অগ্রসরও হয়েছিলেন। কিন্তু বনি লিহ্‌য়ান টের পায়, আর সতর্কতা অবলম্বন ক'রে পাহাড়ের উপরে স্থান গ্রহণ করে।

হযরত মদিনায় ফিরে আসেন।

ষষ্ঠ হিজরীতে শাবান মাসে হযরত বানু মোস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযান করেন—তার পূর্বে তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন বানু মোস্তালিক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযানের চেষ্টা করছে। এমন সংবাদ পেয়ে হযরত বানু মোস্তালিকের আল্-মুরায়সি-র জলাশয় পর্যন্ত যান। সেখানে বানু মোস্তালিকের সঙ্গে যুদ্ধ হয়—তাদের কিছুসংখ্যক লোক নিহত হয় আর তাদের স্ত্রীরা সন্তানসন্ততি ও সম্পত্তি মুসলমানদের হস্তগত হয়। এখানে পানী ভরা নিয়ে আনসার ও মোহাজীরদের মধ্যে মনোমালিন্য হয় ও তা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। এতে আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাইয়ের মেজাজ খুব গরম হয়ে যায়, সে বলে ঃ দেখছি মোহাজীররা উপরহাত হতে চায়, কথায় আছে ঃ কুকুরকে খাওয়ালে সে তোমাকে খাবে ; আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা যখন মদিনায় যাব তখন যারা প্রবল তারা দুর্বলদের হাঁকিয়ে দেবে। শুনে ওমর বলেন ঃ এখনই তার মুণ্ডপাত করা উচিত। কিন্তু হযরত বলেন ঃ লোকেরা যখন বলবে মোহম্মদ তার আপন সঙ্গীদের হত্যা করে তখন কেমন শোনাবে ? আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই অবশ্য হযরতের

কাছে গিয়ে শপথ ক'রে বলে এমন কথা সে বলেনি। আনসারদের কেউ কেউ আবদুল্লাহ বিন্ উবাইয়ের অপরাধ লঘু করার চেষ্টা করে।

হযরত মদিনায় পৌছলে আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ও কয়েকজন কপট সম্বন্ধে আয়াত অবতীর্ণ হয়। শুনে আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাইয়ের পুত্র এসে হযরতকে বলে, আদেশ করলে সে তার পিতার শিরশ্ছেদ করবে, কেননা আর কেউ তার শিরশ্ছেদ করলে সে তা সইতে পারবে না আর একজন বিশ্বাসীকে হত্যা করে পাপী হবে। হযরত বলেন: তার প্রয়োজন নেই; তার পরিবর্তে বরং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা যাক। এর পর আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাইয়ের নিজের লোকেরাই আর তার তেমন অনুগত থাকলো না। লোকদের এমন পরিবর্তিত মনোভাব লক্ষ্য করে' হযরত ওমরকে বল্লেন: হে ওমর, সেদিন তোমার কথামতো আমি যদি আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাইকে হত্যা করতাম তবে তার প্রধানদের ক্রোধ বেড়ে যেত; কিন্তু আজ যদি তাদের বলি তাকে হত্যা করতে, তবে তা তারা করবে। ওমর উত্তর দেন: আমি জানি হযরতের আদেশ আমার আদেশের চাইতে কল্যাণময়।

বানু মোস্তালিকের যারা বন্দী হয়েছিল তাদের মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এই বন্দীদের মধ্যে একজন ছিলেন জুয়ায়রিয়া—বানু মোস্তালিকের প্রধান আল্-হারিসের কন্যা। এই জুয়ায়রিয়া যার হাতে পড়েছিলেন সে তাঁর জন্য উঁচু মুক্তিপণ নির্ধারিত করেছিল। জুয়ায়রিয়া দেখতে ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। হযরত আয়েশা বলেছেন: আমার দরজায় তাকে দেখে আমি তার প্রতি খুব বিতৃষ্ণা বোধ করলাম। জুয়ায়রিয়া হযরতের কাছে তাঁর উঁচু মুক্তিপণের কথা নিবেদন করলেন ও হযরতের সাহায্য চাইলেন। হযরত বলেন: এর চাইতে ভাল কিছু পেলে তোমার পছন্দ হবে? তিনি তাঁর মুক্তিপণ দিয়ে দেন ও জুয়ায়রিয়ার সম্মতিক্রমে তাঁকে বিবাহ করেন।—এ সম্বন্ধে কিছু ভিন্ন বিবরণ মোস্তফা-চরিতে দ্রষ্টব্য।

জুয়ায়রিয়ার সঙ্গে হযরতের বিবাহের একটি খুব ভাল ফল ফলেছিল।

জুয়ায়রিয়াকে হযরত বিবাহ করেছেন ও এইভাবে মোস্তালিক গোত্র তাঁর শ্বশুরকুল হয়েছে, এই কথা রাষ্ট্র হলে লোকেরা তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দিল। এই বিবাহের ফলে একশত পরিবার মুক্ত হয়। হযরত আয়েশা বলেছেন : আমি আর কোনো স্ত্রীলোকের কথা জানি না যে তার স্বজাতির জন্য এমন কল্যাণের কারণ হতে পেরেছে।

হযরত আয়েশা সম্বন্ধে কুৎসা রটনা

এই বান্থ মোস্তালিক-অভিযান থেকে মদিনায় ফিরে কিছুসংখ্যক লোক হযরত আয়েশার নামে দুর্নাম রটায়। সে-সম্বন্ধে হযরত আয়েশা বলেছেন :

বান্থ মোস্তালিক-অভিযানে হযরত তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে থেকে আমাকে সঙ্গে নেন। ফিরবার সময় হযরত মদিনার কাছে এসে রাত্রির কিছু অংশ বিশ্রাম করেন, তারপর তিনি লোকদের যাত্রা করতে আদেশ দেন। আমি বাইরে গিয়েছিলাম, তখন আমার গলার হার খুলে পড়ে যায়। বাইরে থেকে এসে যখন আমি উটের কাছে এলাম তখন গলায় হাত দিয়ে দেখলাম হার নেই। ফিরে গিয়ে হারটি পেলাম, কিন্তু যখন ফিরে এলাম তখন দেখি সবাই চলে গেছে। (হযরত আয়েশা ছিলেন খুব হাল্কা গড়নের; ফলে তাঁর হাওদা যখন লোকেরা উটের উপরে তুলেছিল তখন তারা ভেবেছিল তিনি হাওদার মধ্যেই আছেন।) হযরত আয়েশা বলেছেন : আমি একটি চাদর মুড়ি দিয়ে সেখানে শুয়ে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম তারা যখন দেখবে আমি হাওদায় নেই তখন তারা এসে আমাকে নিয়ে যাবে। আমি শুয়ে পড়েছি এমন সময় সাফওয়ান্ বিন্ আল্ মুআত্তাল সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সে আমার আকৃতি দেখে আমাকে চিন্‌লো এবং বিস্ময়ে বলে উঠলো : হযরতের সোয়ারী এখানে! সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো : এমন ঘটলো কেমন করে? কিন্তু আমি তার সঙ্গে কথা বললাম না। তার পর সে তার উট নিয়ে এসে আমাকে তাতে চড়তে বললো। সে আমাকে নিয়ে ভোরে মদিনায়

এলো। তখন মিথ্যুকরা আমার নামে কুৎসা রটিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমি কিছুই জানতাম না। মদিনায় এসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। এই কাহিনী হযরতের কাছে ও আমার পিতামাতার কাছে পৌঁছেছিল, কিন্তু তাঁরা কেউই আমাকে কিছু বল্লেন না যদিও হযরতের অভ্যস্ত সদয়তার অভাব অনুভব করলাম। এর পূর্বে আমি যখন অসুস্থ হয়েছি তখন তিনি আমার প্রতি করুণা দেখাতেন, কিন্তু এবারকার এই অসুখে তার অভাব বোধ করলাম। এবার যখন তিনি আমাকে দেখতে আসতেন তখন আমার মাকে আমার শুশ্রূষা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করতেন ঃ কেমন আছে। এতে আমি মর্মাহত হলাম। আর মাকে বল্লাম ঃ আমাকে নিয়ে যেতে। হযরত বল্লেন ঃ যা তোমার ইচ্ছা। এইভাবে আমাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। বিশ দিনে আমি রোগমুক্ত হলাম, কিন্তু ততদিন আমি এই কুৎসা সম্বন্ধে কিছুই জানি নি। এর পরে আমি আমার এক প্রতিবেশিনীর মুখে এই কথা শুনলাম। আমি আমার কান্নার বেগ রোধ করতে পারলাম না, মনে হলো আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি আমার মায়ের কাছে জানতে চাইলাম লোকদের এই কুৎসা রটনার কথা তিনি আমাকে জানান নি কেন। মা বল্লেন ঃ খুকী, এ নিয়ে মন খারাপ করো না, যে মেয়ে সুন্দরী আর তার স্বামী তাকে ভালবাসে তার সতীনরা আর লোকেরা তার নামে এমন মিথ্যা অপবাদ রটায়।

এই রটনাকারীদের মধ্যে প্রধান ছিল আবদুল্লাহ্ বিন উবাই আর হযরতের পত্নী যয়নাবের ভগিনী হামনা, কেন না, হযরতের সমাদর লাভের ক্ষেত্রে বিবি যয়নাব ছিলেন বিবি আয়েশার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কিন্তু বিবি যয়নাব এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। হামনা তার বোনের স্বার্থের কথা ভেবে এই কুৎসা খুব রটিয়েছিল।

এ সম্বন্ধে হযরত লোকদের বলেন ঃ লোকেরা কেন আমাকে দুঃখ দিচ্ছে আমার পরিজনের নামে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে ? আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তাঁদের ভাল ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারি না, আর তারা এমন

একজন লোক সম্বন্ধে অপবাদ দিচ্ছে যার সম্বন্ধে ভাল বৈ মন্দ আমি জানি না, যে আমার গৃহে প্রবেশ করে না আমার সঙ্গে ভিন্ন। হযরতের এই কথায় আউস-গোত্রের একজন বল্লেঃ যদি রটনাকারীরা আউস-গোত্রের হয় তবে আমরা তাদেব নিঃশেষ করব, আর যদি তারা খাযরাজ-গোত্রের হয় তবে হুকুম দিন, তাদের মুণ্ডচ্ছেদ হওয়া চাই। এতে খাযরাজ গোত্রের একজন চটে গেল। দুই দলের লোক পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বললো, তাদের মধ্যে মারামারি বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। হযরত তাদের ছেড়ে আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আলী আর উসামা বিন্ যায়েদকে ডেকে পরামর্শ চাইলেন। উসামা আমার সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করলে, বল্লেঃ এঁরা আপনার পরিজন, আপনি এবং আমরা এঁদের সম্বন্ধে ভাল ভিন্ন আর কিছুই জানি না—এ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আলী বল্লেনঃ মেয়েলোক যথেষ্ট আছে, আপনি একজনকে বাদ দিয়ে স্বচ্ছন্দে অন্য জনকে গ্রহণ করতে পারেন, বাড়ীর দাসীকে জিজ্ঞাসা করুন সে ঠিক কথা বলবে। হযরত দাসী বুরাইরাকে ডাকালেন। আলী তাকে খুব প্রহার দিয়ে বল্লেনঃ রসুলকে ঠিক কথা বলবি। সে বল্লেঃ আমি তার সম্বন্ধে ভাল ভিন্ন আর কিছু জানি না, আমি আয়েশার এই দোষ জানি যে যখন আমি ময়দা মাখি আর তাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে বলি তখন সে তাতে মন না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, আর ভেড়াটা এসে তা খেয়ে যায়।

এর পর হযরত আমার কাছে এলেন। আমার পিতামাতা ও একজন আনসার রমণী আমার কাছে ছিলেন, আর আমরা দুজনই কাঁদছিলাম। হযরত বসলেন, আর আল্লাহ্র প্রশংসা কীর্তন ক'রে বল্লেনঃ আয়েশা, তুমি জান লোকেরা তোমার সম্বন্ধে কি বলছে; আল্লাহ্র ভয় কর আর যদি অন্যায় করে থাক, যেমন লোকেরা বলছে, তবে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও কেন না আল্লাহ্ তাঁর দাসদের কাছে থেকে অনুতাপ গ্রহণ করেন। হযরত যখন এই কথা বলছিলেন, তখন আমার চোখের পানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমি অপেক্ষা করছিলাম আমার বাপ মা রসুলের কথার উত্তর দেবেন, কিন্তু তাঁরা কিছুই বল্লেন না। আল্লাহর

শপথ, আমার সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোনো বাণী পাঠাবেন, যা মসজিদে পঠিত হবে, নামাযে ব্যবহৃত হবে, আমি নিজেকে তার সম্পূর্ণ অযোগ্য জ্ঞান করেছিলাম, তবে আমি আশা করছিলাম হযরত স্বপ্নে এমন কিছু দেখবেন যার ফলে আল্লাহ্ এই মিথ্যা থেকে আমাকে মুক্ত করবেন কেন না তিনি জানেন আমি নির্দোষ। অথবা ভাবছিলাম এ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ আসবে। কিন্তু কোরআনের কোনো আয়াত আমার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হবে আমি নিজেকে নিতান্তই তার অযোগ্য জ্ঞান করেছিলাম। যখন দেখলাম আমার পিতামাতা কিছু বল্লেন না তখন আমি তাঁদের তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা বল্লেনঃ কি বলবেন তা তাঁরা জানেন না, আর আল্লাহ্‌র শপথ, সেই সময়ে আবু বকরের পরিবারকে যে দুঃখ সহ্য করতে হয়েছিল আর কোনো পরিবারকে তেমন দুঃখ সহ্য করতে হয় নি। তাঁরা যখন নীরব রইলেন, তখন আবার আমি কেঁদে ফেললাম আর বল্লামঃ আপনি যার কথা বলছেন সেজন্য আমি কখনো আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইব না; আল্লাহর শপথ, আমি জানি আমি নির্দোষ, তাই আমি যদি দোষ স্বীকার করি, যেমন লোকেরা বলছে, তবে আমি স্বীকার করব যা সত্য নয় তাই, আর আপনারা যা বলছেন তা যদি আমি অস্বীকার করি তবে আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। হযরত ইয়াকুবের নাম আমার মনে পড়ছিল না, সেজন্য আমি বল্লামঃ আমি বলবো হযরত ইউসুফের পিতা যেমন বলেছিলেনঃ আমার কর্তব্য হচ্ছে যোগ্যভাবে ধৈর্য অবলম্বন করা আর তোমরা যা বলছ তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া।

আর আল্লাহ্‌র শপথ, হযরত যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে স্থান পরিবর্তনের পূর্বে তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসে পড়ল যা আসত, আর তাঁকে তাঁর পোষাক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল, আর একটি চামড়ার তাকিয়া তাঁর মাথার নীচে দেওয়া হল। আর যখন আমি এই দেখলাম তখন আমার কোনো ভয় হলো না কেন না আমি জানতাম আমি নির্দোষ, আল্লাহ্ আমার প্রতি অকরুণ হবেন না। হযরত যখন জেগে উঠলেন তখন

দেখলাম আমার পিতামাতার যেন মরণাপন্ন দশা এই ভয়ে যে লোকেরা যা বলছে পাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাই সত্য বলে ঘোষিত হয়। হযরত সম্বিৎ লাভ করে উঠে বসলেন আর যেন শীতের দিনে তাঁর গা থেকে পানীর বিন্দু ঝরছিল, কপাল মুছে ফেলতে ফেলতে তিনি বল্লেন ঃ আয়েশা, সুসংবাদ, আল্লাহ্‌ তোমার নির্দোষতা সম্বন্ধে বাণী অবতীর্ণ করেছেন। আমি বল্লাম ঃ আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আর তিনি বাইরে গেলেন যে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন লোকদের তাই জানাতে। তিনি আদেশ দিলেন ঃ মিস্‌তা বিন্‌ উসাসা আর হাস্‌সান বিন্‌ সাবিৎ আর জহশের কন্যা হাম্‌না এদের নির্দিষ্ট সংখ্যক বেত মারা হবে, কেন না এরাই নিন্দা রটনায় মুখর হয়েছিল।

হযরত আয়েশা সম্বন্ধে এইসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল ঃ

নিঃসন্দেহ যারা কুৎসা রটিয়েছিল তারা তোমাদের মধ্যেকার একটি দল। এটিকে তোমাদের জন্য মন্দ কিছু ভেবো না, না, এটি তোমাদের জন্য ভালো। তাদের প্রত্যেক লোককে দেওয়া হবে (এই) পাপের যা সে অর্জন করেছে, আর তাদের মধ্যে যার অংশ বেশি ছিল তার হবে এক বড় শাস্তি। কেন বিশ্বাসী পুরুষরা আর বিশ্বাসিনী নারীরা—যখন তোমরা এ শুনেছিলে—তখনই কেন তাদের নিজেদের লোকদের সম্বন্ধে ভালো চিন্তা মনে স্থান দেয় নি, আর বলে নি ঃ এ এক স্পষ্ট মিথ্যা? কেন তারা এর জন্য চারজন সাক্ষী আনে নি? কিন্তু যেহেতু তারা সাক্ষী আনে নি সেজন্য আল্লাহ্‌র সামনে তারা মিথ্যাবাদী।

আর যদি তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের জন্য না হোত, আর ইহলোকে ও পরলোকে তাঁর করুণার জন্য, তবে এক বড় শাস্তি নিশ্চয় তোমাদের স্পর্শ কোরত তোমরা যে বিষয়ে গুঞ্জন তুলেছিল সেইজন্য।

যখন তোমরা জিহ্‌বার দ্বারা গ্রহণ করেছিলে আর তোমরা মুখে বলেছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা এটি

গণ্য করেছিলে এক সহজ ব্যাপার বলে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

আর যখন তোমরা এটি শুনেছিলে তখন কেন তোমরা বলনি ঃ এ আমাদের জন্য উচিত নয় যে এ বিষয়ে আমরা আলাপ করি : তোমার মহিমা কীর্তিত হোক—এটি এক মহা কুৎসা ?

আল্লাহ্‌ তোমাদের সতর্ক করছেন যে তোমরা এর মতো ব্যাপারে ফিরে যাবে না কখনও যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৪ ঃ ১১—১৭)

যখন হযরত আয়েশা সম্বন্ধে ও তাঁর কুৎসাকারীদের সম্বন্ধে এই বাণী অবতীর্ণ হল তখন আবু বকর তাঁর দুঃস্থ স্বজন মিস্‌তা সম্বন্ধে বল্লেন ঃ আয়েশার বিরুদ্ধে এমন নিন্দা রটনার পরে আর আমাদের প্রতি এমন অহিত করার পরে আমি মিস্‌তাকে আর কখনো কিছু দেব না ; তখন অবতীর্ণ হয় এই বাণী ঃ

আর তোমাদের মধ্যে যারা স্বাচ্ছন্দ্যের আর প্রাচুর্যের অধিকারী তারা আত্মীয়দের, নিঃস্বদের, আর যারা আল্লাহ্‌র পথে গৃহত্যাগ করেছে তাদের দান করার বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ না করুক, আর তারা ক্ষমা করুক আর ফিরুক। তোমরা কি ভালোবাস না যে আল্লাহ্‌ তোমাদের ক্ষমা করবেন ? আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

(২৪ ঃ ২২)

এই আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবু বকর বল্লেন ঃ হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি চাই আল্লাহ্‌ আমাকে ক্ষমা করুন। এর পর মিস্‌তাকে তিনি সাহায্য দিতে থাকেন। তিনি বলতেন ঃ আমি কখনো তাকে এই সাহায্য বন্ধ করব না।

হাস্‌সানের সঙ্গে যখন সাফ্‌ওয়ানের দেখা হয় তখন সাফওয়ান হাস্‌সানকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে এই বলে ঃ

তোমাকে দিচ্ছি এই আমার তলোয়ারের ধার ! যখন আমার মতো লোককে তুমি কলমের খোঁচা দাও তখন তার পরিবর্তে কবিতা পাবে না।

সাফওয়ানকে কয়েকজন ধরে ফেলে। এর পর হযরতের কাছে হাস্‌সান ও সাফওয়ানের তলব পড়ে। হযরত তাদের বিবাদ মিটিয়ে দেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুদায়বিয়ার সন্ধি

রমযান ও শাওয়াল মদিনায় কাটিয়ে যুলকাদা মাসে হযরত হজ করার অভিপ্রায়ে যাত্রা করলেন। পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রদের তিনি ডাকালেন। সবাই যে তাঁর ডাকে সাড়া দিল তা নয়, তবে কিছু সংখ্যক আরব আর আনসার ও মোহাজীর তাঁর সঙ্গী হলো। কোরবানির পশু নিয়ে হজের পোষাক পরে তাঁরা যাত্রা করলেন, কাজেই তিনি যে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করছেন না তা সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। সাত শ অনুচর সঙ্গে নিয়ে—মতান্তরে চৌদ্দ শ অনুচর সঙ্গে নিয়ে—হযরত হজযাত্রা করেছিলেন।

উস্‌ফানে পৌঁছে হযরত জানতে পারলেন তাঁকে বাধা দেবার জন্য কোরেশ চিতাবাঘের চামড়া প'রে দুগ্ধবতী উষ্ট্রীদের নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তাদের এমন প্রবল সংকল্পের কথা জানতে পেরে হযরত বল্লেন: হায়, যুদ্ধ কোরেশদের গিলে খেয়েছে, কি ক্ষতি তাদের হতো যদি তারা আমাকে ও অন্যান্য আরবদের হজ করতে বাধা না দিত····· আল্লাহ্‌র শপথ, আমি আমার ব্রতের জন্য সংগ্রাম থেকে বিরত হবো না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ আমাকে বিজয় দেন অথবা আমার মৃত্যু ঘটে। তার পর তিনি বল্লেন: তাদের পাশ কাটিয়ে কে আমাকে নিয়ে যেতে পারে? আস্‌লাম নামে এক ব্যক্তি এক বন্ধুর ও দুর্গম পথে মুসলমানদের চালিয়ে নিয়ে গেল। মক্কার অদূরবর্তী হুদায়বিয়ায় পৌঁছে মুসলমানেরা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। সেখানে এসে হযরতের উট বসে প'ড়েছিল। তাতে হযরত বল্লেন: উট ইচ্ছা করে বসে প'ড়েনি, যিনি (আবরাহা-র) হাতীকে মক্কা থেকে রোধ করেছিলেন তিনিই একে রোধ করেছেন। আজ কোরেশ আত্মীয়তার উল্লেখ করে যে সদয়তা আমাকে দেখাতে বলবে আমি তা দেখাব। তারপর তিনি লোকদের

উট থেকে নামতে বল্লেন। তারা জানালে কাছে কোথাও পানী নেই। তিনি তাঁর তূণ থেকে একটি তীর বার করে তাঁর একজন সঙ্গীকে দিলেন, তিনি এক পানীর গর্তের ভিতরে নেমে তার মধ্যভাগ তীর দিয়ে খোঁচালেন ; তাতে এত পানী উঠলো যে উটগুলো সেই পানী খেয়ে শুয়ে পড়ল।

রসুল যখন বিশ্রাম করছিলেন তখন খুযাআ গোত্রের কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলো বুদেল। হযরত তাকে বল্লেন ঃ তিনি এসেছেন হজ করতে আর কাবা-গৃহের প্রতি সম্মান দেখাতে। তারা গিয়ে কোরেশদের সেকথা বল্লে। কিন্তু কোরেশ হযরতকে ও তাঁর সঙ্গীদের মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দিতে অসম্মত হলো। খুযাআ গোত্রের মুসলমান ও অমুসলমান সবাই ছিল হযরতের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ। তারা মক্কার খবর হযরতের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিল।

কোরেশদের তরফ থেকে হযরতের কাছে এলো মিক্‌রায বিন্ হাফ্‌স্। হযরত বুদেলকে যা বলেছিলেন তাই মিক্‌রাযকে বল্লেন, মিক্‌রায এসে তাই কোরেশদের বল্লে। এর পর কোরেশরা হযরতের কাছে পাঠায় কৃষ্ণসৈন্যদলের নেতা আল্‌হুলাইয়স বিন্ আল্ কামা-কে। সে হযরতের আনা কোরবানির পশুগুলো দেখে হযরত যে হজ করার জন্যই এসেছেন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়, আর গিয়ে কোরেশদের সেই কথা বলে। তারা তাকে বলে ঃ চুপ করে বসে থাকো তুমি তো এক অজ্ঞ বেদুইন। তাতে হুলাইয়া রেগে বল্লে ঃ যে আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতি সম্মান দেখাতে এসেছে তোমরা তাকে তাতে বাধা দেবে ? তোমরা যদি মোহম্মদকে হজ করতে না দাও, যে হজ করার জন্য সে এসেছে, তবে আমি আমার কালো সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে যাবো। কোরেশরা তাকে বল্লে ঃ শান্ত হও হুলাইয়স। যে শর্তে আমরা রাজী হতে পারব সেই শর্ত আমাদের পেতে দাও।

এর পরে তারা হযরতের কাছে পাঠায় উর্‌ওয়া বিন্ মাস্‌উদকে। সে এসে বলে ঃ মোহম্মদ, তুমি কি কতকগুলো লোক সংগ্রহ করে এসেছ

তোমার নিজের লোকদের ধ্বংস করতে? কোরেশরা কঠোর সংকল্প গ্রহণ করেছে যে তুমি যে জোর করে মক্কায় প্রবেশ করবে তা তারা কখনই হতে দেবে না। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তো দেখছি যেসব লোক তুমি সংগ্রহ করেছ তারা কাল তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। এতে হযরত আবু বকর খুব চটে গিয়ে কড়া উত্তর দেন। উর্‌ওয়া হযরতের দাড়িতে হাত দিয়ে কথা বলছিল—এটি ছিল আরব রীতি। কিন্তু হযরতের একজন অনুবর্তী বল্লেঃ রসুলের মুখ থেকে তোমার হাত সরাও যদি হাত হারাতে না চাও। উর্‌ওয়া বল্লেঃ তোমার কথা বড় কড়া। হযরত হাসছিলেন। উর্‌ওয়া জানতে পেলে তাকে অমন কড়া কথা বলেছে তার ভাইয়ের ছেলে আল্‌-মুগিরা। তখন উর্‌ওয়া বল্লেঃ হতভাগা, কালই তো তোকে ধুয়ে মুছে সাফ করেছি।—হযরত উব্‌ওয়াকে বলে দিলেন যেমন তিনি অন্যদের বলেছিলেন যে তিনি যুদ্ধের জন্য আসেন নি। উর্‌ওয়া দেখে গেল হযরতের প্রতি তাঁর অনুবর্তীদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য কি অসাধারণ। সে কোরেশদের কাছে ফিরে গিয়ে বল্লেঃ আমি খোস্‌রোকে কায়সারকে আর নাজ্জাশীকে তাদের রাজত্বে দেখেছি, কিন্তু মোহম্মদের লোকেরা তার প্রতি যেমন রাজসম্মান দেখায় এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমি বুঝেছি তার সঙ্গীরা তাকে কখনো ত্যাগ করবে না। কাজেই যা ভাল বোঝো করো।

বর্ণিত হয়েছে এর পর হযরত মক্কায় কোরেশদের কাছে পাঠান খিরাশ বিন্‌ উমাইয়া আল্‌ খুযাঈকে। কোরেশরা তাঁর উটের পা কেটে দেয়, আর তাঁকে হত্যা করবারও মতলব করছিল, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ সৈন্যরা তাঁকে রক্ষা করে আর তাঁকে হযরতের কাছে ফিরে আসতে দেয়। বর্ণিত হয়েছে, কোরেশরা এর পর ৪০ কি ৫০ জন লোককে পাঠায় হযরতের ছাউনি ঘেরাও করতে আর তাঁর দলের একজনকে ধরে নিয়ে যেতে। কিন্তু মুসলমানরা তাদের ধরে ফেলে ও হযরতের কাছে নিয়ে যায়। হযরত তাদের ক্ষমা করে যেতে দেন। এর পর হযরত ওমরকে আহ্বান করেন শান্তির বাণী নিয়ে মক্কায় যেতে। কিন্তু ওমর বল্লেনঃ মক্কায় এমন

কেউ নেই যারা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে আর কোরেশদের সঙ্গে তাঁর ভাব নেই ; তিনি বল্লেন ঃ কোরেশরা তাঁর চাইতে যাঁকে বেশি পছন্দ করে তাঁকে পাঠান দরকার। তিনি ওসমানের নাম করলেন। হযরত ওসমানকে ডেকে আবু সুফিয়ান ও কোরেশ প্রধানদের কাছে বলে পাঠালেন যে তিনি যুদ্ধের জন্য আসেন নি, তিনি এসেছেন কাবার ঘর প্রদক্ষিণ করতে ও তার প্রতি সম্মান জানাতে।

ওসমানকে মক্কায় নিয়ে যান আবান বিন্ সইদ্ বিন্ আল্-আস্। তারপর তিনি তাঁকে আশ্রয় দেন রসুলের বাণী পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত। ওসমানের যা বলবার ছিল তা শুনে কোরেশরা বল্লে ঃ তুমি যদি কাবা প্রদক্ষিণ করতে চাও তা করতে পারো। তিনি উত্তর দিলেন, তিনি প্রদক্ষিণ করতে পারেন না মোহম্মদের প্রদক্ষিণ না করা পর্যন্ত। কোরেশরা তাঁকে বন্দী করে রাখল। হযরতের ও মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌছলো ওসমানকে মেরে ফেলা হয়েছে।

হযরত যখন শুনলেন ওসমান নিহত হয়েছেন তখন বল্লেন ঃ শত্রুর সঙ্গে লড়াই না করে তাঁরা ফিরে যাবেন না। আর তিনি তাদের আহ্বান করলেন অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে। এই অঙ্গীকারের নাম বায়আত-উর্-রিয্ওয়ান—দিব্য সন্তোষের অঙ্গীকার—একটি গাছের নিচে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। এই অঙ্গীকার ছিল মৃত্যুপণে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার। এর পর হযরত জানতে পেলেন ওসমানের নিহত হবার সংবাদ মিথ্যা।

এর পর কোরেশ হযরতের কাছে পাঠায় সুহাইল বিন্ আম্রকে এই শর্তে সন্ধি করতে যে এই বৎসর তিনি ফিরে যাবেন, যেন কোনো আরব না বলতে পারে যে মোহম্মদ জোর করে' মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পরে সন্ধির শর্ত ঠিক হল ও সেসব লিখে ফেলবার সময় এলো। ত্রস্তপদে ওমর আবু বকরের কাছে গিয়ে বল্লেন ঃ তিনি কি আল্লাহ্র নবী নন্? আমরা কি মুসলমান নই? আর ওরা কি বহুদেববাদী নয়? আবুবকর বল্লেন ঃ হাঁ। তখন ওমর বল্লেন ঃ কেন আমরা তাতে স্বীকৃত হব যা আমাদের ধর্মের জন্য অসম্মানকর?

আবুবকর বল্লেন ঃ তিনি যা বলেন তা ধরে থাকো, কেন না আমি সাক্ষ্য দিই তিনি আল্লাহ্‌র রসুল। ওমর বল্লেন ঃ আমিও সেই সাক্ষ্য দিই। এর পর ওমর গেলেন হযরতের কাছে এবং এইসব প্রশ্নই উত্থাপন করলেন। তাতে হযরত উত্তর দিলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁর রসুল, আমি তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে যাব না আর তিনি আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। ওমর বলতেন ঃ আমি আজও দান-খয়রাত করি, রোযা রাখি, নামায পড়ি, দাসদের মুক্ত করি সেদিন আমি যা করেছিলাম সেইজন্য—যা বলেছিলাম তার ভয়ে—কেন না আমি তখন মনে করেছিলাম যে আমার পরিকল্পনা রসুলের চাইতে ভালো হবে। এর পর হযরত আলীকে আহ্বান করে 'করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে' লিখতে বল্লেন। সুহাইল বল্লে ঃ আমি এ মানি না, (আরবরা আল্লাহ্‌কে রহ্‌মান (করুণাময়) বলতো না) লেখ "হে আল্লাহ্‌ তোমার নামে।" হযরত আলীকে বল্লেন ঃ লেখ, আল্লাহ্‌র রসুল মোহম্মদ ও সুহাইল বিন্‌ আমরের মধ্যে এই সন্ধি হলো। সুহাইল বল্লে ঃ আমি যদি সাক্ষ্য দিতাম যে তুমি আল্লাহ্‌র রসুল তবে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতাম না। লেখো তোমার নিজের নাম আর তোমার পিতার নাম। হযরত বল্লেন ঃ তাই লেখ ঃ এই সন্ধি হল মোহম্মদ বিন্‌ আবদুল্লাহ্‌ ও সুহাইল বিন্‌ আমরের মধ্যে এই মর্মে যে তারা দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ ত্যাগ করবে ও লোকেরা নিরাপদ হয়ে সহজভাবে চলাফেরা করতে পারবে—এই শর্তে যে যদি কেউ মোহম্মদের কাছে আসে তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে তবে মোহম্মদ তাদের কোরেশদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন, আর যদি মোহম্মদের দল থেকে কোরেশদের কাছে কেউ আসে তবে তারা তাকে মোহম্মদের কাছে ফিরিয়ে দেবে না। আমরা পরস্পরের প্রতি শত্রুভাব দেখাব না ; যে চায় সে মোহম্মদের সঙ্গে চুক্তি ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে পারবে, কোরেশদের সঙ্গেও পারবে।—এতটা লেখা হলে খুযাআ লাফিয়ে উঠে বল্লে ঃ আমরা মোহম্মদের সঙ্গে চুক্তিতে ও সন্ধিতে আবদ্ধ আছি, আর বনু বকর লাফিয়ে উঠে বল্লে ঃ আমরা চুক্তিতে ও সন্ধিতে আবদ্ধ

আছি কোরেশদের সঙ্গে। তারা আরো বল্লেঃ তোমাদের এ বৎসর নিশ্চয়ই চলে যেতে হবে, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না, আর সামনের বছরে আমরা তোমাদের জন্য উপায় করে দেব যেন তোমরা দলবল নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে পারো আর সেখানে থাকতে পারো তিন রাত্রি, তোমরা উষ্ট্রারোহীদের অস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারবে আর তলোয়ার রাখবে কোষবদ্ধ করে, এর অতিরিক্ত কিছুই আনতে পারবে না।* যখন হযরত ও সুহাইল এই দলিলরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তখন হঠাৎ সেখানে শৃঙ্খল পায়ে উপস্থিত হল সুহাইলের পুত্র আবু জন্দল, সে পালিয়ে এসেছিল।

হজরত হজ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেজন্য তাঁর অনুবর্তীরা তাঁর সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন যুদ্ধ করার অভিপ্রায় বর্জিত হয়ে। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন এক সন্ধির শর্তে আবদ্ধ হওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে আর এবারকার মতো হজ না করে ফিরে যাওয়া হবে তখন তাঁরা খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। সুহাইল আবু জন্দলকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে মুখে আঘাত করলো আর তার গলায় যে পাত ছিল তা ধরে বল্লে, মোহম্মদ, আমাদের মধ্যে চুক্তি নিষ্পন্ন হয়েছে এই ছোক্‌রাটার তোমার কাছে আসার পূর্বে। হযরত বল্লেনঃ ঠিক কথা বলছ। সে আবু জন্দলকে তার গলার পাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো আর আবু জন্দল চিৎকার করে বলতে লাগলঃ হে মুসলমানেরা, আমাকে কি কাফেরদের (বহুদেববাদীদের) কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তারা আবার আমাকে আমার ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করবে সেইজন্য? তার কথায় মুসলমানদের দুঃখ

* এই দলিল লেখা সম্বন্ধে মোস্তফা-চরিতে আছে: (সুহাইলের কথায়) হযরত বলিলেন: আমি আবদুল্লার পুত্র, ইহাও মিথ্যা নহে। অতএব রছুলুল্লাহ্ কাটিয়া দেওয়া হউক। তখন মুছলমানদিগের মনস্তাপ ও উত্তেজনা ধৈর্যের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, এবং তাঁহারা চারিদিক হইতে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আলী সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, প্রভু! ক্ষমা করিবেন, আমি ঐ শব্দটা কাটিয়া দিতে পারিব না। তখন হযরতের আদেশে আলী ঐ শব্দটা দেখাইয়া দিলে হযরত নিজহস্তে কলম ধরিয়া তাহা কাটিয়া দিলেন।

অত্যন্ত বেড়ে গেল। হযরত বল্লেন: আবু জন্দল, ধৈর্য ধরো আর নিজেকে সংযত কর। আল্লাহ্ তোমার দুঃখ দূর করবেন, আর তোমার মতো যারা অসহায় তাদের অব্যাহতির উপায় করে দেবেন। আমরা তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছি, আর তাতে তারা ও আমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করেছি—আমরা তাদের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারি না। ওমর লাফিয়ে উঠে আবু জন্দলের সঙ্গে যেতে যেতে বল্লেন: ধৈর্য ধরো, এরা শুধু বহুদেবতার উপাসক, এদের একজনের রক্ত কুকুরের রক্ত ভিন্ন কিছু নয়। তিনি তাঁর তলোয়ারের বাঁট এগিয়ে ধরলেন। ওমর বলতেন আমি আশা করেছিলাম আবু জন্দল সেই তলোয়ার নিয়ে তার পিতার মুণ্ডচ্ছেদ করবে; কিন্তু সে তার পিতাকে কিছু বলে নি; আর এইভাবেই ব্যাপারটা শেষ হলো।

দলিল লেখা শেষ করে হযরত মুসলমানদের ও বহুদেববাদীদের তাতে সই দিতে ডাকালেন, যেমন আবু বকর, ওমর, আবদুর রহমান বিন্ আউফ, আবদুল্লাহ বিন্ সুহাইল বিন্ আমর, সাআদ বিন্ আবু ওয়াক্কাস, মাহমুদ বিন্ মাসলামা, মিক্রায বিন্ হাফস্, আর আলী।

সন্ধি হওয়ার পরে হযরত সঙ্গে আনা পশুদের কোরবানি করলেন আর মস্তক মুণ্ডন করলেন। তাঁর সঙ্গীরাও তাই করলেন।

এর পরে হযরত মদিনার দিকে ফিরলেন। মাঝপথে অবতীর্ণ হলো সূরা আল্ ফত্হ্। সেই সূরার কিছু অংশ এই:

নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে বিজয় দিয়েছি—স্পষ্ট বিজয়—

যেন আল্লাহ্ ক্ষমা করতে পারেন তোমার বিগত দিনের দোষত্রুটি ও আগামী দিনের দোষত্রুটি, আর যেন পূর্ণাঙ্গ করতে পারেন তোমার উপরে তাঁর অনুগ্রহ, আর যেন তোমাকে চালিত করতে পারেন সরল পথে—আর যেন আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করতে পারেন এক প্রবল সাহায্য দিয়ে।

তিনি সান্ত্বনা অবতীর্ণ করেছিলেন বিশ্বাসীদের অন্তরে যেন তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে আরো বিশ্বাসের যোগ হতে পারে; আর আকাশের ও পৃথিবীর সব সেনাদল আল্লাহ্র, আর আল্লাহ্ চিরজ্ঞাতা,—জ্ঞানী—(৪৮: ১—৪)।

……নিঃসন্দেহে যারা তোমার কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তারা আল্লাহরই কাছে আনুগত্য স্বীকার করে—আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপরে—সেজন্য যে কেউ (তার-প্রতিজ্ঞা) ভঙ্গ করে সে তা ভঙ্গ করে তার অন্তরাত্মারই অকল্যাণরূপে, আর যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে দেবেন মহাপুরস্কার। (৪৮ঃ ১০)

……যাদের পেছনে রেখে যাওয়া হয়েছিল সেই যাযাবর আরবদের বলো ঃ শীগগিরই তোমাদের ডাকা হবে এক প্রবল জাতির বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর যদি তোমরা অনুগত হও তবে আল্লাহ তোমাদের দেবেন এক উত্তম পুরস্কার, আর যদি তোমরা বিমুখ হও, পূর্বে যেমন বিমুখ হয়েছিলে, তবে আল্লাহ তোমাদের দেবেন কঠিন শাস্তি। (৪৮ ঃ ১৬)

……নিঃসন্দেহ আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন —যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার আনুগত্য স্বীকার করেছিল, আর তিনি (আল্লাহ) জ্ঞাত ছিলেন কি ছিল তাদের অন্তরে, সেজন্য তিনি তাদের উপরে অবতীর্ণ করেছিলেন সান্ত্বনা আর তাদের পুরস্কার দিয়েছিলেন অবিলম্বিত বিজয়—(৪৮ ঃ ১৮)

……আর তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাত তাদের থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন মক্কা-উপত্যকায় তাদের উপরে তোমাদের বিজয় দান করার পরে ; আর আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যা করো সব। (৪৮ঃ২৪)।

……যারা অবিশ্বাসী যখন তারা তাদের অন্তরে পোষণ করলো একগুঁয়েমি—অজ্ঞতার যুগের একগুঁয়েমি—তখন আল্লাহ্ তাঁর সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন তাঁর বাণীবাহক আর বিশ্বাসীদের উপরে, আর তাদের পালন করালেন সীমারক্ষার বাণী, আর এতে তাদের অধিকার ছিল, আর এর যোগ্য তারা ছিল : আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে জানেন।

নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাঁর বাণীবাহকের প্রতি স্বপ্ন সত্য প্রতিপন্ন করেছেন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে তোমরা পবিত্র মসজিদে

প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ মস্তক মুণ্ডন করে' কেউ চুল কেটে, নির্ভয় হয়ে ; কিন্তু তিনি জানেন যা তোমরা জানো না, সেজন্য তার পূর্বে একটি নিকটবর্তী বিজয় তিনি ঘটিয়েছেন।

তিনি তাঁর বাণীবাহককে পাঠিয়েছেন পথনির্দেশসহ আর সত্যধর্মসহ যেন তিনি (আল্লাহ্) একে (এই ধর্মকে) সমগ্র ধর্মের উপরে বিজয়ী করতে পারেন ; আর সাক্ষীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (৪৮ : ২৬—২৮)

হুদায়বিয়াব সন্ধিকে কোরআনে বলা হয়েছে স্পষ্ট বিজয়। ইব্নে ইসহাক বলেছেনঃ এর পূর্বে ইসলাম যেসব বিজয় লাভ করেছিল সেসবের কোনোটি এর চাইতে বড় নয় : তার কারণ, সেসবে লোকেরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল কেবল যুদ্ধ করতে; এবার যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করা হল ; লোকেরা নিরাপত্তায় পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারল, পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারল, আর আলাপ আলোচনা করে' অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করল। এই সন্ধির পূর্বে যত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল এই সন্ধির পরের দুই বৎসরে তার দুই গুণ লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে

হযরত মদিনায় ফিরে এলে তাঁর কাছে আসে আবু বসির উৎবা বিন্ আসিদ—সে মক্কায় বন্দী ছিল। তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য মক্কা থেকে লোক আসে ও হযরতকে সব কথা জানায়। হযরত আবু বসিরকে বলেনঃ এই লোকদের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে তুমি তার কথা জান, আমাদের ধর্মে বিশ্বাসঘাতকতা প্রবেশ করবে এ অশোভন ; তোমার মতো যারা অসহায় আল্লাহ্ তাদের দুঃখ দূর করবেন ও তাদের মুক্তির একটা উপায় করে' দেবেন ; কাজেই তোমার নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে যাও। আবু বসির ফিরে যায়, কিন্তু মদিনা থেকে ছয় সাত মাইল দূরে গিয়ে তার প্রহরীদের একজনকে সুযোগ পেয়ে হত্যা করে। অপর প্রহরী হযরতের কাছে ফিরে আসে ও আবু বসির যা করেছে তা বলে।

আবু বসিরও হযরতের কাছে এসে বলে : আপনি আমাকে তাদের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন তাতে আপনার যা করণীয় তা করা হয়েছে ; আমি নিজেকে রক্ষা করেছি এই বিবেচনায় যে এরা আমাকে ধর্মত্যাগ করতে প্রলুব্ধ করবে অথবা আমার ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ করবে। কিন্তু হযরতের কাছে সে সমর্থন পায় না। এর পর আবু বসির সমুদ্রের ধারের আল্ ইসে যায়।

সেই পথ দিয়ে কোরেশ সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যেত। মক্কায় আর যেসব মুসলমানকে আটক করে রাখা হয়েছিল তারা আবু বসিরের কথা শোনে ও পালিয়ে আল্ ইসে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়। এই ভাবে তাদের সত্তর জনের একটি দল গঠিত হয়—তারা কোরেশদের কাফেলা লুট করতে থাকে ও নানাভাবে তাদের বিব্রত করে' তোলে। কোরেশ হযরতকে অনুরোধ জানায় এই দলকে নিয়ে নিতে। এইভাবে এরা মদিনায় চলে আসে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের শরণার্থিনীদের কথা

উম্ম কুলসুম—উৎবা বিন্ আবু মুআয়িৎ-এর কন্যা—এই সময়ে মদিনায় হযরতের কাছে চলে আসে। তার দুই ভাই উমারা ও আল্ওয়ালিদ এসে হযরতকে বলে : সন্ধির শর্ত অনুসারে তাদের বোনকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু হযরত তাকে ফিরিয়ে দিলেন না। এ সম্বন্ধে তিনি প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন :

হে বিশ্বাসিগণ, যখন বিশ্বাসিনী নারীরা তোমাদের কাছে আসে শরণার্থিনী হয়ে, তবে তাদের পরীক্ষা করো : আল্লাহ্ ভালো জানেন তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ; তার পর যদি বোঝো তারা বিশ্বাসিনী, তবে তাদের অবিশ্বাসীদের কাছে ফিরে পাঠাবে না : এরা তাদের জন্য বৈধ নয়, তারাও তাদের জন্য বৈধ নয় ; আর তাদের দিয়ে দাও যা তারা ব্যয় করেছে ; আর তোমাদের কোনো দোষ হবে না তাদের বিয়ে করায় যখন তোমরা তাদের দেনমোহর দিয়েছ ; অবিশ্বাসিনী নারীদের বিবাহ বন্ধন

মান্য করে চলো না, আর তোমরা তাদের জন্য যা ব্যয় করেছো তা ফেরৎ চাও, আর তারা ফেরৎ চা'ক যা তারা ব্যয় করেছে। এইই আল্লাহ্‌র রায়, তিনি তোমাদের মধ্যে বিচার করেন, আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের (দেনমোহর) কিছু তোমাদের থেকে অবিশ্বাসীদের কাছে চলে গিয়ে থাকে, তারপর তোমাদের সুযোগ আসে, (তবে) যাদের স্ত্রীরা চলে গেছে তাদের দাও যা তারা ব্যয় করেছে, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো যাতে তোমরা বিশ্বাস করো।
(৬০ঃ ১০, ১১)।

খয়বর বিজয় (সপ্তম হিজরি)

ইবনে ইসহাকে আছেঃ হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পরে যুলহিজ্জামাস ও মহরমের কিছু অংশ হযরত মদিনায় কাটান। তারপর তিনি খয়বর অভিযান করেন।

খয়বর অভিযান সম্পর্কে ইবনে ইসহাকে এর বেশি কিছুই নেই। কোরআনের সূরা ফৎহ্-তে উক্ত হয়ঃ মুসলমানদের এক অবিলম্বিত বিজয় দান করা হবে। সেইটি খয়বর বিজয়। কিন্তু 'মোস্তফা—চরিতে' বিস্তৃতভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে ইহুদীরা হযরতের ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছিল, তাদের কেউ কেউ মদিনার মাঠ থেকে মুসলমানদের পশুও অপহরণ করছিল। ইহুদীদের পক্ষে ষড়যন্ত্র করা খুবই স্বাভাবিক ছিল; তবে যত কম সময়ে তারা পরাভূত হল তাতে প্রমাণিত হয় ষড়যন্ত্র কার্যকর করবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। ইহুদীদের সঙ্গে কোনো আপোষ চলতে পারে না এমন একটা সিদ্ধান্তে হযরত উপনীত হয়েছিলেন মনে হয়। তাই তাদের বিরুদ্ধে ত্বরিত ও কার্যকর অভিযান চালাবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।

খয়বর ছিল মদিনা থেকে প্রায় একশত মাইল দূরে। ১৬ শত সৈন্য নিয়ে—তাদের মধ্যে এক শত জন অশ্বারোহী—হযরত যাত্রা করেন ও তিন দিনে খয়বরের উপকণ্ঠে গিয়ে উপস্থিত হন। গতফান ছিল খয়বরের ইহুদীদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ। রসুল খয়বর আক্রমণ

করছেন সংবাদ পেয়ে তারা তাদের সাহায্যে অগ্রসর হয়, কিন্তু একদিনের পথ অতিক্রম করে তাদের কর্ণগোচর হয় তাদের সম্পত্তি ও পরিজন আক্রান্ত হবার জনরব, কাজেই তারা ফিরে যায়, আর মুসলমান সৈন্যেরা পথে কোনো বাধা পায় না। মুসলমান সৈন্যদল রাত্রে খয়বরে উপস্থিত হয়, কিন্তু রাত্রে তারা কোনো তৎপরতা দেখায় না। প্রভাতে গাঁইতি কোদাল নিয়ে যখন লোকেরা খয়বরের দুর্গগুলো থেকে বাইরে চাষের ক্ষেতে এলো তখন মুসলমান সৈন্যদের দেখে তারা ভীত হয়ে বল্লেঃ মোহম্মদ আর তার সৈন্যেরা এসেছে। এই বলে তারা তাদের দুর্গে পালিয়ে গেল।

হযরত একটির পর একটি দুর্গ জয় করে চললেন। প্রথম যে দুর্গ জয় করলেন তার নাম নাইম। সেখানে মুসলমান পক্ষের মাহ্‌মুদ বিন্ মাস্‌লামা বিপক্ষের উপর-থেকে-ফেলা এক পাথরে নিহত হয়। নাইমের পরে পতন হয় আল্‌-কামুস দুর্গের। এখানে যাদের বন্দী করা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন হুয়াই বিন্ আখ্‌তাবের কন্যা সাফিয়া। তাঁর স্বামী কিনানা বিন্ আল্‌-রবি এই যুদ্ধে নিহত হয়। সাফিয়া পরে হযরতের পত্নী হন।

খয়বরে গর্দভের মাংস ভক্ষণ মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ হয়—নিষিদ্ধ না হলে গর্দভ দুষ্প্রাপ্য হবে এই কারণে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, হাঁড়িগুলোতে গর্দভের মাংস টগ্‌বগ্ করে ফুটছিল, এই সংবাদ পৌঁছলে আমরা সেসব ঢেলে ফেলেদিলাম।

ইহুদীদের কতকগুলো দুর্গ ও তাদের কিছু সম্পত্তি হস্তগত করার পরে সময় এলো আল্‌ওয়াতিহ্ আর আল্-সুলালিম এই দুটি অবশিষ্ট দুর্গ দখল করার। হযরত এই দুই দুর্গ দশ রাত্রি অবরোধ করে রাখেন। ইহুদীদের তরফ থেকে বেরিয়ে এলো বিখ্যাত ইহুদী যোদ্ধা মর্‌হব। সে নিজের গৌরব ঘোষণা করে' মুসলমানদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করলে। হযরত জানতে চাইলেন কে তার মোকাবেলা করবে। মোহম্মদ বিন্ মাসলামা বল্লেঃ সে মোকাবেলা করবে, কেন না পূর্ব দিন তার

ভাইকে নিহত করেছিল এই মর্‌হব। রসুল তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পরে মরহব যে আঘাত করে তাতে তার তলোয়ার মোহম্মদ বিন্ মাসলামার ঢালে আট্‌কে যায়। তখন মোহম্মদ বিন্ মাসলামার আঘাতে মর্‌হব নিহত হয়।

মর্‌হবের পরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তার ভাই ইয়াসির। সেও মারা পড়ে।

খয়বরের যুদ্ধে আলী অলৌকিক বীরত্ব দেখিয়েছিলেন—এই মর্মের বিবৃতি আছে ইবনে ইসহাকে ও অন্যান্য ইতিহাসে।

আল্-কামুস দুর্গের পতনের পরে সাফিয়া ও অন্য একজন স্ত্রীলোককে হযরতের কাছে নিয়ে আসে বেলাল—ইহুদীরা যে পথে নিহত হয়ে পড়ে ছিল সেই পথ দিয়ে। তাতে সাফিয়ার সঙ্গের স্ত্রীলোকটি আর্তনাদ করে নিজের মাথায় ধূলি ছিটায়। হযরত বলেন ঃ হে বেলাল, তোমার কি কোনো দয়ামায়া নেই যে তুমি এই দুইজন স্ত্রীলোককে তাদের স্বামীরা যেখানে নিহত হয়ে পড়ে আছে সেই পথে আনলে? কথিত আছে ঃ সাফিয়া এর পূর্বে স্বপ্নে দেখেছিলেন যেন চাঁদ তাঁর কোলে খসে পড়েছে। তাঁর স্বামীকে তিনি এই স্বপ্নের কথা বলেন। তাতে তাঁর স্বামী তাঁকে বলে ঃ তুমি তো মনে মনে কামনা করছ হেজাজের রাজা মোহম্মদকে, এই বলে সে তাঁর মুখে জোরে এক আঘাত করে। তাতে সাফিয়ার চোখে কালিবর্ণ দেখা দেয়। সাফিয়া যখন হযরতের কাছে আনীত হলেন তখনও এই চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। হযরত জিজ্ঞাসা করলে সাফিয়া উপ-রোক্ত ঘটনা বিবৃত করেন।

ইবনে ইস্‌হাকে বর্ণিত হয়েছে ঃ নাযির গোত্রের ধনসম্পদ ছিল কিনানা বিন্ আল্-রবি-র হেফাজতে। কিন্তু হযরত যখন সেকথা তার কাছে জিজ্ঞাসা করেন তখন সে তা অস্বীকার করে। একজন ইহুদী হযরতকে সংবাদ দেয় একটি পোড়ো জায়গায় কিনানাকে সে রোজ ভোরে ঘুরতে দেখেছে। সেখানে খুঁড়ে কিছু ধন পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ধন কোথায় সে সম্বন্ধে কিনানাকে জিজ্ঞাসা করলে কিনানা বলে সে জানে না।

হযরত নাকি তখন আদেশ দেন যন্ত্রণা দিয়ে তার কাছ থেকে কথা বার করতে। 'মোস্তাফা-চরিতে' প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে এই কাহিনী অবিশ্বাস্য। কিনানা মৃত্যুদণ্ড লাভ করে দুর্গগুলির অবরোধের সূচনায় মাহমুদকে পাথর ফেলে মারার অপরাধে।

শেষে খয়বরের সবাই হযরতের কাছে আত্মসমর্পণ করল এই শর্তে যে তারা তাদের সমস্ত সম্পত্তির অধিকার তাঁকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু তাদের প্রাণে রক্ষা করা হবে আর তাদের চলে যেতে দেওয়া হবে। এইসব শর্তে আত্মসমর্পণ করে তারা হযরতকে বল্লেঃ তাদের চাষাবাদ করতে দেওয়া হোক কেন না তারা কৃষিকাজ ভাল জানে, ফসলের অর্ধেক পেলেই তারা সন্তুষ্ট হবে। রসুল এই শর্তে তাদের নিয়োগ করতে রাজী হন। কিন্তু সেই সঙ্গে ঠিক হয় ইচ্ছা করলে তিনি তাদের বহিষ্কার করতে পারবেন। ফাদাকের লোকের সঙ্গেও এই চুক্তি হল। এর ফলে খয়বর হল মুসলমান সাধারণের সম্পত্তি আর ফাদাক হল হযরতের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেন না ঘোড়া ও উট ধাওয়া করে' তা অধিকার করা হয় নি।

খয়বরে কিছু দিন বিশ্রাম করার পরে হযরত নিমন্ত্রিত হন সাল্লাম্ বিন্ মিস্কামের পত্নী ও আল্ হারিসের কন্যা যয়নাবের দ্বারা। সে তাঁর জন্য একটি ভেড়ার বাচ্চা রান্না করলে আর হযরত কোন্ জায়গার মাংস খেতে ভালবাসেন তা জেনে নিয়ে তাতে খুব বিষ মেশালে—অবশ্য সমস্ত মাংসেই সে বিষ মিশিয়েছিল। হযরত অল্প একটু মুখে দিয়ে চিবোলেন কিন্তু গলাধঃকরণ করলেন না, থুথু করে ফেলে দিলেন (মতান্তরে তিনি অল্প অংশ গলাধঃকরণ করেছিলেন)। হযরত বলে উঠলেনঃ এই হাড় আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে এটি বিষাক্ত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিশর্ বিন্ আল্-বরা খেতে বসেছিলেন, তিনি কিছু অংশ গলাধঃকরণ করেছিলেন। হযরত যয়নাবকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন সে এমন কাজ করেছে। যয়নাব উত্তর দিলেঃ আপনি আমার আপনার লোকদের প্রতি কি করেছেন তা আপনি জানেন। তাই আমি ভেবেছিলামঃ ইনি যদি রাজা হন এর সাহায্যে তাঁর হাত থেকে আমি

অব্যাহতি পাব, আর যদি নবী হন তাহলে সংবাদ পাবেন আমি যা করেছি তার।

হযরত তাকে মুক্তি দেন। কিন্তু বিশর মারা যান—তাতে যয়নাবের মৃতুদণ্ড লাভ হয়। বর্ণিত হয়েছেঃ হযরত অন্তিমকালে বিশ্‌রের ভগিনীকে বলেছিলেনঃ বিশ্‌রের সঙ্গে খাওয়া সেই মাংসের বিষক্রিয়া তিনি অনুভব করছেন।

খয়বরের যুদ্ধ শেষ করে হযরত যান ওয়াদি উল্‌ কুরায়—তা কয়েক রাত্রি অবরোধ করে রাখেন। ওয়াদি উল্‌ কুরার ইহুদীরাও আত্মসমর্পণ করে—খয়বরের ইহুদীদের মতো। এইভাবে মদিনার উত্তরে অবস্থিত ইহুদী অঞ্চলগুলোর উপরে রসুলের প্রাধান্য স্থাপিত হল।

খয়বর থেকে মুসলমানদের প্রচুর ধনসম্পদ লাভ হয়েছিল।

বিবৃত হয়েছেঃ হযরত খয়বর থেকে যাত্রা করে ওয়াদি উল্‌ কুরায় পৌঁছেন সন্ধ্যায়। তাঁর দাস রিফা বিন্‌ যায়েদ রসুলের ব্যবহৃত জিন যখন নামিয়ে রাখছিল তখন হঠাৎ একটি তীর এসে তাকে বিদ্ধ করে ও তাতে তার মৃত্যু হয়। উপস্থিত লোকেরা বলে উঠলো, তার বেহেশত লাভ হল। হযরত বল্লেনঃ "নিশ্চয়ই নয়। তার জামা এখনও দোযখে তার গায়ে জ্বলছে।" এই জামাটি সে চুরি করেছিল খয়বরের যুদ্ধে যেসব মালমাত্তা পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে।

হযরত যখন খয়বরে তখন সেখানে তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হয় আবিসিনিয়ায় যারা হিজরত করেছিল তাদের অবশিষ্ট অংশ—তাদের আনবার জন্য তিনি আমর বিন্‌ উমাইয়া আল্‌ দামরিকে পাঠিয়েছিলেন নাজ্জাশীর কাছে। এদের প্রধান ছিলেন জাফর—তাঁকে পেয়ে হযরত খুব খুশী হলেন। খয়বরে যেসব মালমাত্তা পাওয়া যায় জাফর ও তাঁর সঙ্গীদের তার ভাগ দেওয়া হয়।

হযরত যখন খয়বর থেকে ফেরার পথে বিবি সাফিয়াকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন ও তাঁর সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন আপন তাঁবুতে তখন আবু আইয়ুব তলোয়ার হাতে সারা রাত্রি তাঁর তাঁবু পাহারা দেয়।

ভোরে হযরত তাকে দেখতে পান ও এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাতে আবু আইয়ুব বলে, এই স্ত্রীলোকটির পিতা স্বামী ও স্বজন সম্প্রতি আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে, আর ইনি অবিশ্বাসিনী ছিলেন অল্পকাল পূর্বেও, সেজন্য আমি আপনার জন্য এঁর কারণে ভীত ছিলাম। বর্ণিত হয়েছে হযরত প্রার্থনা করেছিলেনঃ আল্লাহ্ আবু আইয়ুবকে রক্ষা করুন সে যেমন রাত্রি কাটিয়েছে আমাকে রক্ষা করতে।

আল্ হাজ্জাজ্ বিন্ ইলাত আল্ সুলামি নামক খয়বরের একজন ইহুদী মহাজন ইসলাম গ্রহণ করে' হযরতকে বলেঃ মক্কার অনেক সওদাগরের কাছে আমার টাকা পাওনা আছে, তাই মক্কায় গিয়ে সেই টাকা আদায় করার অনুমতি আমাকে দিন। হযরত তাকে অনুমতি দেন। অনুমতি পেয়ে সে বলে ঃ হে রসুল, আমাকে তো মিথ্যা কথা বলতে হবে। তিনি বলেন ঃ তাই বোলো। এর পর আল-হাজ্জাজ মক্কায় এলে সেখানকার কিছু লোক খুব কৌতূহলী হয়ে তার কাছে মোহম্মদের খয়বর অভিযানের কি হলো তা জানতে চায়। আল্-হাজ্জাজ খুব রং চড়িয়ে তাদের বলেঃ মোহম্মদ হেরে গেছে, তার সঙ্গীরাও নিহত হয়েছে, আর মোহম্মদকে বন্দী করা হয়েছে, আর খয়বরের লোকেরা বলেছেঃ আমরা নিজেরা মোহম্মদকে মারবো না তাকে দেব কোরেশদের হাতে, তারা তার মুণ্ডপাত করে তাদের প্রতিহিংসা মেটাক। এতে মক্কার লোকদের মধ্যে খুব হৈ চৈ পড়ে যায়! তখন আল্-হাজ্জাজ তাদের বলে, মক্কায় আমার যেসব টাকা পড়ে আছে যাতে আমি সেসব পেতে পারি সে বিষয়ে তোমরা সাহায্য করো, কেন না আমি চাই খয়বরে গিয়ে মোহম্মদের দল থেকে যারা পলাতক হয়েছে আর যারা তার সঙ্গী তাদের পাকড়াও করতে। এতে মক্কার লোকেরা তাড়াতাড়ি তার টাকা আদায় করে তাকে দেয়। আল্-হাজ্জাজের দেখা হয় আল্-আববাসেরও সঙ্গে, সে তাঁকে গোপনে আসল ব্যাপারটা জানায়, কিন্তু সেই সংবাদ রাষ্ট্র করতে বলে তিন দিন পরে, যেন সে এদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। এরপর যথাসময়ে আল্-আব্বাস কোরেশদের

দের জানান হযরতের খয়বর বিজয়ের কথা আর খয়বরের প্রধানের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা।

মুলতবী হজ সমাধা করা

খয়বর থেকে ফিরে কয়েক মাস মদিনায় কাটিয়ে হযরত যুল্‌কাদা মাসে যাত্রা করলেন গত বৎসরের মুলতবী হজ সমাধা করতে।

হযরত হজব্রত যথারীতি সমাধা করেন।

এই কালে আল্‌-আব্বাসের অনুরোধে তাঁর স্ত্রীর বিধবা ভগিনী আল্‌-হারিসের কন্যা মৈমূনাকে হযরত বিবাহ করেন।

তৃতীয় দিবসে কোরেশের প্রতিনিধিরা এসে হযরতকে স্মরণ করিয়ে দিলে যথাসময়ে তাঁর চলে যাবার কথা। হযরত তাদের বল্লেন ঃ আমাকে যদি তোমরা আরো কয়েকদিন থাক্‌তে দাও আর তোমাদের মধ্যে আমি বিবাহের ভোজের আয়োজন করি আর তাতে তোমরাও যোগ দাও, তাতে তোমাদের কি ক্ষতি ?

তারা বল্লে ঃ আমরা তোমার খাবার চাই না, কাজেই বিদায় হও।

দেশদেশান্তরের রাজদরবারে দূত প্রেরণ

ইবনে ইস্‌হাকে বর্ণিত হয়েছে ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির কাল থেকে রসূলের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর শিষ্যদের বহু আরব ও অনারব রাজার দরবারে প্রেরণ করেন—তাঁদের ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে।

তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেন ঃ মরিয়মতনয় ঈসার শিষ্যরা তাঁর বাণী প্রচারের জন্য দেশদেশান্তরে-গমনের আদেশ পেয়ে যেমন সে-আদেশের প্রতি বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন তোমরা তেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে না।

হযরত তাঁর শিষ্যদের দূতরূপে পাঠান এইসব শাসকের কাছে ঃ

সলিত বিন্‌ আম্‌রকে পাঠান ইয়ামামা-র শাসকের কাছে, আল্‌-আলা বিন্‌ আল্‌-হাযরামিকে পাঠান বাহ্‌রায়েনের শাসকের কাছে ; আম্‌র বিন্‌ আল্‌-আস-কে পাঠান উমানের শাসনকর্তাদের কাছে, হাতিব বিন্‌ আবু

বাল্‌তাআ-কে পাঠান আলেকযান্দ্রিয়ার মুকাওকিসের কাছে, (মুকাওকিস হযরতকে প্রেরণ করেন চারজন দাসী, মতান্তরে দুইজন দাসী, তাদের একজন মারিয়া, তিনি পরে হযরতের পুত্র ইব্রাহিমের জননী হয়েছিলেন ;) দিহ্‌য়িয়া বিন্‌ খলিফা আল্‌-কল্‌বি-কে পাঠান রোমের সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে। হেরাক্লিয়াসের কাছে দৌত্য সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত বিবরণ আমরা ইব্‌নে ইসহাক থেকে উদ্ধৃত করছি।

পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে তখন যুদ্ধ চলেছিল। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে রোমকরা তাদের রাজ্যের বিজিত অংশ পারসিকদের কাছ থেকে উদ্ধার করে আর সেই উপলক্ষে হেরাক্লিয়াস পবিত্র নগরীতে তীর্থযাত্রা করেন। সেখানে বসরার শাসনকর্তা হেরাক্লিয়াসের কাছে পাঠিয়ে দেন রসুলের পত্রবাহী এক আরব দূতকে। দূতের কথায় হেরাক্লিয়াস খুব কৌতূহল বোধ করেন আর খুঁজে আবুসুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের পান সিরিয়ায় —হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে তারা সেখানে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল। হেরাক্লিয়াস দোভাষীর সাহায্যে জেনে নেন হযরত মোহম্মদের বংশ-পরিচয়, তাঁর শিষ্যদের পরিচয়, আর তিনি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন কি না সেই সব কথা। আর এ সব সম্বন্ধে আবুসুফিয়ানের কাছ থেকে অনুকূল মত পেয়ে হেরাক্লিয়াসের ঔৎসুক্য আরো বেড়ে যায়। হযরতের পত্রে ছিল ঃ যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে থাকবেন নিরাপদে ; যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আল্লাহ্‌ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন : যদি আপনি বিমুখ হন তবে চাষীদের (আপনার প্রজাদের) পাপের বোঝা আপনার উপরে বর্তাবে।

বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরতের পত্র হেরাক্লিয়াসকে খুব প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু রোমকদের প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিনি কিছুই করে উঠতে পারেন নি।

হযরত, শুযা বিন্‌ ওহ্‌ব-কে পাঠান দামেস্কের শাসনকর্তার কাছে। তিনি আম্‌র বিন্‌ উমাইয়া আল্‌-দামরি-কে পাঠান আবিসিনিয়ার

রাজা নাজ্জাশীর কাছে। নাজ্জশী যে ইসলামের প্রতি অনুকূল ছিলেন তা আমরা জেনেছি। হযরতের পত্রের উত্তরে তিনি তাঁর প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেন। আবদুল্লাহ্ বিন্ হুযাফা হযরতের পত্র নিয়ে যান পারস্য-সম্রাটের কাছে। পারস্য-সম্রাট হযরতের পত্র পড়ে ছিঁড়ে ফেলেন। এই সংবাদ হযরতের কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন তার রাজ্য ছিন্নভিন্ন হবে। হযরতের পত্র পেয়ে পারস্য সম্রাট এমনের শাসন-কর্তা বাযান-কে লিখে পাঠান: দুইজন বলবান লোক পাঠিয়ে এই লোকটাকে হেজাজ থেকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আস। বাযান হযরতের কাছে লোক পাঠান। পারস্য-সম্রাট হযরতের বিরুদ্ধে এমন পরওয়ানা জারি করেছেন এই সংবাদে কোরেশরা খুশী হয়। সেই দুইজন লোক হযরতের কাছে মদিনায় আসে আর পারস্য-সম্রাটের রোষের কথা জানায়। এই দূতদের দাড়ি ছিল কাটা, আর গোঁফ ছিল লম্বা। হযরত তাদের জিজ্ঞাসা করেন কার আদেশে তারা এমন করেছে। তারা বলে: আমাদের প্রভু পারস্য-সম্রাটের আদেশে। হযরত বলেন: আমার প্রভু আমাকে আদেশ করেছেন দাড়ি লম্বা রাখতে আর গোঁফ কাটতে। তিনি তাদের বলেন পরদিন ভোরে আসতে।

হযরত দৈবযোগে জানতে পারেন পারস্য-সম্রাটের পুত্র তাঁকে হত্যা করেছে। সেই কথা হযরত দূতদের জানান। এতে দূতরা ক্রুদ্ধ হয় আর হযরতকে প্রতিশোধের ভয় দেখায়। হযরত বলেন: তোমাদের রাজাকে বোলো: আমার ধর্ম ও রাজত্ব যত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে পারস্য সাম্রাজ্য কখনো তা হয় নি। হযরত আরো বলেন: তোমাদের প্রভু, অর্থাৎ বাযান, যদি আমার বশ্যতা স্বীকার করেন তবে তাঁকে আমি এমনের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত রাখব।

বাযানের কছে এইসব সংবাদ পৌঁছলে বাযান বিস্মিত হন। সত্বরই তিনি জানতে পারেন পারস্যসম্রাট সত্যই তাঁর পুত্রের দ্বারা নিহত হয়েছেন। এর পর বাযান ইসলাম গ্রহণ করেন আর অনেক পারসিকও তাঁর অনুবর্তী হয়।

সম্রাট হেরাক্লিয়াসের হযরতের বাণীর প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ ও সাধারণভাবে রোমকদের সেই বাণীর প্রতি বিতৃষ্ণার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। ফারওয়া বিন্ আমের ছিলেন সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের একটি রোমক জেলার শাসক। তিনি রসুলের দূতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন ও ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন আর কিছু মূল্যবান উপহার হযরতকে পাঠান। এই শাসকের এমন ধর্মত্যাগের সংবাদ পেয়ে রোম-সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষ তাঁকে পুনরায় খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়। কিন্তু ফারওয়া অস্বীকৃত হন, কেন না তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে এই নবীর আগমনের কথা হযরত ঈসা বলে গেছেন। ফারওয়াকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

এই অঞ্চলের অপর এক জেলার শাসনকর্তা সুরাহ্ বিল্ হযরতের প্রেরিত এক দূতকে বন্দী করে' হত্যা করে। এর ফলে তার বিরুদ্ধে হযরত তিন হাজার সৈন্য পাঠান অষ্টম হিজরীর জুমাদল উলা মাসে—যায়েদ বিন্ হারিসার নেতৃত্বে। হযরত নির্দেশ দিয়ে দেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যায়েদ নিহত হলে জাফর বিন্ আবু তালেব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন, আর জাফরের পরে নেতৃত্ব করবেন আব্দুল্লাহ্ বিন্ রওয়াহা। আবদুল্লার পরে, দরকার হলে, সৈন্যদল নিজেদের নেতা নির্বাচিত করবে এই নির্দেশও তিনি দিয়ে দেন।

এই সৈন্যদল সিরিয়ার মাআন্ নামক স্থানে পৌঁছে সংবাদ পেল হেরাক্লিয়াস এক লক্ষ গ্রীক সৈন্য আর অন্যান্য জাতীয় আর এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন। এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে হযরতকে জানাবার কথা তাঁরা ভাবলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন্ রওয়াহা তাঁদের বল্লেন: তোমরা শহীদ হওয়ার জন্য এসেছ কিন্তু সেই শহীদ হওয়াই তোমরা অপছন্দ করছ, আমরা সংখ্যাধিক্য দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করছি না, আমার মোকাবেলা করছি আমাদের ধর্ম দিয়ে যা দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের সম্মানিত করেছেন, কাজেই অগ্রসর হও—বিজয় লাভ অথবা শহীদ হওয়া দুইই উত্তম লক্ষ্য। লোকেরা বল্লে: আল্লাহর শপথ রওয়াহার পুত্র ঠিক কথা বলেছেন।

মুতার যুদ্ধ

মুতা নামক স্থানে রোমক বাহিনীর সঙ্গে মুসলমান বাহিনীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে যায়েদ, জাফর, আবদুল্লাহ্ বিন্ রওয়াহা সবাই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের মৃত্যু বরণ করতে হলো। মুসলমান সৈন্যদলে কিছু দিশাহারা ভাব দেখা দিল। এই সংকটে তাদের নেতা নিযুক্ত হলেন বীরবর খালেদ—ওহোদের যুদ্ধে তাঁর রণনৈপুণ্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিরাট রোমক বাহিনীর সঙ্গে এঁটে ওঠা অস্ত্রশস্ত্রে দুর্বল মুসলিম বাহিনীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। খালেদের তাই বিশেষ চেষ্টা হলো অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। আর শেষ পর্যন্ত তাতে অনেকটা কৃতকার্য হয়ে তাদের নিয়ে তিনি মদিনায় ফিরলেন। হযরতের কাছে যুদ্ধের সংবাদ পৌঁছচ্ছিল। (এই সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছচ্ছিল অলৌকিক উপায়ে, এই মর্মের বিবৃতিও আছে)।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত মুসলিম বাহিনীকে মদিনার লোকেরা সদয় ভাবে গ্রহণ করলো না, তারা এদের ধুলো দিতে লাগল—বলতে লাগল: এরা পলাতক, আল্লাহ্‌র পথ থেকে পালিয়ে এসেছে। রসুল তাদের পক্ষ অবলম্বন করে' বল্লেন: এরা পলাতক নয়; আল্লাহ্ সুদিন দিলে আবার এরা যুদ্ধে যাবে। জাফরের শিশুসন্তানদের প্রতি হযরত এই সময় খুব সদয়তা দেখিয়েছিলেন।

ইবনে ইসহাকের মতে মু'তার যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদল সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে মুসলমান বাহিনীর সংকটাপন্ন দশার কথা জেনে মদিনা থেকে অনেকে তাদের সাহায্যে অগ্রসর হন, আর দলে দলে আরব সৈন্যদের আসতে দেখে রোমক সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যায়।

মু'তার যুদ্ধ হয়েছিল সাত দিন ধরে'।

মু'তার অভিমুখে যাত্রী সৈন্যদলকে হযরত যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা স্মরণীয়:

আমি তোমাদিগকে সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয় করিয়া চলিবার উপদেশ দিতেছি। প্রত্যেক সহচর মুসলমানের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দান করিতেছি। আল্লাহ্‌র নামে রণযাত্রা কর এবং সিরিয়ায় তোমাদিগের এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদিগকে যুদ্ধদান কর। তোমরা যে দেশে যাইতেছ, সেখানকার মঠে সাধু সন্ন্যাসীগণকে নিভৃত সাধনায় মগ্ন থাকিতে দেখিবে। সাবধান তাহাদিগের কার্যে কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। সাবধান, একটি স্ত্রীলোক, একটি বালক বা বালিকা, একজন বৃদ্ধও যেন কোন ক্রমে তোমাদিগের হস্তে নিহত না হয়। সাবধান, শত্রুপক্ষের একটি বৃক্ষও ছেদন করিও না, একটি গৃহও ভূমিস্মাৎ করিও না।

(মোস্তফা-চরিত)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মক্কা-বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধির কালে আমরা দেখেছি মক্কা অঞ্চলের খুযাআ গোত্র আগ্রহের সঙ্গে যোগদান করছে হযরতের দলে আর বানু বকর গোত্র যোগদান করছে কোরেশদের দলে। এই দুই দলের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে শত্রুতা চলেছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হবার পরেও তাদের এই শত্রুতা চলে, এমন কি কোরেশ বানু বকরের সঙ্গে গোপনে যোগদান করে' খুযাআ গোত্রের কিছু লোককে হত্যা করে। বুদেলবিন্ ওয়ারকা কিছু সংখ্যক খুযাআ গোত্রের লোককে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় গিয়ে তাদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে তার কথা জানায়, আর কোরেশ ও বানু বকরের বিরুদ্ধে হযরতের কাছে অভিযোগ করে।

বুদেল প্রভৃতির পরে আবু সুফিয়ান মদিনা অভিমুখে রওনা হয়। পথে উস্‌ফানে তাদের দুই দলের দেখা হয়। বুদেল যে মদিনায় গিয়েছিল সে কথা সে গোপন রাখে, কিন্তু আবু সুফিয়ান বুঝতে পারে।

এর পর মদিনায় উপস্থিত হয়ে আবু সুফিয়ান প্রথমে যায় তার কন্যা ও হযরতের পত্নী বিবি উম্মে হাবিবার কাছে। হযরতের বসবার আসনের উপরে আবু সুফিয়ান বসতে চেষ্টা করে, তাতে উম্মে হাবিবা তা গুটিয়ে রাখেন। আবু সুফিয়ান বল্লেঃ বাছা, বুঝতে পারলাম না ঐ আসনের মূল্য আমার চাইতে বেশি না আমার মূল্য আসনের চাইতে বেশি। তিনি বল্লেনঃ এটি রসুলের বসবার জায়গা, কিন্তু তুমি অপরিচ্ছন্ন বহুদেববাদী, আমি চাই না যে তুমি রসুলের আসনের উপরে বসবে। আবু সুফিয়ান বল্লেঃ আল্লাহ্‌র শপথ, দেখছি আমার কাছ থেকে চলে যাবার পরে তোমার অবনতি ঘটেছে।

এর পরে আবু সুফিয়ান গেল হযরতের কাছে। কিন্তু হযরত তার সঙ্গে কথা বল্লেন না। এরপর সে যথাক্রমে গেল আবু বকর, ওমর,

আলী ও ফাতেমার কাছে। কিন্তু কারো কাছ থেকেই কোনো আনুকূল্য পেলে না। সে মদিনা ত্যাগ করলে।

হযরত এক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন: হে আল্লাহ্ কোরেশদের কাছ থেকে চোখ ও কান নিয়ে নাও যেন আমরা হঠাৎ গিয়ে তাদের চমকে দিতে পারি।

হাতিব বিন্ আবূ বালতাআ নামক একজন মুসলমান একটি স্ত্রীলোকের মারফৎ হযরতের এই অভিযানের সংবাদ মক্কায় পাঠায়। ইব্নে ইসহাকে বলা হয়েছে: হযরত দৈবযোগে এই খবর পান আর আলী ও আল-যুবের বিন্ আল আওয়ামকে পাঠান সেই মেয়েটিকে ধরতে। তাঁরা মেয়েটির কাছ থেকে সেই পত্র উদ্ধার করে' আনেন। হযরত হাতিবের কাছে জানতে চান কেন সে এমন কাজ করেছে। সে বল্লে: সে আল্লাহ্তে ও রসুলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী কিন্তু মক্কায় কোরেশদের মধ্যে রয়েছে তার স্ত্রী ও পুত্র, তাদের ভালোর জন্য সে এই সংবাদ দিয়েছিল। ওমর চাইলেন তার শিরশ্ছেদ হোক, কেন না সে কপট। কিন্তু এই হাতিব বদরে উপস্থিত ছিল, সেজন্য রসুল তাকে ক্ষমা করলেন।

রসুল মক্কা অভিযানে বেরোলেন ১০ ই রমযান তারিখে দশ হাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে। বহু উপদল এই অভিযানে প্রচুর সৈন্য জুগিয়েছিল। মোহাজীর ও আনসারদের কেউই পেছনে পড়ে থাকে নি।

যখন রসুল মক্কার নিকটবর্ত্তী মারর্-আল্-যাহ্রান-এ পৌঁছলেন কোরেশ তখনও তাঁর গতিবিধি সম্বন্ধে অনবহিত ছিল।

পথেই আল্-আব্বাসের সঙ্গে হযরতের দেখা হয়েছিল। হযরত মারর্ আল্-যাহ্রানে পৌঁছলে তিনি বল্লেন: হতভাগ্য কোরেশ—যদি রসুল বলে মক্কায় প্রবেশ করেন তাঁর কাছে তাদের আশ্রয় প্রার্থনা করার পূর্বে তবে কোরেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। হযরতের অশ্বতরে চড়ে আব্বাস এদিকে ওদিকে খুঁজছিলেন কোনো কাঠকাটিয়ে বা দুধওয়ালা বা আর কাউকে পান কি না যারা মক্কায় গিয়ে কোরেশকে খবর দিতে পারবে রসুল এখন কোথায় অবস্থান করছেন আর তারা এসে তাঁর

কাছে নিরাপত্তা প্রার্থী হবে। আলআব্বাস বলেছেন: যখন আমি এইভাবে খুঁজছিলাম তখন হঠাৎ শুনলাম আবু সুফিয়ান, হাকিম বিন্-হাযাম আর বুদেল পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। হযরতের আদেশে মুসলমান সৈন্যরা পাহাড়ের উপরে হাজার হাজার আগুন জ্বালিয়েছিল। সেই সব আর সৈন্যদের ছাউনি দেখে আবু সুফিয়ান বলছিল: আমি এমন আগুন আর সৈন্যদের এমন ছাউনি পূর্বে কখনো দেখি নি। বুদেল বলছিল: এ সব খুযাআদের দ্বারা জ্বালানো আগুন, যুদ্ধের জন্য তারা এই আগুন জ্বালিয়েছে। আবু সুফিয়ান বলছিল খুযাআরা গরীব আর সংখ্যায় অল্প, এত আগুন আর ছাউনি তাদের হতে পারে না। আল-আব্বাস বলছেন: আমি আবু সুফিয়ানের গলা চিন্‌লাম আর তাকে ডাকলাম, সেও আমার গলা চিন্‌লো। আমি তাকে বললাম: রসুল এখানে এসে পৌঁছেছেন তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে, কোরেশ ও তার (আবু সুফিয়ানের) কথা ভেবে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি, তিনি যদি তোমাকে ধরতে পারেন তবে তোমার মুণ্ডপাত করবেন, কাজেই এই খচ্চরের পিঠে আমার পিছনে বোসো, তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তোমার নিরাপত্তা প্রার্থনা করবো। তাঁরা দুইজন এইভাবে চললেন। আল আব্বাস হযরতের খচ্চরের চড়ে যাচ্ছেন দেখে কেউ কিছু বললো না। কিন্তু ওমরের জ্বালা আগুনের কাছে এলে তিনি বাধা দিলেন। আল-আব্বাস বলছেন, কিন্তু আমি খচ্চরটি দ্রুতবেগে চালিয়ে ওমরের একটু আগে রসুলের কাছে এসে পৌঁছলাম। ওমর চাচ্ছিলেন আবু সুফিয়ানের মুণ্ডপাত করবেন, কিন্তু আমি তাঁকে বল্লাম: আমি আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দিয়েছি।' ওমর অবশ্য আবু সুফিয়ানের মুণ্ডপাতের কথাই বলছিলেন; কিন্তু হযরত আল আব্বাসকে বল্লেন: আবু সুফিয়ানকে নিয়ে পরের দিন তাঁর কাছে আসতে।

পরের দিন ভোরে আমি তাকে নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তাকে দেখে রসুল বল্লেন: এখনো কি তোমার বুঝবার সময় হয় নি যে আল্লাহ্

ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই? আবু সুফিয়ান বল্লেঃ তুমি আমার কাছে পিতামাতার চাইতে প্রিয়তর, কত তোমার করুণা, সম্মান, দয়া! আল্লাহ্‌র শপথ, একথা আমার মনে হয়েছে যে যদি আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য থাকতেন তবে তিনি আমাকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত করতেন না। রসুল বল্লেনঃ দুর্ভাগ্য তোমার আবু সুফিয়ান এখনো কি তোমার বুঝবার সময় হয় নি যে আমি আল্লাহ্‌র রসুল? আবু সুফিয়ান উত্তর দিলেঃ সে কথা যদি বলো তবে তাতে আমার এখনো কিছু সন্দেহ আছে।

আল-আব্বাস আবু সুফিয়ানকে বল্লেনঃ বিশ্বাস কর, আর মুখে বলোঃ আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই আর মোহম্মদ তাঁর রসুল—যদি ঘাড়ের উপরে মাথাটি রাখতে চাও। আবু সুফিয়ান কলেমা উচ্চারণ করলে।

আমি রসুলকে বল্লামঃ আবু সুফিয়ান মানী লোক, তার জন্য কিছু করা চাই। রসুল বল্লেনঃ যে আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে নিজের বাড়ীর দরজা বন্ধ করে ভিতরে থাকবে সে নিরাপদ, যে পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।

মুসলমান সৈন্যরা মক্কা প্রবেশ করছিল। আল আব্বাস আবু সুফিয়ানকে এক পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে সেই সৈন্যদল দেখতে বল্লেন। দেখে আবু সুফিয়ান আল্-আব্বাসকে বল্লেঃ ফজলের পিতা, তোমার ভাই-পোর ক্ষমতা খুব বেড়েছে। আব্বাস বল্লেনঃ তিনি রসুল এই জন্যই তাঁর এত ক্ষমতা।

আবু সুফিয়ান সত্বর মক্কায় প্রবেশ করে চেঁচিয়ে বলতে লাগলঃ কোরেশ, মোহম্মদ যে সৈন্যদল নিয়ে এসেছে তাদের রোধ করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই, যে কেউ আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। উৎবার কন্যা হিন্দ্ (আবু সুফিয়ানের পত্নী) তার কাছে গিয়ে তার গোঁফ ধরে টেনে বল্লেঃ এই চর্বির বস্তাটাকে সাবাড় করে দাও—জাতির কত বড় রক্ষাকর্তা ইনি! আবু সুফিয়ান বল্লেঃ

তোমাদের অদৃষ্ট মন্দ, এই মেয়েলোকটি তোমাদের প্রবঞ্চিত না করুক, কেন না যা এসে পড়েছে তা তোমরা রোধ করতে পারবে না, আবু স্থফিয়ানের ঘরে যে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ। তারা বল্লেঃ আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন। তোমার ঘর দিয়ে আমাদের কি হবে? আবু স্থফিয়ান বল্লেঃ যে তার বাড়ীর দরজা বন্ধ করে ভিতরে থাকবে অথবা যে পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ থাকবে। এই কথা শুনে লোকেরা যার যার বাড়ীতে ও পবিত্র মসজিদে চলে গেল।

মুসলমান সৈন্যদল কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিল। হযরত যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন—তাঁর মাথায় ছিল রক্তবর্ণ একটি শিরস্ত্রাণ—তখন তাঁর মাথা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যে নত হয়ে পড়েছিল। পরম জয়ের মুহূর্তে এই পরম নতি—এই ছিল তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার রূপ।

হযরত পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করলে আবু বকর তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। হযরত বল্লেনঃ এই বুড়ো মানুষকে তাঁর ঘরে থাকতে দেওয়াই তো ভাল ছিল, আমি সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। আবু বকর বল্লেনঃ তাঁর পিতা হযরতের সঙ্গে এসে দেখা করবেন এইত বেশি সঙ্গত। হযরত বৃদ্ধকে সামনে বসিয়ে তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করতে বল্লেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মুসলমান সৈন্যদের যে দলে নেতৃত্ব করছিলেন খালেদ তার প্রবেশে বাধা দিল সাফওয়ান, সোহেল ও ইক্‌রিমা। এতে কয়েকজন মুসলমান নিহত হয়। কোরেশদের দলে নিহত হয় বারো তেরো জন লোক।

ইবনে ইসহাক বলেছেন রসুল যখন মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন তাঁর সৈন্যদের শুধু তাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে বলেছিলেন যারা বাধা দেবে। তবে কয়েকজনের সম্বন্ধে আদেশ ছিল—কাবার গেলাপে আশ্রয় নিলেও তাদের প্রাণদণ্ড হবে। এদের মধ্যে ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন্ সা'দ। সে ছিল মুসলমান, হযরত যে প্রত্যাদেশ পেতেন তা সে লিখতো; তারপর সে ধর্মত্যাগ করে ও কোরেশদের কাছে ফিরে যায়। তারপর সে আশ্রয়

নেয় তার পালক-ভ্রাতা ওসমান বিন্ আফ্ফানের কাছে। তিনি তাকে লুকিয়ে রাখেন আর মক্কায় যখন সব অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে তখন তার জন্য হযরতের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। হযরত কিছুক্ষণ নীরব থেকে সম্মতি দেন।

আর একজন ছিল আবদুল্লাহ্ বিন্ খাতল। সে যাকাত সংগ্রহ করতো। তারপর সে একজনকে হত্যা করে' ধর্মত্যাগ করে। তার দুই গায়িকা বান্ধবী ছিল, তারা হযরতের নিন্দাসূচক গান গেয়ে বেড়াতো। এই তিনজনেরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, একজন গায়িকা পালিয়ে যায়, সে পরে প্রাণ ভিক্ষা পায়। এ ভিন্ন আল হুওয়রিস বিন্ নুকেয-কেও গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। (কিছু ভিন্ন মতের জন্য মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য।)

গুরুতর অপরাধের জন্য মিকায়েস বিন্ হুবাবা ও সারাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ইক্রিমা পালিয়ে আবিসিনিয়ায় যেতে চেষ্টা করে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করে।

মক্কা বিজয়ের দিন হযরত কাবা গৃহে প্রবেশ করেন। তাতে ছিল ৩৬০টি প্রতিমা। হযরত একটি ছড়ি হাতে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কোরআনের এই বাণী আবৃত্তি করছিলেন : সত্য এসেছে, আর মিথ্যা অন্তর্হিত হয়েছে, নিঃসন্দেহ মিথ্যা অন্তর্হিত হবার জন্যই। —তারপর তিনি ছড়ি দিয়ে তাদের দিকে লক্ষ্য করছিলেন আর তারা চিৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল—একের পর আর।

কাবাগৃহে কিছু কিছু ছবিও ছিল, সে সবের মধ্যে দুটি ছিল মরিয়মতনয় ঈসার ও মরিয়মের ; এই সব ছবি মুছে ফেলা হয়।

হযরত কাবার দ্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন : একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই ; তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেছেন ও তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন। তিনি একা তাড়িয়ে দিয়েছেন উপজাতিবৃন্দকে। সমস্ত বিশেষ অধিকার অথবা রক্তের অথবা সম্পত্তির বিশেষ দাবি আজ আমার দ্বারা নাকচ করা হল—কাবা-

গৃহের হেফাজত আর তীর্থযাত্রীদের জল সরবরাহ ভিন্ন। নরহত্যার জন্য মুক্তিপণ নির্ধারিত হল এক শত উট, তার ৪০টি হবে গর্ভবতী। হে কোরেশ, অন্ধকার যুগের গর্ব আর পূর্ব-পুরুষের পূজা আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন, মানুষের উৎপত্তি আদম থেকে আর আদমের উৎপত্তি ধুলা থেকে। তারপর হযরত কোরআনের এই বাণী আবৃত্তি করলেন ঃ

হে জনগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও ও একজন নারী থেকে, আর তোমাদের জাতি ও পরিবার করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে জানতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সব চাইতে সম্মানিত সে যে সব চাইতে ভালো সীমারক্ষাকারী। নিঃসন্দেহ আল্লাহ বিজ্ঞ, ওয়াকিফহাল। (৪৯ঃ ১৩)

তারপর তিনি বল্লেন ঃ হে কোরেশ, তোমাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করতে যাচ্ছি ভাবছ? তারা উত্তর দিলে ঃ ভাল ব্যবহার—তুমি এক মহান ভাই, মহান ভাইয়ের পুত্র। তিনি বল্লেন ঃ যাও তোমরা—তোমরা মুক্ত।

এইভাবে রসুল কোরেশদের মুক্তি দিলেন যদিও তাদের উপরে আল্লাহ্ তাঁকে সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। সেজন্য মক্কাবাসীদের বলা হতো মুক্তিপ্রাপ্ত।

এর পর জনগণ মক্কায় সমবেত হল রসুলের কাছে ইসলামে আনুগত্য স্বীকার করতে। ইব্নে ইসহাক বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত বসেছিলেন সাফা পাহাড়ের উপরে লোকদের আনুগত্য গ্রহণের জন্য, আর নিচে দাঁড়িয়ে ওমর লোকদের বলে দিচ্ছিলেন আনুগত্য স্বীকারের শর্তগুলোর কথা, যেমন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আদেশ যথাশক্তি পালন করে চলতে হবে।

পুরুষদের পরে আসে মেয়েলোকদের পালা। কোরেশমেয়েরা যারা উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিল উৎবার কন্যা হিন্দ্; সে এসেছিল অবগুণ্ঠিতা হয়ে, নিজেকে গোপন করে—হাম্যার প্রতি সে কি করেছিল সে

কথা তার মনে ছিল—তার ভয় ছিল যে রসুল তাকে শাস্তি দেবেন।—যখন মেয়েরা হযরতের আনুগত্য প্রার্থনী হলো তিনি তাদের কাছে এই স্বীকারোক্তি দাবি করলেন যে তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো অংশী খাড়া করবে না। তখন হিন্দ বল্লেঃ আল্লাহ্‌র শপথ, আপনি আমাদের উপরে একটি শর্ত আরোপ করেছেন যা পুরুষদের উপরে করেন নি—আমরা সেই শর্ত পালন করব। রসুল বল্লেনঃ তোমরা চুরি করবে না। হিন্দ বল্লেঃ আল্লাহ্‌র শপথ, আবু সুফিয়ানের টাকা পয়সা আমি কিছু কিছু নিতাম আর আমি জানি না তা আমার জন্য বৈধ ছিল কি না। আবু সুফিয়ান উপস্থিত ছিল, সে তাকে বল্লে, যা হয়ে গেছে তা বৈধ। তখন হযরত বল্লেনঃ তাহলে তুমি উৎবার কন্যা হিন্দ? সে উত্তর দিলেঃ হাঁ, যা হয়ে গেছে তা ক্ষমা করুন আল্লাহ্‌ আপনাকে ক্ষমা করবেন। রসুল বল্লেনঃ আর ব্যভিচার করবে না। হিন্দ উত্তর দিলেঃ কোনো স্বাধীনা মেয়ে কখনো ব্যভিচার করে? হযরত বল্লেনঃ তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। হিন্দ বল্লেঃ আমি তাদের মানুষ করেছিলাম যখন তারা ছিল ছোট, আর তারা বড় হলে বদরের যুদ্ধের দিন আপনি তাদের মেরে ফেলেছিলেন; কাজেই তাদের সম্বন্ধে আপনিই ভাল জানেন। তার উত্তর শুনে ওমর খুব হাসলেন। হযরত বল্লেনঃ তোমরা নিন্দা রটাবে না। হিন্দ্‌ বল্লেঃ আল্লাহ্‌র শপথ, নিন্দা রটানো লজ্জার কাজ, কিন্তু তা উপেক্ষা করা কখনো কখনো ভাল। রসুল বল্লেনঃ ভাল যা করতে আমি আদেশ দের তোমরা সে বিষয়ে আমার অবাধ্য হবে না। হিন্দ্‌ উত্তর দিলেঃ আপনার কথা অমান্য করতে আমরা যদি চাইতাম তবে আমরা এতক্ষণ এখানে বসে থাকতাম না। মেয়েদের অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হযরত ওমরকে আদেশ করলেন আর তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। হযরতের হয়ে ওমর তাদের আনুগত্য গ্রহণ করলেন। রসুল মেয়েদের হাত ধরতেন না। যেসব নারী ছিলেন তাঁর জন্য বৈধ ও তাঁর হারেমবাসিনী তাঁদের ভিন্ন হযরত কখনো অন্য নারীকে স্পর্শ করেন নি। ইব্‌নে ইসহাক বলেছেনঃ নারীদের আনুগত্য গ্রহণ

করা হয়েছিল এইভাবে ঃ একটি জল ভরা পাত্র হযরতের সামনে রাখা হয়েছিল, আর যখন তিনি নারীদের জন্য শর্তসমূহের উল্লেখ করছিলেন ও যখন তারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছিল তখন হযরত সেই জলপাত্রে নিজের হাত ডুবিয়ে তুলে নিচ্ছিলেন, তার পর মেয়েরা তাতে হাত ডোবাচ্ছিল।

মক্কা-বিজয়ের পরের দিন একজন খুযাআ গোত্রের লোক তাদের শত্রুস্থানীয় একজন বহুদেববাদীকে হত্যা করে। হযরত তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন ঃ আল্লাহ্ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন সেদিন মক্কাকে করেছিলেন পবিত্র—এর পবিত্রতা বজায় থাকবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। যে কেউ আল্লাহ্‌তে ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে তার পক্ষে এখানে শোণিতপাত করা বৈধ নয়। এটি আমার পূর্বেও বৈধ ছিল না আমার পরেও বৈধ হবে না; আমার জন্য এটি বৈধ নয় এই সময়ের জন্য ভিন্ন, কেন না আল্লাহ্ এর লোকদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। মক্কা পুনরায় তার পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাজেই তোমরা জেনে রাখো ও লোকদের বোলো ঃ রসুল যদি মক্কায় লোকদের নিহত করে থাকেন তবে তিনি তা করেছিলেন আল্লাহ্‌র অনুমতিতে কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের সেই অনুমতি দেন নি। হে খুযাআ গোত্রের লোক, হত্যা থেকে বিরত হও, কেন না বহু হত্যা হয়েছে—অবশ্য হত্যায় কিছু যে উপকার না হয়েছে তা নয়। তোমরা একটি লোককে হত্যা করেছ সেজন্য আমি তার শোণিতপণ দিয়ে দেব।

মক্কা বিজয়ের পরে হযরত মক্কার আশেপাশে সৈন্যদের পাঠান লোকদের আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করতে—কিন্তু যুদ্ধ করতে নয়। এই সৈন্যদলের সঙ্গে যায় খালেদ বিন্ আল্ ওয়ালিদ। সে মক্কার নীচের সমতলক্ষেত্রে বনি-জাযিমা-কে পরাভূত করে ও তাদের কিছু-সংখ্যক লোক নিহত করে—এদের সঙ্গে খালেদের পূর্ব-শত্রুতা ছিল। এই সংবাদ হযরতের কাছে পৌঁছলে, হযরত দুই হাত আকাশে তুলে বলেন ঃ আল্লাহ, খালেদ যা করেছে সে সম্বন্ধে আমি তোমার সামনে নিষ্পাপ। তিনি আলীকে ডেকে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে পাঠালেন

আর অন্ধকার যুগের ধারা পরিসমাপ্ত করতে আদেশ দিলেন। আলী টাকাপয়সা নিয়ে গিয়ে শোণিত-পণ যা দেবার তা দিলেন আর কিছু টাকা বেঁচে গেলে তাও তাদের দিয়ে এলেন যদি ভবিষ্যতে কোনো দাবি ওঠে তা মেটাবার জন্য। রসুল তাঁর এই কাজের প্রশংসা করলেন। এরপর রসুল উঠে দাঁড়িয়ে কেবলার দিকে মুখ করে আকাশে হাত তুলে বল্লেন: আল্লাহ, খালেদ যা করেছে সে সম্বন্ধে আমি তোমার সামনে নিষ্পাপ। তিনি তিনবার এই কথা বলেন।

ইবনে ইসহাকে আছে: রসুল খালেদকে প্রেরণ করেন নাখলায়, আল উয্‌যার মূর্তি ধ্বংস করতে। সেই মূর্তির সেবাইত মূর্তিটির উপরে তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখে পাহাড়ে উঠলো, আর বল্লে:

হে উয্‌যা, খালেদের উপরে এক ধ্বংসকর আক্রমণ চালাও,
তোমার অবগুণ্ঠন খুলে ফেল আর তোমার দলবলকে প্রতিরোধে
সক্রিয় কর!
হে উয্‌যা, তুমি যদি এই খালেদকে ধ্বংস না করো,
তবে অবিলম্বে শাস্তি পাও, অথবা মুসলমান হয়ে যাও।

মক্কা বিজয়ের পরে হযরত সেখানে অবস্থিতি করেন পনেরো রাত্রি। মক্কা বিজয় ঘটে অষ্টম হিজরির বিশ রমযান তারিখে।

হুনায়েনের যুদ্ধ

মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ছিল বিরাট হাওয়াযিন গোত্র—বহু শাখায় উপশাখায় বিভক্ত। মালিক বিন আউফ আল্ নাস্‌রি রসুলের বিরুদ্ধে তাদের সমবেত করলে। তাদের সঙ্গে সাকিফ, নাসর, যুশাম, সা'দ বিন বকর, প্রভৃতি গোত্রের যোগ দিল। তবে কোনো কোনো গোত্র, যেমন, হাওয়াযিনের কা'ব ও কিলাব, তারা এই আয়োজনে যোগ দিল না। এই সম্মিলিত দলের যুদ্ধ করার সংকল্প অটুট রাখার জন্য নেতা মালিক বিন্ আউফ জাতির স্ত্রীলোকদের ছেলেমেয়েদের ও পশুপাল সঙ্গে নিয়ে এলো। যুশাম গোত্রের বর্ষীয়ান যোদ্ধা দুরায়েদ বি আল্ সিম্‌মান্

এই ব্যবস্থা অপছন্দ করলো—তার যুক্তি, যে পালাতে চাইবে কিছুই তাকে রোধ করবে না। কিন্তু যুবক মালিক বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত করলো না।

রসুল হাওয়াযিনের সমরায়োজনের সংবাদ শুনে একজনকে পাঠালেন তাদের মধ্যে অবস্থান করে প্রকৃত ব্যাপার জানতে। সে যথাসময়ে ফিরে এসে হযরতকে খবর দিল হাওয়াযিন সত্যই এক বিরাট সমরায়োজন করেছে।

মক্কায় তখনো কিছু কিছু বহুদেববাদী ছিল। সংগতিসম্পন্ন সাফ্ওয়ান বিন্ উমাইয়া তাদের একজন। হযরত তার কাছে কিছু বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র ধার চাইলেন। সাফওয়ান বল্লেঃ মোহম্মদ, আপনি কি এসব জোর করে নিতে চাইছেন? হযরত বল্লেনঃ না, এসব নিতে চাচ্ছি কর্জ ও গচ্ছিত হিসাবে, এসব আমরা তোমাকে ফিরিয়ে দেব। সাফ্ওয়ান বল্লেঃ এই হলে তার কোনো আপত্তি নেই। সাফ্ওয়ানের কাছ থেকে হযরত একশত বর্ম ও যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ধার নেন। বর্ণিত হয়েছে, হযরত তার কাছে কিছু যানবাহনও চেয়েছিলেন আর সে সেসব দিয়েছিল।

সাফ্ওয়ানের ধারণা হয়েছিল হাওয়াযিনের আনুগত্য স্বীকার করার চাইতে একজন কোরেশের আনুগত্য স্বীকার করা ভাল।

হযরত তাঁর দশ হাজার সঙ্গী আর দুই হাজার মক্কার লোক এই মোট বারো হাজার সৈন্য নিয়ে হুনায়েনের অভিমুখে যাত্রা করেন।

মক্কার একজন নতুন মুসলমান বলেছেঃ অন্ধকার যুগে বহুদেববাদী কোরেশরা ও অন্যান্য আরব যাতু আন্ওয়াত্ নামক একটি গাছের প্রতি বিশেষ সম্ভ্রম দেখাতো। প্রত্যেক বৎসর আমরা সেখানে গিয়ে তার উপরে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতাম, পশু কোরবানি দিতাম, আর একদিন সেখানে কাটাতাম। হযরতের সঙ্গে যখন আমরা যাচ্ছিলাম তখন আমাদের চোখে পড়ল একটি বড় সিদ্রা গাছ, আমরা হযরতকে বল্লামঃ "তাদের যেমন অস্ত্রশস্ত্র ঝোলাবার একটি গাছ আছে আমাদের জন্য তেমন একটি গাছ ঠিক করে দিন।" হযরত বল্লেনঃ আল্লাহু আকবর, আল্লাহ্

মহত্তম। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমরা তেমন কথা বলেছ যেমন কথা মূসার লোকেরা তাঁকে বলেছিলেন "তাদের যেমন দেবতা আছে আমাদেরও তেমন একটি দেবতা বানিয়ে দিন"। হযরত বল্লেন ঃ তোমরা একটি অজ্ঞ জাতি, তোমরা চাও তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের আচার-অনুষ্ঠানই অনুসরণ করতে।

মুসলমান সৈন্যদল হুনায়েনের উপত্যকায় এসে পৌছল। নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে তাদের মনে একটা আত্মসন্তোষের ভাব জেগেছিল। বিপক্ষের সৈন্যেরা পূর্বেই এই উপত্যকায় পৌছেছিল আর গলিঘুঁজি-গুলোতে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিল। ভোরে মুসলমান সৈন্যরা যখন এই উপত্যকায় নামছিল তখন বিপক্ষের সৈন্যদল হঠাৎ তাদের প্রবলবেগে আক্রমণ করলো। হঠাৎ এমন আক্রমণে মুসলমানদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। রসুল ডানপাশে সরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন ঃ তোমরা কোথায় যাচ্ছ, আমার কাছে এসো, আমি আল্লাহর রসুল, আমি আব্দুল্লার পুত্র মোহম্মদ। উটগুলোর একটার সঙ্গে অন্যটার ধাক্কা লাগতে লাগলো। সবাই পলায়নপর হলো, কেবল কিছু-সংখ্যক মোহাজির ও আনসার, যেমন, আবু বকর, ওমর, আলী, আল্-আব্বাস, আবু সুফিয়ান ও তার পুত্র, আল-ফযল বিন্-আব্বাস, রাবিয়া বিন্ আল্ হারিস, উসামা বিন্ যায়েদ, আর আয়মন বিন উম্ আয়মন্ তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

মুসলমান সৈন্যদলে বিপর্যয় দেখা দিলে মক্কার নতুন মুসলমানদের কেউ কেউ হযরতের প্রতি বিরূপতাসূচক দুই একটি কথা বল্লে। শায়বা বিন্ ওসমানের পিতা ওহোদ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল সে হযরতকে হত্যা করবার সংকল্প আঁটলো। কিন্তু কেমন বাধা অনুভব করলে, তাই তার সংকল্প আর কার্যে পরিণত হলো না।

আল্ আব্বাস হযরতের শ্বেত অশ্বতরের লাগামের কড়া ধরে ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল খুব উঁচু, হযরত তাঁকে এই বলে লোকদের ডাকতে বল্লেন ঃ হে আনসারগণ, হে বৃক্ষতলে অঙ্গীকার গ্রহণকারিগণ!

আল্ আব্বাসের দরাজ গলার এই ডাক শুনে আনসারেরা বলে উঠলো : এই যে আমরা হাজির। এদের মধ্যেকার একশত অনুরক্ত ভক্ত উটের দঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ করে নিল ও শত্রুদলকে রুখে দাঁড়াল। তারা অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করে চললো। অশ্বতরের উপর থেকে তাদের যুদ্ধ দেখে হযরত বল্লেন : এখন চুলো গনগনে হয়েছে—আমি রসুল, যে মিথ্যা কথা বলে না—আব্দ্ল মোত্তালেবের সন্তান। আল্ আব্বাসকে তিনি বল্লেন এক মুঠো কাঁকর তাঁর হাতে তুলে দিতে। তা তাঁর শত্রু-দলের দিকে ছুঁড়ে বল্লেন : তোমরা বিধ্বস্ত হও।

কিছুক্ষণ বিষম যুদ্ধের পর শত্রু পলায়নপর হলো। ইব্‌নে ইস্‌হাকের পিতা ইস্‌হাক বিন্ ইয়াসার বলেন : যখন দুই সৈন্যদলে যুদ্ধ হচ্ছিল তখন আকাশ থেকে যেন এক কালো পোষাক দুই দলের মধ্যে নেমে এলো ; আমি তাকিয়ে দেখলাম সমস্ত উপত্যকা কালো পিপঁড়েয় ভরে গেছে ; আমার সন্দেহ রইল না যে এরা ফেরেশতা। তার পর শত্রু পালাতে লাগলো।

হাওয়াযিন পক্ষে সাকিফ গোত্রের বহু লোক মারা যায়।

বহুদেববাদীরা যখন বিধ্বস্ত হলো তখন তারা অনেকে গেল তায়েফে, কেউ কেউ গেল নাখলায়। তায়েফে শত্রুপক্ষ প্রবলভাবে আত্মরক্ষা করে।

তায়েফের দুর্গ খুব সুরক্ষিত ছিল, ভিতরে লোকদের জন্য খাদ্যশস্যের ব্যবস্থাও ভালো ছিল। দুর্গের উপর থেকে অশ্রান্ত তীর বর্ষণ হলো। তার ফলে মুসলমান পক্ষের বারোজন মারা যায়—হযরত আবু বকরের পুত্র তাদের মধ্যে অন্যতম। এর পর তায়েফের দুর্গ থেকে গরম লোহার শিক নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। তাদের কিছুতেই কাবু করা যাচ্ছে না দেখে হযরত আদেশ দিলেন তাদের বিখ্যাত দ্রাক্ষাকুঞ্জ কেটে ফেলতে ও জ্বালিয়ে দিতে। এতে তায়েফের নাগরিকেরা হযরতের কাছে আল্লাহ্‌র নাম করে প্রার্থনা জানালো তাদের দ্রাক্ষার বাগান নষ্ট করা না হোক। হযরত দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলো ধ্বংস করা থেকে লোকদের বিরত হতে বল্লেন।

ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন : শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ রসুলকে জয় দিলেন—শত্রু বিধ্বস্ত হলো। কিন্তু মূয়র বলেছেন : অবরোধে কোনো ফল হলো না দেখে করণীয় সম্বন্ধে রসুল তাঁর প্রধান সঙ্গীদের মত চাইলেন। একজন বেদুইন নেতা বল্লে : শেয়াল গর্তে ঢুকেছে, বেশি দিন বসে থাকলে তাকে ধরতে পারা যাবে। অবরোধ উঠিয়ে সৈন্যদের নিয়ে হযরত গেলেন আল্‌জিরানায়।

বর্ণিত হয়েছে এখানে হযরতের দুধবোন বনি সা'দ গোত্রের শায়মা মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। হযরতের সামনে নীত হলে তিনি জানান যে তিনি তাঁর দুধবোন—হালিমার কন্যা। হযরত প্রমাণ চাইলে শায়মা তাঁর পিঠে একটি দাগ দেখিয়ে বলেন : ছেলেবেলায় আমি যখন আপনাকে কোলে করে রাখতাম তখন আপনি আমার পিঠের এই জায়গায় কামড়ে দিয়েছিলেন। হযরত তাঁর উক্তির সত্যতা স্বীকার করেন আর তাঁর নিজের পোষাক বিছিয়ে দেন তাঁর বসবার জন্য। হযরত তাঁকে বলেন, সসম্মানে তাঁর সঙ্গে থাকতে অথবা তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে যেতে—যা তাঁর খুশি। শায়মা তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে যেতে চান। হযরত উপহারাদি দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেন।

হুনায়েনের যুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছিল ও যেসব পশু পাওয়া গিয়েছিল হযরত সেসব একত্রিত করতে বলেছিলেন আল্‌ জিরানাতে।

হাওয়াযিনের ছয় হাজার স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল, আর অগণিত ভেড়া ও উট। হাওয়াযিন ইসলাম গ্রহণ করে' হযরতের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে অনুরোধ জানাল, চরম বিপর্যয় তাদের ভাগ্যে ঘটেছে, তাদের প্রতি হযরত দয়া করুন। হযরতের ভাগে যে সব বন্দী পড়েছিল তিনি তাদের মুক্ত করে দিলেন আর তাঁর কথায় মোহাজির ও আনসাররাও তাদের সব বন্দী মুক্ত করে দিল। কিন্তু কোনো কোনো গোত্রের লোক তাদের ভাগে যে সব বন্দী পড়েছিল তাদের ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলে। হযরত প্রত্যেক

বন্দীর জন্য তাদের ছয়টি করে উট দেবাব প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন তারা তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দিল।

ইব্‌নে ইসহাকে এই মর্মের একটি বিবৃতি আছে ঃ হযরত, আলীকে, ওসমানকে ও ওমরকে একটি করে দাসী দান করেছিলেন। ওমর তাঁর দাসী দিয়ে দেন তাঁর পুত্র আবদুল্লাকে। অন্যান্য বন্দীদের যখন মুক্তি দেওয়া হয় তখন আবদুল্লাহ তার এই দাসীটিকে মুক্তি দিয়েছিল। আলী এবং ওসমানও তেমনি ভাবে তাঁদের দুই দাসীকে মুক্তি দিয়ে থাকবেন।

হাওয়াযিন প্রতিনিধিদেব হযরত বলেন যে তাদের নেতা মালিক বিন আউফ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার পরিজন ও সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে আর এক শত উট তাকে দেওয়া হবে। মালিক আগ্রহের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে আর সাকিফদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করে।

ইব্‌নে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে ঃ হুনায়নের যুদ্ধে মালমাত্তা যা পাওয়া গিয়েছিল তা বণ্টন করে দেবার জন্য হযরতের চারদিকে লোকেরা এমন ভিড় করে যে তাঁর উত্তরীয় গা থেকে পড়ে যায়। হযরত লোকদের বলেন ঃ আমার উত্তরীয় দাও, তিহামায় যত গাছ আছে ততগুলো ভেড়া যদি তোমরা পেতে তবু সেসব আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম, আমাকে কখনো তোমরা কৃপণ অথবা ভীরু অথবা মিথ্যাপরায়ণ পাও নি।

যারা ইসলামে নতুন দীক্ষিত হয়েছিল তাদের, বিশেষ করে সেই সব দলের নেতাদের, হযরত প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান, তার পুত্র মোয়াবিয়া, হাকিম বিন হিযাম, আল হারিস বিন আল হারিস বিন কালাদা, আল হারিস বিন হিশাম, সুহায়েল বিন আমর, হুওয়ায়তিব বিন আবদুল উয্‌যা, আল-আলা বিন জারিয়া, উয়ায়না বিন হিস্‌ন্‌, আল-আকরা বিন হাবিস আল তামিমি, মালিক বিন আউফ আল নাসরি, সাফওয়ান বিন উমাইয়া—এদের প্রত্যেককে হযরত একশ'টি করে উট দেন।

এইসব কোরেশের প্রত্যেককে হযরত একশ'টির কম উট দেন ঃ

মাখরামা বিন নওফল, উমের বিন ওহব, হিশাম বিন আমর, প্রভৃতি। এই কয়জনের প্রত্যেককে তিনি ৫০টি করে উট দেন : সাইদ বিন ইয়ারবু ও আল-সাহমি।

আববাস বিন মির্দাসকে তিনি কয়েকটি উট দেন ; কিন্তু তাতে সে অসন্তুষ্ট হয়। হযরত তাকে আরো উট দিয়ে সন্তুষ্ট করেন।

ইব্‌নে ইসহাকে আছে হুনায়ানে হযরতের পাশে উটে করে যাচ্ছিল তার একজন সঙ্গী। হযরতের উটের সঙ্গে তার উটের ধাক্কা লাগে, আর তার জুতোর আগার আঘাত লাগে হযরতের পায়ের নলায়। হযরত তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে তার পায়ে আঘাত করে বলেন : আমাকে আঘাত দিচ্ছ, পিছে হটো। সঙ্গী পিছে হটে যায়। পর দিন ভোরে হযরত তাকে ডাকালেন, সে ভাবল পূর্ব দিন আঘাত দেবার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু হযরত তাকে বল্লেন : কাল তুমি আমার পায়ে আঘাত দিয়েছিলে আর আমি ছড়ি দিয়ে তোমার পায়ে মেরেছিলাম। আমি তোমাকে ডেকেছি তার ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য। এই বলে তিনি সেই সঙ্গীকে আশিটি উষ্ট্রী দিলেন।

কোরেশ ও বেদুইনদের মধ্যে এমনভাবে পুরস্কার বিতরণের ফলে আনসাররা অসন্তুষ্ট হল ও এ নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। একজন বল্লে : আল্লাহর শপথ, রসুল এখন তাঁর নিজের লোকদের পেয়েছেন। সা'দ বিন্ উবাদা হযরতের কাছে এসে এইসব কথা জানালেন। হযরত সা'দকে জিজ্ঞাসা করলেন : সা'দ, এ ব্যাপারে তোমার কি মত ? সা'দ বল্লেন : আমাদের লোকদের মত যা আমরাও মত তাই। হযরত আনসারদের ডাকালেন ; তাদের সঙ্গে কিছু-সংখ্যক মোহাজিরকেও আসতে দেওয়া হলো। হযরত প্রথমে আল্লাহর গুণগান করলেন, ও তাঁর প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে এই ভাষণ দিলেন : হে আনসার, তোমাদের সম্বন্ধে এ কি শুনছি ? তোমরা কি তোমাদের অন্তরে আমাকে মন্দ জান ? তোমরা যখন ভ্রান্ত ছিলে তখন কি আমি তোমাদের কাছে আসি নি, আর আল্লাহ তোমাদের কি চালিত করেন নি ঠিক পথে ? তোমরা ছিলে নিঃস্ব,

আল্লাহ তোমাদের করলেন ধনী, তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু, আল্লাহ তোমাদের হৃদয় কোমল করলেন। আনসার উত্তর দিলেঃ হাঁ তাই, আল্লাহ ও তাঁর রসুল পরমসদয়—বদান্য। হযরত বল্লেনঃ যদি তোমরা ইচ্ছা করতে তবে তোমরা (আমার সম্বন্ধে) বলতে পারতে—আর সেটি তোমাদের তরফ থেকে ঠিক কথা বলাই হতো—আপনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন মর্যাদাহীন হয়ে, আর আমরা আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম; এসেছিলেন পরিত্যক্ত হয়ে, আর আমরা আপনাকে সাহায্য করেছিলাম; এসেছিলেন শরণার্থী হয়ে, আর আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম; এসেছিলেন নিঃস্ব হয়ে আর আমরা আপনার সুখ-সুবিধার আয়োজন করেছিলাম। সংসারের জীবনে যা সব লোকে কামনা করে তারই কিছু দিয়ে আমি কিছু লোকের হৃদয় জয় করতে চেয়েছি, যেন তারা মুসলমান হতে পারে, আর তোমরা ইসলামে দৃঢ়চিত্ত এই আমি ভেবেছি—এর জন্যই কি তোমাদের মনে ক্ষোভের উদয় হয়েছে? তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে অন্যেরা নিয়ে যাক ভেড়ার পাল উটের পাল আর তোমরা সঙ্গে নিয়ে যাও আল্লাহর রসুলকে? যাঁর হাতে মোহম্মদের জীবন তাঁর শপথ, যদি মোহাজিররা না থাকতো তবে আমি নিজে একজন আনসার হয়ে যেতাম। যদি সব লোক এক পথে যায় আর আনসাররা যায় অন্য পথে তবে আমি আনসারদের পথই নেবো। আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক আনসারদের উপরে আর তাদের পুত্রদের ও তাদের পুত্রদের উপরে। হযরতের কথায় লোকদের চোখে পানীর ধারা বইল—তাদের দাড়ি ভিজে গেল। তারা বল্লেঃ আমাদের অদৃষ্টে ও আমাদের ভাগে যে পড়েছেন আল্লাহর রসুল তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। এরপর রসুল চলে গেলেন; লোকেরাও চলে গেল।

ওম্‌রা (ছোটো হজ) করার জন্য হযরত আল-জিরানা থেকে রওনা হন এই নির্দেশ দিয়েঃ যুদ্ধে লব্ধ অবশিষ্ট যা আছে তা মাররুল-যাহরান-এর নিকটবর্তী মাজান্নায় জমা রাখতে হবে। ওমরা করার পর তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। মক্কার শাসনভার তিনি রেখে আসেন

আত্তাব বিন আসিদ-এর উপরে, আর মক্কার লোকদের ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য সেখানে রেখে আসেন মোয়ায বিন জব্‌ল্‌কে। বর্ণিত হয়েছে মক্কার শাসকরূপে আত্তাবকে দেওয়া হতো রোজ এক দিরহাম হিসাবে। এই শাসনভার পেয়ে আত্তাব বলেনঃ আল্লাহ তার কলিজাকে ভুখা করুন যে ভুখা থাকে রোজ এক দিরহাম পেয়ে। রসুল আমাকে রোজ এক দিরহাম করে দিয়েছেন—আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

রসুল মদিনায় ফেরেন যুলহিজ্জা মাসের শেষের দিকে।

রসুল সেই বৎসর হজ্‌ করেন আরবদের চিরাচরিত ধারায়।

পত্নীদের সঙ্গে হযরতের সাময়িক বিচ্ছেদ

আনুমানিক নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয় সূরা আত্‌-তাহরিম (নিষিদ্ধ করা); তার সূচনার কয়েকটি আয়াত এইঃ

হে নবী, কেন তুমি (নিজের জন্য) তা নিষিদ্ধ করেছ যা আল্লাহ তোমার জন্য বৈধ করেছেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশী করতে চাও; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল কৃপাময়।

আল্লাহ্‌ নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন তোমাদের শপথ-গুলো থেকে মুক্তির উপায় আর আল্লাহ তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু; আর তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

আর যখন পয়গাম্বর তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি সংবাদ দিয়েছিলেন, আর যখন তিনি (সেই স্ত্রী) পরে তা প্রকাশ করেছিলেন, আর আল্লাহ তাঁকে (পয়গাম্বরকে) তা জানিয়েছিলেন, তিনি (পয়গাম্বর) জানিয়েছিলেন তার একটি অংশ আর চেপে গিয়েছিলেন অন্য একটি অংশ, ফলে, যখন তিনি (পয়গাম্বর) তাঁকে (স্ত্রীকে) সে সম্বন্ধে বলেছিলেন তখন তিনি (স্ত্রী) বলেছিলেনঃ কে আপনাকে এই সংবাদ দিয়েছে? তিনি বলেছিলেনঃ (যিনি) জ্ঞাতা ওয়াকিফহাল তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন।

যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর দিকে ফেরো (অনুতপ্ত হয়ে)—কেন না

তোমাদের হৃদয় চেয়েছিল (নিষিদ্ধ করা) ; আর যদি তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করো তাঁর (পয়গাম্বরের) বিরুদ্ধে, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ—হাঁ তিনি—তাঁর রক্ষাকারী বন্ধু, আর জিব্রিল, আর বিশ্বাসীরা যারা সৎকর্মশীল, আর তাদের পরে ফেরেশতারা, তাঁর সাহায্যকারী।

হতে পারে তাঁর পালয়িতা, যদি তিনি তোমাদের তালাক দেন, তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে দেবেন তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী—আত্মসমর্পিতা, বিশ্বাসিনী, বিনতা, অনুতাপকারিণী, উপাসনারতা, রোযাপালনকারিণী, বিধবা এবং কুমারী।

হযরত নিজের জন্য কি নিষিদ্ধ করেছিলেন সে সম্বন্ধে হাদিসে এইসব বিবরণ আছেঃ (১) হযরত মধু খুব ভালবাসতেন। তাঁর পত্নীদের একজন এক আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু মধু পেয়েছিলেন। সেই মধুপান সম্পর্কে হযরত তাঁর গৃহে কিছু বেশি সময় কাটাতেন। এতে তাঁর অন্য পত্নীরা খুশী হন না। তাঁরা হযরতকে বিব্রত করার এক ফন্দি আঁটেন। একদিন হযরত এমনি মধুপান করে' বিবি আয়েশার গৃহে এলে তিনি বল্লেন ঃ হযরত, আপনার কাছ থেকে 'মাগাফির'-এর উগ্র গন্ধ পাচ্ছি। হযরত বল্লেন ; তিনি মধুপান করে এসেছেন। বিবি আয়েশা বল্লেন ঃ হতে পারে মৌমাছি 'মাগাফির' থেকে মধু নিয়েছিল। উৎকট গন্ধের প্রতি হযরতের খুব বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন আর মধুপান করবেন না।

অন্য বিবরণ এই ঃ

বিবি হাফ্‌যা একদিন দেখেন হযরত বিবি মারিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘরে রয়েছেন। সেদিন ছিল বিবি আয়েশার গৃহে তাঁর বাসের পালা। বিবি হাফ্‌যা এতে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেন। (দাসীরূপে আগতা মারিয়ার যে পদগৌরব ও সমাদর লাভ হয়েছে এতে হযরতের অন্য পত্নীরা ঈর্ষান্বিতা হয়েছিলেন)। হযরত তাঁকে এই কথা বিবি আয়েশাকে বলতে নিষেধ করেন আর প্রতিজ্ঞা করেন যে বিবি মারিযার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। কিন্তু হাফ্‌যা বিবি আয়েশাকে এই কথা বলে দেন।

তৃতীয় বিবরণটি এই ঃ

কোরআনের বাণীতেই আরবের নারীরা মর্যাদা ও অধিকার পায় ; এর পূর্বে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। একদিন হযরত ওমরের পত্নী তাঁর কোনো কাজ সম্পর্কে বলেন কি তাঁর (স্বামীর) করা উচিত, কি অনুচিত। তাতে ওমর বলেন ঃ আমি কি করবো না করবো তাতে তোমার কথা বলা কেন ? তখন তাঁর পত্নী বলেন, তাঁর কন্যা হাফ্‌যা আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গেও কথা কাটাকাটি করে। তাতে ওমর শঙ্কিত হন ও তৎক্ষণাৎ গিয়ে কন্যাকে ভৎসনা করেন। হযরতের অন্য পত্নী বিবি উম্মে সালমাকেও তিনি এই ধরনের কথা বলেন। তাতে তিনি বলেন ঃ রসুল ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যেকার ব্যাপারে আপনি কথা বলতে আসেন কেন ?—এর কিছুদিন পরে হযরত নিজেকে তাঁর পত্নীদের সংশ্রব থেকে কিছুকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করেন। *

হযরত ও তাঁর পত্নীদের মধ্যে এই সাময়িক বিচ্ছেদ সম্বন্ধে ভাই গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ

এই বৎসর (নবমহিজরিতে) হযরত মোহম্মদের পরিবারবর্গ এমন কোন পরিচ্ছদ ও দ্রব্য সামগ্রী চাহেন যে, হজরত তাহা জোগাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, তাহাতে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া গৃহে বসিয়াছিলেন। আবুবেকর ও ওমর তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া দুঃখিত হন। ওমর বলেন, "প্রেরিত পুরুষ, আমার স্ত্রী এক সময়ে এমন কোনো বস্তু চাহিয়াছিল যাহা আমার প্রদান করার সাধ্য ছিল না, আমি উঠিয়া তাহার স্কন্ধে আঘাত করি, তাতে সে নিবৃত্ত হয়। আপনি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল ছিল।" হজরত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি ইহাদের স্কন্ধে আঘাত করিব কি, ইহারা আমার স্কন্ধের উপর চড়িয়া বসিয়াছে, আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত ধন চাহিতেছে।" এতদশ্রবণে আবুবেকর ব্যথিত হইয়া আপন কন্যা আয়েশার গ্রীবাদেশে মুষ্ট্যাঘাত করেন, তদ্রূপ ওমরও স্বীয় দুহিতা হাফজাকে প্রহার করেন, এবং

* মার্মাডিউক পিকথলের কোরআনের অনুবাদ দ্রষ্টব্য

তাঁহাদিগকে ধমকাইয়া বলেন যে, "হজরতের ক্ষমতার অতিরিক্ত এমন কিছু তাঁহার নিকটে চাহিবে না। তখন তাঁহারা শপথপূর্বক অঙ্গীকার করেন যে, "আমরা আর হযরতের মনে এরূপ কষ্ট দিব না।" মহাপুরুষ মোহম্মদ একমাস পর্যন্ত পত্নীবর্গের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরের উপর তলে নির্জনে স্থিতি করেন। বন্ধুদিগের কাহাকেও আসিতে দেন না। নগরে এইরূপ জনরব হয় যে তিনি সহধর্মিণীবর্গকে বর্জন করিয়াছেন। একদিন ওমর বহু চেষ্টায় অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি পত্নীবর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? হযরত বলিলেন "না, করি নাই।" তাহাতে ওমর মহা আনন্দে আল্লাহু আকবর ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ঊনত্রিশ দিন গত হইলে হজরত মোহম্মদ প্রথমতঃ আয়েশার গৃহে উপস্থিত হন। আয়েশা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলেন, 'প্রেরিতপুরুষ, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এক মাস আমাদের নিকটে আসিবেন না, এক মাস তো পূর্ণ হয় নাই।" হযরত বলিলেন, "কোন কোন মাস ঊনত্রিশ দিনে পূর্ণ হয়, এই মাস ঊনত্রিশ দিনে পূর্ণ হইয়াছে।"

এই বিচ্ছেদের পরে পুনর্মিলন সম্পর্কে হযরত এই বাণী লাভ করেন:

তুমি মুলতবী রাখতে পারো তাকে (তার পালা) যাকে তোমার খুশী আর তোমার জন্য গ্রহণ করতে পারো যাকে তোমার খুশী, আর যাদের তুমি (সাময়িকভাবে) বিচ্ছিন্ন করেছিলে তাদের যাকে তোমার খুশী—কোনো দোষ তোমার হবে না; আর এই সব চাইতে ভাল যেন তাদের চোখ স্নিগ্ধ হতে পারে, আর তারা দুঃখ না করে; আর তারা খুশী হবে, তারা সবাই, তুমি তাদের যা দিচ্ছ তাতে। আল্লাহ জানেন কি আছে তোমাদের অন্তরে, আর আল্লাহ জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

এর পরে অন্য নারীদের গ্রহণ করা তোমার জন্য বৈধ হবে না, তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীদেরও গ্রহণ করবে না যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে—যাদের তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করে তারা ব্যতীত। আর আল্লাহ সব ব্যাপারের উপরে প্রহরী। (৩৩ : ৫১, ৫২)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাবুক অভিযান

ইব্‌নে ইসহাকে আছে : নবম হিজরীর যুল্‌হিজ্জা থেকে রজব মাস পর্যন্ত মদিনায় অবস্থিতি করে রসুল রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযানের আদেশ দেন। সংবাদ পৌঁছেছিল রোমকদের ও তাদের অনুগত বহু উপজাতির এক বিরাট সৈন্যদল মুসলমানদের আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এই সময় ছিল গ্রীষ্মকাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রসুল মুসলমান-দের আদেশ দিলেন রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে। মক্কার লোক, মদিনার লোক, মরুভূমির লোক, মরুভূমির বেদুইনরা, সবাইকে হযরত আহ্‌বান করেছিলেন এই যুদ্ধের জন্য। ইব্‌নে ইসহাকে আছে : অত্যন্ত গরম পড়েছিল; জলাভাবে সব শুকিয়ে যাচ্ছিল; ফল পাকছিল; আর লোকেরা চাচ্ছিল সেই ফলসম্ভার নিয়ে ছায়ায় তাঁরা বাস করবে, আর আগ্রহ বোধ করছিল না এমন সময়ে দূরের পথে যাত্রা করতে। এর পূর্বে হযরত সাধারণতঃ কোথায় অভিযান করতে যাচ্ছেন তা গোপন রাখতেন। কিন্তু এবার তিনি স্পষ্টই বল্লেন তিনি অভিযান করছেন দূরের রোমকদের বিরুদ্ধে—এই সময় কষ্টকর, আর শত্রু সংখ্যায় অনেক, সেজন্য লোকদের যোগ্যভাবে প্রস্তুত হওয়া চাই। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকেরা প্রস্তুত হলো।

এই (তাবুক) অভিযান সম্বন্ধে কোরআনে বলা হয়েছে :

হে বিশ্বাসিগণ, কি তোমাদের হয়েছে যে যখন তোমাদের বলা হচ্ছে : আল্লাহ্‌র পথে বেরিয়ে পড়ো, তখন তোমরা ভারি হয়ে ঝুঁকছো মাটির দিকে? সন্তুষ্ট কি তোমরা এই দুনিয়ার জীবনে? পরলোকের পরিবর্তে? কিন্তু পরলোকের সঙ্গে তুলনায় এই দুনিয়ার ধনসম্পদ যৎসামান্য। (৯ : ৩৮)।

বেরিয়ো পড়ো, হাল্কা অস্ত্র নিয়েও ভারী অস্ত্র নিয়ে, আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো তোমাদের ধনসম্পত্তি ও তোমাদের জীবন দিয়ে, তাই তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা বোঝো।

যদি এটি হতো কাছের ব্যাপার আর অল্প দিনের সফর তবে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুগামী হতো, কিন্তু দূরত্ব তাদের মনে হয়েছিল খুব কষ্টদায়ক ; আর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে ঃ যদি আমরা পারতাম তবে নিশ্চয়ই আমরা যাত্রা করতাম তোমাদের সঙ্গে। তারা তাদের নিজেদের অন্তরাত্মার ধ্বংস সাধন করছে, আর আল্লাহ্‌ জানেন তারা নিঃসন্দেহ মিথ্যাবাদী। (৯ ঃ ৪১—৪২)।

আর যদি তারা যাত্রা করবার ইচ্ছা করতো তবে নিশ্চয় তার জন্য সরঞ্জাম তারা জোগাড় করতো ; কিন্তু আল্লাহ্‌ চান নি তাদের যাওয়া, সেজন্য তাদের ঠেকিয়েছেন, আব (তাদের) বলা হলো ঃ যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বসে থাকো।

যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যেত তবে তোমাদের বিঘ্ন বাড়ানো ভিন্ন আর কিছু করতো না, আর তোমাদের মধ্যে এদিক থেকে ওদিকে ফিরতো তোমাদের মধ্যে বিদ্রোহ কামনা কোরে, আর তোমাদের মধ্যে তারা আছে যারা তাদের কথা শুনতো ; আল্লাহ্‌ অন্যায়-কারীদেব জানেন। (৯ ঃ ৪৬—৪৭)।

কিন্তু হযরত লোকদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য আদেশ দেন বিলম্ব না করে'। তিনি লোকদের বলেন আল্লাহ্‌র কাজে অর্থ ও বাহন দান করতে। এই প্রস্তুতিতে ওমর দেন তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক, আবু বকর দেন তাঁর যা-কিছু ছিল সব, আর ওসমান দেন এক হাজার উট ও সত্তরটি অশ্ব এসবের সরন্‌জাম সমেত, আর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

তাবুকের অভিযানে হযরতের যেসব অনুবর্তী রওনা হতে গড়িমসি করেছিল তাদের কথা বলা হয়েছে। যারা নিঃস্ব হয়েও এই অভিযানে যোগদান করবার জন্য অশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিল তাদের কথাও কোর্‌-আনে বলা হয়েছে ঃ

তাদের মধ্যে (দোষ) নেই যারা যখন তোমার কাছে এসেছিল যেন তুমি তাদের নিয়ে যেতে পারো, তুমি বলেছিলে ঃ তোমাদের যার উপরে নিয়ে যাব তা আমি পাচ্ছি না। তারা চলে গিয়েছিল অশ্রুপূর্ণ চোখে যা ব্যয় করবে তা না পাওয়ার দুঃখের জন্য। (৯ ঃ ৯২)।

যারা যাত্রা করতে দেরি করেছিল তাদের মধ্যে ছিল আবু কায়সামা। হযরতের রওনা হয়ে যাবার পরে সে এক গরমের দিনে তার পরিজনের কাছে এলো। সে তার দুই স্ত্রীকে পেল তার বাগানে তাদের কুঁড়েতে। প্রত্যেকে তার ঘরে জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখেছিল আর খাবার তৈরি রেখেছিল। সে তার স্ত্রীদের আদর-যত্ন দেখে বল্লে ঃ রসুল চলেছেন রোদ আর গরম বাতাসের মধ্যে আর আবু কায়সামা আছে ঠাণ্ডা ছায়ায়, তার জন্য খাবার তৈরি আর সে বিশ্রাম-সুখ ভোগ করছে সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে। এ ঠিক নয়, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তোমাদের ঘরে ঢুকবো না, বরং যোগ দেব রসুলের সঙ্গে, সেজন্য আমার জন্য কিছু খাবার তৈরি করে দাও। সে তাবুকে গিয়ে হযরতের সঙ্গে মিলিত হয়। সে হযরতকে গিয়ে অভিবাদন করে ও তাঁকে সব কথা বলে। হযরত তাকে আশীর্বাদ করেন। পথে হযরতের উট হারিয়ে যায়। তাতে একজন কপট বলে ঃ মোহম্মদ কি বলেন যে তিনি তোমাদের আকাশের খবর বলতে পারেন যখন তিনি জানেন না তাঁর উটটি কোথায়? এ সম্বন্ধে হযরত বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ, আমি কেবল তাইই জানি যা আল্লাহ্ বলেছেন; উটটি কোথায় তা তিনি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন, সেটি আছে এই উপত্যকার অমুক গলিতে—একটি গাছে তার রশি আটকে গেছে, গিয়ে তা নিয়ে এসো। লোকেরা গিয়ে তা আনলো। হযরত তাবুকে পৌছলে আয়লার শাসনকর্তা য়ুহান্না বিন্ রু'বা এসে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে ও জিযিয়া দেয়। জার্‌বা এবং আয়রুহ্-র লোকেরাও এসে জেযিয়া দেয়। হযরত তাদের একটি লিখিত সনদ দেন, তাতে তাদের ও তাদের জাহাজের ও কাফেলার জন্য নির্বাধ গমনাগমনের অধিকার দেওয়া হয়। অন্যান্য

শাসককেও তুল্যভাবে সনদ দেওয়া হয়।

হযরত তাবুকে দশ রাত্রি অবস্থান করেন। তাবুকে কোনো যুদ্ধ হয় নি। তার পর তিনি মদিনায় ফেরেন।

ফিরবার পথে হযরতের আদেশে এক অসৎ-উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ্ ধ্বংস করা হয়। এ-সম্বন্ধে কোরআনে উক্ত হয়েছে ঃ

আর যারা একটি মসজিদকে গ্রহণ করেছিল বিরুদ্ধতা ও অবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হোয়ে আর বিশ্বাসীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টির জন্য আর তাদের আশ্রয়স্থলরূপে যারা এর পূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল : তারা নিঃসন্দেহে শপথ করবে, আমরা ভাল ভিন্ন আর কিছু চাই নি, আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা নিঃসন্দেহ মিথ্যাবাদী।

কখনো তাতে দাঁড়াবে না (উপাসনার জন্য), নিঃসন্দেহ যে মসজিদ্ সীমারক্ষার উপরে স্থাপিত প্রথম দিন থেকে তার বেশি দাবি আছে যে তুমি সেখানে দাঁড়াবে ঃ তাতে লোক আছে যারা ভালোবাসে যে তারা পবিত্র হবে, আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা নিজেদের পবিত্র করে।

যে তার দালান গড়েছে আল্লাহ্‌র সীমারক্ষার উপরে আর (তাঁর) প্রসন্নতার উপরে সে ভালো, না, সে যে তার দালান গড়েছে ফাটল-ধরা তলা-খয়ে-যাওয়া কিনারার উপরে, ফলে তা তাকে নিয়ে ভেঙে পড়লো জাহান্নামের আগুনে? আর আল্লাহ্ পথ দেখান না অন্যায়কারী লোকদের। (৯ ঃ ১০৭—১০৯)।

যারা তাবুক অভিযানে যোগদান না করে' ইচ্ছা করে, মদিনায় রয়ে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে হযরত ও তাঁর অনুবর্তিগণ পঞ্চাশ দিন কথাবার্তা বলেন নি। তাতে তারা খুব মনঃকষ্ট ভোগ করে। তার পর তাদের সম্বন্ধে এই বাণী অবতীর্ণ হয় ঃ

নিশ্চয় আল্লাহ্ ফিরেছেন (করুণায়) নবীর প্রতি আর মোহাজির্ ও আনসারদের প্রতি যারা তাঁর অনুবর্তী হয়েছিল কষ্টের দিনে

তাদের একদলের মন যখন প্রায় বেঁকে গিয়েছিল—তার পর তিনি তাদের দিকে ফিরলেন (করুণায়), নিঃসন্দেহ তিনি তাদের প্রতি দয়াল, ফলদাতা। (৯ঃ ১১৭)।

সাকিফের প্রতিনিধিদের ইসলাম গ্রহণ

হযরত তাবুক থেকে ফেরেন রমযান মাসে। সেই মাসেই তাঁর কাছে আসে সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দল।

এর পূর্বে হযরত যখন সাকিফদের কাজ থেকে চলে এসেছিলেন তখন সাকিফ গোত্রের উরওয়া বিন মাসুদ হযরতের মদিনায় প্রত্যাগমনের পূর্বেই তাঁর কাছে পৌঁছে যায় ও ইসলাম গ্রহণ করে। সে মুসলমান হয়ে ও মুসলমানরূপে তার লোকদের কাছে ফিরে যেতে চাইলে হযরত বলেন ঃ তারা তোমাকে মেরে ফেলবে, কেন না, তিনি জানতেন সাকিফদের উদ্ধত প্রকৃতি। উর্‌ওয়া বলে ঃ তার লোকেরা তাকে খুব ভালবাসে।

তার লোকেরা তাকে মেরেফেলে। এরপর কিছু দিন দেরি করে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে চতুর্দিকের ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকারকারী ও ইসলাম-অবলম্বী আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা পেরে উঠবে না।

এর পূবে উরওয়ার যে দশা হয়েছিল সেই কথা ভেবে কেউই একলা প্রতিনিধি হবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হলো না। শেষে কয়েকজন সঙ্গে করে কূটনীতিজ্ঞ আব্‌দু ইয়ালিল মদিনার অভিমুখে রওনা হল। আবু বকর তাদের হযরতের কাছে নিয়ে এলেন, নিয়ে আসবার পূর্বে তিনি তাদের শিখিয়ে দিলেন কিভাবে হযরতকে অভিবাদন করতে হবে। তারা এলে হযরত মসজিদের কাছে তাদের জন্য এক তাঁবু খাটিয়ে দেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু তারা চায় যে তাদের ঠাকুর আল-লাতকে তিন বৎসর অটুট রাখা হবে। হযরত তাতে স্বীকৃত হন না। কমাতে কমাতে তারা এক মাসের সময় চায়, কিন্তু হযরত তাতেও রাজি হন না। হযরত আবু সুফিয়ানকে ও আল্ মুগিরা বিন শু'বাকে লাতের মূর্তি ধ্বংস

করতে পাঠান, কেন না সাকিফ প্রতিনিধিরা বলেছিল, তারা নিজেদের হাতে তাদের ঠাকুর ধ্বংস করতে পারবে না। কিন্তু তারা যখন নামায পড়া থেকে রেহাই চায় তখন হযরত তাতে অস্বীকৃত হন, বলেন ঃ যে ধর্মে প্রার্থনা নেই সে ধর্ম অর্থহীন।

যাঁকে সাকিফদের ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্য পাঠানো হয়েছিল তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নামায় দীর্ঘ না করতে—সমবেত উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে যারা সব চাইতে দুর্বল তাদের দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা করতে।

হযরত রমযান মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো ও শাওয়াল ও যুলকাদা মাস মদিনায় অবস্থিতি করলেন। তারপর তিনি আবু বকরকে পাঠালেন হজযাত্রীদের নেতা করে'।

অব্যাহতি ঘোষণা

আবু বকরের রওনা হয়ে যাবার পরে অবতীর্ণ হয় সূরা তওবা বা আল্‌-বরাআত, অর্থাৎ অব্যাহতি, তাতে যেসব নির্দেশ লাভ হয় তার কিছু অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ

আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে সব লোকের প্রতি ঘোষণা বড় হজের দিনে এই মর্মে যে, আল্লাহ্‌ বহুদেববাদীদের কাছে দায় থেকে নির্মুক্ত আর তাঁর রসূলও। সেজন্য তোমরা যদি অনুশোচনা করো—সেটি হবে তোমাদের জন্য ভালো ; কিন্তু যদি তোমরা ফিরে আসো, তবে জেনো, তোমরা আল্লাহ্‌কে এড়িয়ে যেতে পারবে না। আর সংবাদ দাও (হে মোহম্মদ) তাদের জন্য কঠিন শাস্তির যারা অবিশ্বাস করে—

সেইসব বহুদেববাদী ব্যতীত যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি আছে আর যারা তখন থেকে কোনো বিষয়ে তোমাদের ক্ষতি করে নি আর কাউকে তোমাদের বিরুদ্ধে সমর্থন দেয় নি সেজন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি পালন করো নির্ধারিত কাল পর্যন্ত ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন তাদের যারা সীমা রক্ষা করে।*

* লক্ষ্য করবার আছে, অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষের আসল কারণ অবিশ্বাসীদের ধর্ম-বিশ্বাস নয়, সেই কারণ হচ্ছে মুসলমানদের উপরে তাদের নির্যাতন আর সন্ধির শর্ত পালনে তাদের অনিচ্ছা।

সেজন্য পবিত্র মাসগুলো যখন গত হয়ে যাবে, তারপর বহুদেব-বাদীদের সংহার করো যেখানে তাদের পাও, আর তাদের বন্দী করো, আর তাদের ঘেরাও করো, আর তাদের জন্য লুকিয়ে থাকো প্রত্যেক লুকোবার স্থানে, তার পর যদি তারা অনুতাপ করে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ তাদের জন্য মুক্ত করে দাও ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

আর যদি বহুদেববাদীদের কেউ তোমাদের আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দাও যেন সে আল্লাহ্‌র বাণী শোনে, তারপর তাকে তার নিরাপত্তার স্থানে পৌঁছে দাও : এটি এই জন্য যে তারা হচ্ছে একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়।*

বহুদেববাদীদের জন্য কেমন করে সন্ধি হতে পারে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ও তাঁর রসুলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ভিন্ন যাদের সঙ্গে তোমরা সন্ধি করেছিলে পবিত্র মসজিদে। সে জন্য যে পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত (সে পর্যন্ত) তোমরা তাদের প্রতি বিশ্বস্ত হও, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা সীমা রক্ষা করে।

কেমন কোরে (এটি হবে) যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে উপরহাত হতে পারলে তারা তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অথবা সন্ধির কথা ভাববে না ? তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করে তাদের মুখ দিয়ে, কিন্তু তাদের হৃদয় অস্বীকার করে, আব তাদের অনেকে দুষ্কৃতিকারী।

তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ দিয়ে সামান্য লাভই কিনেছে ; সেজন্য তারা (লোকদের) তাঁর পথ থেকে বাধা দেয়, নিঃসন্দেহ তারা যা করে তা গর্হিত।

*এই মর্মেব হাদিস আছে যে অব্যাহতি ঘোষণার পবে হযবত আলীকে একজন বহুদেববাদী জিজ্ঞাসা কবেছিল, তাবা যদি ইসলাম-ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে হযরত মোহম্মদেব কাছে যায় বা অন্য কাজের জন্য যায় তবে তাদেব হত্যা করা হবে কিনা, তার উত্তবে হযরত আলী বলেছিলেন—না ; বলে' তিনি এই আয়াত উদ্ধৃত করেছিলেন। এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সেল (Sale) বলেছেন : তাকে (বহুদেববাদীকে) নিরাপদে তার স্থানে পৌঁছে দিতে হবে যদি সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে না চায়।

একজন বিশ্বাসীর বেলায় তারা আত্মীয়তার বন্ধন অথবা সন্ধির দিকে দৃষ্টি দেয় না ; এরাই তারা যারা সীমা লঙ্ঘনকারী। (৯ ঃ ৩-১০)

আর যদি সন্ধির পরে তারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ও তোমাদের ধর্মের কুৎসা করে তবে অবিশ্বাসের নেতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো—নিঃসন্দেহ তাদের প্রতিজ্ঞা কিছু নয়—যেন তারা বিরত হতে পারে। (৯ ঃ ১২)।

বহুদেববাদীদের কোনো অধিকার নেই আল্লাহ্‌র মসজিদগুলো দেখাশোনা করবার যখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয় ; এরাই তারা যাদের সব কাজ বৃথা হয়েছে ; আর তারা স্থায়ীভাবে বাস করবে আগুনে।

সে-ই আল্লাহর মসজিদগুলো দেখাশোনা করবে যে আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস করে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর যাকাত দেয়, আর কাউকে ভয় করে না আল্লাহ ভিন্ন। এদের পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে যে এরা ঠিক পথে চালিত হবে।

কী, তীর্থযাত্রীদের খাবার পানী দেওয়া আর পবিত্র মসজিদ দেখা-শোনা করা—একে কি তোমরা তুল্য জ্ঞান করো তার যে আল্লাহতে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে আর আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে ? এরা তুল্য নয় আল্লাহর কাছে, আর আল্লাহ তাদের পথ দেখান না যারা অন্যায়কারী (৯ ঃ ১৭—১৯)।

হে বিশ্বাসিগণ, বহুদেববাদিগণ অপরিচ্ছন্ন ভিন্ন আর কিছু নয়,* সেজন্য এই বৎসরের পরে তারা পবিত্র মসজিদে আসতে পারবে না ; আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় করো তবে আল্লাহ তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে যদি তিনি ইচ্ছা করেন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

যুদ্ধ করো তাদের সঙ্গে—যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না, শেষদিনেও না, যারা নিষেধ করে না যা আল্লাহ আর তাঁর রসুল নিষিদ্ধ করেছেন,

* তারা উলঙ্গ হোয়ে কাবা প্রদক্ষিণ করতো।

সত্য ধর্মও অনুসরণ করে না—তাদের থেকে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে—যে পর্যন্ত না তারা জেযিয়া দেয় প্রাধান্য মেনে আর অধীন হোয়ে। (৯ঃ ২৮-২৯)।

এই সূরাটি সম্বন্ধে পরে (অনুবৃত্তিতে) আমরা আলোচনা করবো।

তাবুক অভিযান সম্পর্কে যেসব নির্দেশ এতে আছে সেসবের কিছু কিছু উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

আবদুল্লা বিন উবাইয়ের মৃত্যুর পরে তার জন্য প্রার্থনা করা সম্বন্ধে এই সূরাতে যে আয়াতটি আছে সে সম্পর্কে ওমর বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু হলে রসুলকে অনুরোধ করা হলো তার জন্য জানাজা (পারলৌকিক সদগতির জন্য প্রার্থনা) পড়তে। হযরত গিয়ে যখন তার লাশের পাশে দাঁড়ালেন জানাজা পড়ার জন্য তখন আমি আমার স্থান থেকে হযরতের সামনে গিয়ে বল্লাম ঃ আপনি কি আল্লাহর শত্রু আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের জানাজা পড়তে যাচ্ছেন ? আমি অনেক কথা বল্লাম তাতে হযরত হেসে বল্লেন ঃ ওমর, আমার পেছনে দাঁড়াও, আমাকে বাছাই করতে বলা হয়েছে, আর আমি বেছে নিয়েছি। আমাকে বলা হয়েছে ঃ

(হে মোহম্মদ) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা না করো, যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর সত্তর বার, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না, এটি এই জন্য যে তারা আল্লাহতে আর তাঁর রসুলে অবিশ্বাস করেছিল, আর আল্লাহ দুষ্কৃতিকারীদের পথ দেখান না।

যদি আমি জানতাম যে সত্তর বারের বেশি প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে তবে আমি তা করতাম। এরপর হযরত তার জন্য প্রার্থনা করলেন আর তার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন যে পর্যন্ত না তাকে মাটি দেওয়া হলো। যে সম্বন্ধে আল্লাহ আর তাঁর রসুল ভাল জানেন সে সম্বন্ধে আমার এই দুঃসাহস লক্ষ্য করে আমি নিজের প্রতি বিস্মিত হয়েছিলাম। এর অল্পকাল পরেই এই বাণী অবতীর্ণ হয় ঃ

আর তাদের কারো জন্য প্রার্থনা কোরো না তাদের কেউ মরলে,

আর তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবে না, নিঃসন্দেহ তারা আল্লাহতে আর তাঁর রসুলে অবিশ্বাস করে, আর তারা মরবে দুষ্কৃতিকারীরূপে।

ইবনে ইসহাক বলেছেনঃ হযরতের মক্কা বিজয়, আর তাবুক অভিযান আর সাকিফ গোত্রের তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকারের পরে আরবের দিগদিগন্ত থেকে তাঁর কাছে প্রতিনিধি-দল আসে। আরবরা প্রতীক্ষা করছিল কোরেশের সঙ্গে রসুলের বিরোধিতার কি ফল দাঁড়ায়। কোরেশদের প্রাধান্য আরবদের মধ্যে সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল কেন না তাদের তারা মনে করতো হযরত ইব্রাহিমের ও ইসমাইলের বংশধর। কাজেই কোরেশরা যখন পরাভূত হল তখন অন্যান্য আরব বুঝল রসুলের সঙ্গে বিরোধিতা করে আর ফল নেই। তখন তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করল। এ সম্বন্ধে কোরআনের বিখ্যাত বাণী এইঃ

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য আর বিজয়, আর দেখছো লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করছে আল্লাহর ধর্মে—

তখন কীর্তন করো তোমার পালয়িতার প্রশংসা, আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিঃসন্দেহ তিনি বার বার প্রত্যাবর্তনকারী (করুণায়)।

বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদের আগমন

যেসব গোত্রের প্রতিনিধি হযরতের কাছে আসে তাদের কিছু কিছু পরিচয় আমরা দিচ্ছি। বিখ্যাত তামিম গোত্রের তরফ থেকে যারা আসে তারা মসজিদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে' উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকেঃ মোহম্মদ, আমাদের কাছে বেরিয়ে আসুন। তাদের এমন ডাকাডাকিতে হযরত বিরক্ত হন। হযরতকে আসতে দেখে তারা বলেঃ মোহম্মদ, আমরা আপনার কাছ এসেছি আত্মগৌরব ঘোষণায় প্রতিযোগিতা করতে—আমাদের কবি ও বক্তাকে অনুমতি দিন। হযরত অনুমতি দিলে তাদের পক্ষের হয়ে উতারিদ-বিন-হাজিব দাঁড়িয়ে বল্লেঃ প্রশংসা

আল্লাহ্‌র তিনি আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সেজন্য, আর তিনিই প্রশংসার যোগ্য; তিনি আমাদের রাজা করেছেন, দিয়েছেন আমাদের প্রচুর ধন-সম্পদ, তার ফলে আমরা বদান্য হতে পেরেছি, তিনি আমাদের পূর্বাঞ্চলের সব চাইতে শক্তিশালী দল করেছেন, আর সাখ্যায় আমরা সর্বাধিক, অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ, কাজেই মানুষের মধ্যে কে আমাদের সমকক্ষ? আমরা কি লোকদের মধ্যে রাজা নই, আর তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য? যে আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায় যে বর্ণনা করুক আমি যেসব বর্ণনা করলাম। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ আমাদের যত কিছু দিয়েছেন সে সব সম্বন্ধে আরো বলতে পারতাম। আর সেসব সবাই জানে। আমি এ সব বল্লাম তোমরা যদি পারো তবে এর তুল্য কিছু বলতে চেষ্টা কর, অথবা এর চাইতে ভালো কিছু।

হযরত সাবিত-বিন্-কায়েসকে বল্লেন: উঠে দাঁড়িয়ে বক্তার কথার উত্তর দাও। তখন সাবিত দাঁড়িযে বল্লেন:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী আর তাতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর শাসন। তাঁর সিংহাসন তাঁর জ্ঞানের অন্তর্গত। তাঁর করুণার বাইরে কোনো কিছুর অবস্থিতি নেই। তাঁর ক্ষমতার বলে তিনি আমাদের রাজা করেছেন আর তাঁর সৃষ্টির শেরাকে দাঁড় করিয়েছেন রসুলরূপে, আর তাঁকে দিয়েছেন বংশ-মর্যাদা, করেছেন তাঁকে সত্যসন্ধ, দিয়েছেন তাঁকে সুযশ, আর পাঠিয়েছেন তাঁকে তাঁর গ্রন্থ, আর তার ভার দিযেছেন তাঁর উপরে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে—আল্লাহ তাঁকে নির্বাচিত করেছেন সমস্ত জগতের মধ্যে। তারপর তিনি লোকদের আহ্বান করেছেন তাঁতে বিশ্বাস স্থাপন করতে আর তাঁর লোকদের থেকে মোহাজিররা আর স্বজনরা আল্লাহর রসুলে বিশ্বাসী হয়েছে—খ্যাতিতে তিনি সুমহান, গৌরবে মহামহিম, আর কর্মে সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন আল্লাহর রসুল আহ্বান করেছিলেন তখন জগতে প্রথম আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, আর তাঁর সহকর্মী, আমরা লোকদের সঙ্গে সংগ্রাম করব যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস

করে। আর যে আল্লাহ্‌তে ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস করেছে যে আমাদের কাছ থেকে রক্ষা করেছে তার জীবন ও ধনসম্পদ, আর যে অবিশ্বাস করে তবে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হয়ে অক্লান্ত ভাবে আমরা যুদ্ধ কবব, আর তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য হবে সামান্য কাজ। এই আমার বক্তব্য আর আমি আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করি আমার নিজের জন্য ও বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের জন্য। তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক।

হযরতের কবি হাস্‌সান এই সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। রসুল তাঁকে ডেকে পাঠান এসে তামিমদের কবিব কথার উত্তর দিতে। হাস্‌সান যা বলেন তা অনেকটা সাবিতেরই অনুরূপ।

শুনে তামিমরা বলে, রসুলের তরফের বক্তা ও কবি আমাদের তরফের বক্তা ও কবির চাইতে ভাল, তাদের কণ্ঠ আরো মিষ্ট। শেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। রসুল তাদের মূল্যবান উপহার দেন।

বানু-আমির থেকে হযরতের কাছে তিন জন প্রতিনিধি আসে। তাদের নেতা আমিরের সংকল্প ছিল সুযোগ বুঝে সে হযরতকে হত্যা করবে। আর এই ব্যাপারে সে তার সঙ্গীদের সাহায্য চায়। কিন্তু সে-সুযোগ সে পায় না।

বর্ণিত হয়েছে, হযরতের কাছ থেকে ফিরে এসে সে প্লেগে মারা যায়, আর তার একজন সঙ্গী মারা যায় বজ্রাঘাতে।

বনি সা'দ বিন্ বক্‌র্ থেকে প্রতিনিধিরূপে আসে যিমাম বিন্ সালাবা। সে মদিনার মসজিদে উপস্থিত হয়ে হযরতকে প্রশ্ন করেঃ সত্যই তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসুল কি না, একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করার আর প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের উপাসনা পরিহার করার নির্দেশ তিনি নিয়ে এসেছেন কি না, পাঁচবার নামায পড়া আর যাকাত, রোজা, হজ ও ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করবার আদেশ তিনি আল্লাহ্ থেকে পেয়েছেন কি না। হযরত এসবের সম্মতিসূচক উত্তর দেন। সে তখন ইসলাম গ্রহণ করে ও ধর্মের নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করবার অঙ্গীকার নিয়ে ফিরে যায়। হযরত বলেনঃ এই লোকটি অকপট—সে বেহেশ্‌তে যাবে।

যিমাম-এর আন্তরিক বিশ্বাস তার জাতির মন স্পর্শ করে, এবং তারা সবাই রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে।

আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে আসে আল্-জারুদ বিন্ আম্‌র। হযরত তার কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা করেন। সে বলে ঃ মোহম্মদ, আমার ঋণ আছে, আমি যদি আমার ধর্ম ত্যাগ করে আপনার ধর্ম গ্রহণ করি তবে আপনি কি আমার ঋণের দায়িত্ব নেবেন? রসুল বল্লেন ঃ আমি এই দায়িত্ব নিচ্ছি যে আল্লাহ্ তোমাকে যাতে চালিত করেছেন তা এসবের চাইতে ভাল। সে ও তার সঙ্গীরা ইসলাম গ্রহণ করল। তার পর সে হযরতের কাছে বাহন চায়। হযরত বল্লেন ঃ কোনো বাহন এখন নেই। আল্-জারুদ বল্লে ঃ মদিনা ও তার অঞ্চলের মধ্যে কতকগুলো বেওয়ারিশ পশু আছে সে কি তাদের উপরে চড়ে দেশে যেতে পারে না? হযরত বল্লেন ঃ না, তাদের সম্বন্ধে সাবধান হও, কেন না তা করলে তোমাকে দোযখের আগুনে যেতে হবে। এর পর আল্-জারুদ তার জাতির কাছে চলে যায়। সে তখন ভাল মুসলমান হয়েছে—ধর্মে দৃঢ়চিত্ত। তার জাতির লোকদের কেউ কেউ মুসলমান হবার পরে তাদের পুরাতন ধর্মে ফিরে গিয়েছিল। তখন আল্-জারুদ ধর্মে তার দৃঢ় প্রত্যয় জ্ঞাপন করে চলে।

বানু হানিফা গোত্রের যেসব প্রতিনিধি এসেছিল তাদের মধ্যে ছিল মুসায়লিমা বিন্ হাবিব। তাকে বলা হয়েছে মহামিথ্যাবাদী, কেন না, সে পরবর্তী কালে বলেছিল—সে নবী।

বিখ্যাত হাতেম তাঈ-এর গোত্রের কিছু লোক এক সময় মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদের সঙ্গে ছিল হাতেমের কন্যাও। কিন্তু হাতেমের পুত্র আদিঈ সিরিয়ায় পালিয়ে যায়—সে খৃষ্টানধর্ম অবলম্বন করেছিল। হযরত হাতেমের কন্যাকে তার প্রার্থনা মতো সিরিয়ায় তার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন, তাকে কিছু কাপড়চোপড় ও অর্থও দিয়ে দেন। আদিঈ পরে মুসলমান হয়।

হযরতের তাবুক থেকে ফিরে আসার পরে হিমিয়ার-এর রাজাদের

দূত তাঁর কাছে আসে সেই রাজাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ নিয়ে।

হযরত তাঁদের প্রতি যে লেখন পাঠান তার সূচনায় আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করেন, পরে বলেন···আপনারা আপনাদের করণীয় করবেন যদি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের অনুবর্তী হন আর নামায পালন করেন ও যাকাত দেন···ফসলের যাকাত দিতে হবে (নির্দিষ্ট হারে)···আর প্রত্যেক চল্লিশটি উটের জন্য দিতে হবে একটি দুগ্ধবতী উট, তিরিশটি উটের জন্য দিতে হবে একটি নবীনবয়স্ক মর্দা উট, পাঁচটি উটের জন্য দিতে হবে একটি ভেড়া, দশটি উটের জন্য দিতে হবে দুটি ভেড়া, চল্লিশটি গরুর জন্য দিতে হবে একটি গরু, তিরিশটি গরুর জন্য দিতে হবে একটি এঁড়ে বা বকন, চরে খাওয়া চল্লিশটি ভেড়ার জন্য দিতে হবে একটি ভেড়া। এই বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান। যে এর চাইতে বেশি করে সে নিজের ভাল করে। যে এই সব নির্দেশ পালন করে আর তার ইসলামের সাক্ষ্য বহন করে আর বিশ্বাসীদের সাহায্য করে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সে বিশ্বাসী—বিশ্বাসীর অধিকার ও দায়িত্ব তার জন্য, আর সে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের নিরাপত্তা ভোগ করে। যদি কোনো ইহুদী অথবা খৃষ্টান মুসলমান হয় তবে সে তার অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বাসীরূপে গণ্য হবে। কোনো ইহুদী অথবা খৃষ্টান যদি তার ধর্ম আঁকড়ে থাকে তবে তাকে ধর্মান্তরিত করা হবে না। তাকে জেযিয়া দিতে হবে—স্বাধীন অথবা দাস প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অথবা নারীর জন্য এক দিনার হিসাবে, অথবা সেই মূল্যের কাপড়চোপড়; যে তা আল্লাহ্‌র রসুলকে দেয় সে ভোগ করবে আল্লাহ ও রসুলের নিরাপত্তা, আর যে তা দেয় না সে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের শত্রু।

নাজরানের খৃষ্টানদের আগমন

আরো বহু উপজাতি মক্কার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হযরতের দরবারে প্রতিনিধি পাঠায়। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায়। নাজরান মক্কা ও এমনের মধ্যবর্তী এক

অঞ্চল। সেখানে ছিল বহু খৃষ্টানের বাস। হযরত তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। তাদের ষাট জন নেতা মদিনায় আসেন। হযরত তাঁদের স্থান দেন মদিনার মসজিদে। মসজিদেই তাঁরা তাঁদের পদ্ধতিতে উপসনা করেন। এঁদের নেতা ছিলেন আবু হারিসা। তাঁর সঙ্গে হযরতের বহু আলোচনা হয়। কিন্তু হযরত ঈসা সম্বন্ধে হযরত যা বলেন খৃষ্টান নেতারা তা মেনে নিতে রাজি হন না। তখন হযরত তাদের 'মুবাহিলা' করতে আহ্বান করেন। সেটি কি তা বোঝা যাবে কোরআনের এই তিনটি আয়াতের শেষেরটি থেকে ঃ

নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের দৃষ্টান্তের মতো। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন ধূলি থেকে তার পর তাঁকে বলেছিলেন ঃ হও, আর তিনি হলেন। এটি তোমার পালয়িতার কাছ থেকে আসা সত্য, সেজন্য সংশয়িতদের দলের হেয়ো না। কিন্তু তোমার কাছে জ্ঞান যা এসেছে তার পরে এ বিষয়ে যে কেউ তোমার সঙ্গে তর্ক করে তাকে বলো, এসো আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের আর আমাদের স্ত্রীলোকদের ও তোমাদের স্ত্রীলোকদের আর আমাদের লোকদের আর তোমাদের লোকদের ডাকি আর কাতর হয়ে প্রার্থনা করি মিথ্যাবাদীদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত পড়বার জন্য। (৩ঃ ৫৮—৬০)।

খৃষ্টান নেতারা মুবাহিলা করতে অগ্রসর হয় না। তার পরিবর্তে তারা জেযিয়া দিতে রাজি হয়। তখন হযরত তাদের এই বিখ্যাত সনদ দেন ঃ

নাজরানের পাদরী পুরোহিত ও সন্ন্যাসীবর্গ এবং সাধারণ অধিবাসিগণের প্রতি ঃ—তাহাদিগের উপস্থিত অনুপস্থিত স্বজাতীয় ও অনুগত সকলের জন্য আল্লাহ্‌র নামে, তাঁহার রসুল মোহম্মদের প্রতিজ্ঞা (এই-যে) সকল প্রকার সম্ভবপর চেষ্টার দ্বারা আমরা তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিব। তাহাদের দেশ, তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি ও ধর্ম-সম্পদ এবং তাহাদিগের ধর্ম ও ধর্মসংক্রান্ত যাবতীয়

আচার ব্যবহার, সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ অব্যাহত ও নিরাপদ থাকিবে। তাহাদিগের কোনো সমাজগত আচার-ব্যবহারের, কোনো বিষয়গত স্বত্বাধিকারের এবং কোন ধর্মগত সংস্কারের উপর কখনও কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না। অল্প হউক, বিস্তর হউক, যাহা কিছু তাহাদিগের আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদেরই থাকিবে। মুসলমানগণ তাহাদিগের নিকট—অর্থ বিনিময় ব্যতীত—কোন প্রকার উপকার লইতে পারিবেন না। তাহাদিগের নিকট হইতে ওশর গ্রহণ করা হইবে না, তাহাদিগের দেশের মধ্য দিয়া সৈন্যচালনা করা হইবে না। আল্লার নামে তাহাদিগকে আরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে যে কোন ধর্মযাজককে তাহার পদ হইতে অপসৃত করা হইবে না, কোন পুরোহিতকে পদচ্যুত করা করা হইবে না, কোন সন্ন্যাসীর সাধনায় কোনও প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করা হইবে না। যাবৎ তাহারা শান্তি ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবে—তাবৎ এই সনদের লিখিত সমস্ত শর্ত্ত সমান ভাবে বলবৎ থাকিবে।

'তাহারা অত্যাচারী না হউক এবং তাহারা অত্যাচারিত না হউক।'

(মোস্তফা—চরিত দ্রষ্টব্য)।

রসুল যখন মোয়াযকে এমনের শাসনকর্তারূপে পাঠান তখন তাঁকে এই উপদেশ দেন ঃ সুসংবাদ দাও, আর লোকদের প্রতিহত ক'রো না, তুমি এমন এক জাতির কাছে যাচ্ছ যারা গ্রন্থধারী, তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে বেহেশতের চাবি সম্বন্ধে। বোলো তাদের যে সেই চাবি হচ্ছে এই সাক্ষ্য দানে যে আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই।

হযরত দশম হিজরীর রবিউল আখের অথবা জুমাদাল-উলা মাসে খালেদ বিন্ আল্ ওয়ালিদকে নাজরানের বানু আল্ হারিস-এর কাছে পাঠান তাদের ইসলামে আহ্বান করার জন্য। আক্রমণের পূর্বে তাদের তিন দিন সময় দিতে বলেন। এই তিন দিনের মধ্যে যদি তারা

ইসলাম গ্রহণ করে তবে খালেদ তাদের আনুগত্য গ্রহণ করবে আর যদি তারা অস্বীকার করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।—বানু আল্-হারিস ইসলাম গ্রহণ করে।

বানু আল্-হারিস ছিল একটি দুর্ধর্ষ গোত্র।

হযরতের পুত্রবিয়োগ

দশম হিজরির একটি বড় ঘটনা হযরতের পুত্র ইব্রাহিমের (ইনি বিবি মারিয়ার গর্ভজাত) শৈশবে মৃত্যু। তাঁর মৃত্যুতে হযরত খুব শোক পান। শিশুর অন্তিম কাল ঘনিয়ে এসেছে দেখে স্বভাবতঃ তাঁর চোখ অশ্রুপূর্ণ হল। তিনি বল্লেন ঃ আল্লাহর যা অভিরুচি তাই হবে ; কিন্তু আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তাঁকে কাঁদতে দেখে তাঁর সঙ্গী বল্লেন ঃ হযরত, আপনি তো আমাদের শোক করতে নিষেধ করেছেন। হযরত বল্লেন ঃ অশ্রু বওয়ানো তো করুণা, যে করুণা করে না সে করুণা পাবে কেমন করে? আমি উদ্দামভাবে শোক করতে নিষেধ করেছি।

এই দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা ভাবলে নবীর পুত্রের মৃত্যুর জন্য আকাশ ও পৃথিবী শোক করছে। কিন্তু হযরত তাদের বলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিদর্শন। কোনো মানুষের জন্মের বা মৃত্যুর জন্য তাদের গ্রহণ হয় না। যখন তোমারা এই সব গ্রহণ দেখ তখন আল্লাহর স্মরণে প্রার্থনারত হও।

নবীত্বের মিথ্যা দাবিদার

দশম হিজরীর শেষে নবীত্বের মিথ্যাদাবিদার মুসায়লিমা হযরতের কাছে এই মর্মের এক পত্র প্রেরণ করে ঃ আল্লাহর রসুল মুসায়লিমা থেকে আল্লাহ্‌র রসুল মোহম্মদের প্রতি। আপনার পরে শান্তি বর্ষিত হোক। আমাকে আপনার সঙ্গে ক্ষমতায় অংশী দাঁড় করা হয়েছে। দেশের অর্ধেক আমাদের আর অর্ধেক কোরেশদের, কিন্তু কোরেশরা শত্রুভাবাপন্ন।—দুইজন দূত এই পত্র নিয়ে আসে।

হযরত তাদের জিজ্ঞাসা করেন এই পত্র সম্বন্ধে তারা কি বলে। তারা উত্তর দেয়ঃ মুসায়লিমা যা বলে আমরাও তাই বলি। হযরত বলেনঃ আল্লাহর শপথ, দূত যদি অবধ্য না হতো তবে আমি তোমাদের দুই জনের শিরশ্ছেদ করতাম। তারপর তিনি মুসায়লিমাকে লেখেনঃ আল্লাহর রসুল মোহম্মদ থেকে মিথ্যাবাদী মুসায়লিমার প্রতি—শান্তি তার উপরে বাষত হোক যে (আল্লাহর) নির্দেশ অনুসারে চলে। পৃথিবী আল্লাহর, তিনি তাঁর সৃষ্টদের যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকার দেন, আর সুফল ধার্মিকদের জন্য।

বিদায় হজ

যুলকাদা মাসের সূচনায় হযরত হজ-ব্রত উদযাপনের জন্য লোকদের প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। হযরত আয়েশা বলেছেন যে রসুল হজ করতে রওনা হয়েছিলেন ২৫ যুলকাদা তারিখে।

হযরতের সঙ্গে হজ করতে চললো বহু লোক।

পথে তাদের সংখ্যা আরো বাড়ে। লক্ষাধিক লোকের এই হজযাত্রা এক অপূর্ব দৃশ্য। এক একখণ্ড শুভ্র বর্ণের উত্তরীয় ও তহবন—হযরত মোহম্মদ মোস্তফা থেকে মদিনার একটি দরিদ্রতম ক্রীতদাস পর্যন্ত সবারই আজ এই এক পরিচ্ছদ। সবাই নগ্নপদ, নগ্নমস্তক, সবার মুখে একই 'লাব্বাএক' (এই আমি হাজির) ধ্বনি। †

যথারীতি হজ সমাধানের পরে হযরত সেই মহাজনসমাবেশে যে ভাষণ দেন তা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তাঁর বক্তব্যের প্রধান প্রধান অংশ আমরা উদ্ধৃত করছিঃ

হে জনগণ, আমার কথা শোনো। আমি জানি না এই বৎসরের পরে এই জায়গায় পুনরায় তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে কিনা। তোমাদের রক্ত আর তোমাদের সম্পত্তি তোমাদের প্রভুর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের জন্য পবিত্র—যেমন পবিত্র এই দিন ও এই মাস। নিঃসন্দেহ তোমাদের প্রভুর সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে, আর তিনি তোমাদের জিজ্ঞাসা

† মোস্তফা চরিত দ্রষ্টব্য।

করবেন তোমাদের কাজ সম্বন্ধে। তাঁর বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। যার কাছে কোনো ধনসম্পদ গচ্ছিত আছে সে তা ফিরিয়ে দিক তাকে যে তার কাছে তা গচ্ছিত রেখেছিল। সমস্ত সুদ বাতিল করা হল, কিন্তু তোমাদের মূলধন তোমাদের রইল। অন্যায় কোরো না, তাহলে তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। আল্লাহ্ বিধান করেছেন যে আর সুদ থাকবে না, আর আব্বাস বিন্ আব্‌দুল মোত্তালেবের সুদ সমস্তই বাতিল করা হল। অন্ধকার যুগে যত শোণিত-পাত হয়েছে তার আর প্রতিশোধ নেওয়া হবে না···তোমাদের দেশে শয়তানের আর পূজা লাভের আশা নেই, কিন্তু তার পূজা না করলেও সে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে তোমাদের আনুগত্য লাভ করে তবু সে খুশি হবে; কাজেই তোমাদের ধর্মবিষয়ে তার সম্বন্ধে সাবধান হও। পবিত্র মাস মুলতবী রাখা সমূহ অবিশ্বাস, তার দ্বারা যারা অবিশ্বাসী তারা প্রতারিত হয়···আল্লাহ্‌র কাছে মাসের সংখ্যা বারো, তার চার মাস পবিত্র···তোমাদের স্ত্রীদের উপরে তোমাদের অধিকার আছে, আর তোমাদের উপরে তাদের অধিকার আছে। তোমাদের অধিকার আছে যে তারা তোমাদের বিছানা অপবিত্র করবে না। যদি তারা তা করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের অধিকার দিয়েছেন তাদের ভিন্ন কামরায় রাখতে, আর তাদের প্রহার করতে, কিন্তু গুরুতরভাবে নয়। যদি তারা এসব থেকে বিরত থাকে তবে তাদের অধিকার আছে তাদের খাদ্যে ও কাপড়-চোপড়ে, সদয়তার সঙ্গে। আর স্ত্রীদের আদেশ দাও সদয়ভাবে, কেন না তারা তোমাদের বন্দী, তাদের নিজেদের উপরে তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই; তোমরা তাদের আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গ্রহণ করেছ কেবল গচ্ছিত-রূপে; আর তাদের তোমরা ভোগ করতে পারো আল্লাহ্‌র বাণীর দ্বারা।

আর তোমাদের দাসগণ, দৃষ্টি রাখ, তাদের তোমরা খাওয়াবে যা তোমরা খাও, আর পরাবে যা তোমরা পরো। আর যদি তাদের অপরাধ ক্ষমা করতে না পার তবে তাদের বিক্রয় করো; কেন না তারা আল্লাহ্‌র দাস, অত্যাচারিত হবার যোগ্য নয়।

জেনো যে প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই, আর মুসলমানেরা পরস্পরের ভাই। একজন ভাইয়ের কাছ থেকে তাইই নেওয়া বৈধ যা সে ইচ্ছা করে' দেয়, অতএব নিজেদের ক্ষতি কোরো না।

এটি কোন্ মাস জান?—কোন্ স্থান?—কোন্ দিন?—জনগণ উত্তর দেয়—পবিত্র মাস, পবিত্র স্থান, হজের মহাদিন। এর প্রত্যেক কথার সঙ্গে হযরত উত্তর দিলেন: এমনি পবিত্র ও আঘাতের অযোগ্য আল্লাহ্ করেছেন তোমাদের প্রত্যেকের জীবন ও সম্পত্তি পরস্পরের জন্য, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হও।

যে উপস্থিত আছে সে এই বাণী পৌঁছে দিক তার কাছে যে অনুপস্থিত। হতে পারে যাকে বলা হবে সে এই কথা ভাল মনে রাখবে তার চাইতে যে এই কথা শুনেছে……

নিঃসন্দেহ আমার উপরে যে ভার দেওয়া হয়েছিল আমি তা সমাপন করেছি। আমি তা তোমাদের মধ্যে রেখে গেলাম—এক স্পষ্ট নির্দেশ, আল্লাহ্‌র গ্রন্থ আর তাঁর রসুলের আচরণাবলী—যদি তোমরা সে সব আঁকড়ে ধরো তবে কখনো বিপথগামী হবে না।

তার পর আকাশের দিকে মুখ তুলে হযরত বল্লেন:

হে প্রভু, আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি? আর আমার উপরে যে প্রচারের ভার ছিল তা উদ্‌যাপন করেছি? তাঁর চারপাশের জনগণ বলে উঠলো: হাঁ, আপনি তা করেছেন। হযরত বল্লেন: হে প্রভু, মিনতি করি তুমি এর সাক্ষী থাকো।

এই কথা বলে হযরত তাঁর ভাষণ সাঙ্গ করলেন। তিনি তাঁর উট থেকে নেমে যোহর ও আসরের নামায সবার সঙ্গে পড়লেন। তার পর তাঁর কাছে অবতীর্ণ হল এই বাণী: আজকের দিনে তোমাদের ধর্মকে আমি পূর্ণাঙ্গতা দান করেছি, আর তোমাদের উপরে আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করেছি, আর তোমাদের থেকে ইসলামকে—আত্মসমর্পণকে—গ্রহণ করেছি তোমাদের ধর্মরূপে।

এর পর তিনি ৬৩টি উট কোরবানি করলেন তাঁর জীবনের প্রতিটি বৎসরের জন্য একটি উট এই হিসাবে—আর তাঁর আনা একশত উটের অবশিষ্টগুলো আলী কোরবানি করলেন। তার পর হযরত তাঁর মস্তক মুণ্ডন করলেন, আর এইভাবে হজ পূর্ণাঙ্গ হলো।

বিদায় হজের দিনে হযরত যে বাণী লাভ করলেন তাতে বলা হয়েছিল আজকার দিনে তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গতা দান করা হল। এই কথা শুনে হযরত আবু বকর বুঝলেন হযরতের তাঁর অনুবর্তীদের ত্যাগ করে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার দিনের আর দেরি নেই। এই কথা ভেবে তিনি অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন।

হযরতের হিজরতের একাদশ বৎসরে আরবের বিভিন্ন জায়গায় তিনজন নবীত্বের দাবিদারের অভ্যুত্থান হয়। তাদের মধ্যে মুসায়লিমার কথা আমরা জেনেছি। অপর দুইজন হচ্ছে বনি সা'দ গোত্রের প্রধান তোলায়হা আর এমনের আল আসওয়াদ। এদের দুইজন—মুসায়লিমা ও আল আসওয়াদ—পরে নিহত হয়, তোলায়হা বশ্যতা স্বীকার করে।

এই বৎসর সিরিয়ার সীমান্তে রোমক সৈন্যদের সঙ্গে মোকাবেলা করবার জন্য হযরত তাঁর অনুবর্তীদের আদেশ দেন। এই সেনাদলের অধিনায়ক নিযুক্ত হন যায়েদের পুত্র তরুণবয়স্ক ওসামা। তাঁর অনুগামী হন আবু বকর, ওমর প্রভৃতির মতো প্রধান ও মান্য বক্তি। মদিনার অদূরে আল্ জুরফ্ নামক স্থানে সৈন্যেরা জমা হতে লাগল। এই সময় দেখা দিল হযরতের পীড়া।

হযরতের পরলোক গমন

ইবনে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে: পীড়া দেখা দেবার পূর্বরাত্রে হযরত জনৈক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে পরলোকগতদের উদ্দেশ্যে বলেন: হে কবরবাসিগণ, তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা সুখী, কেন না তোমরা অনেক ভাল আছ যারা

বেঁচে আছে তাদের চাইতে, মতভেদ অন্ধকারের তরঙ্গের মতো একটির পর অপরটি এসে পড়েছে—শেষেরটি পূর্বেরটির চাইতে আরো প্রবল।—সঙ্গীর দিকে ফিরে তিনি বল্লেন: আমাকে বলা হয়েছে পৃথিবীর ধনসম্পদ ভোগ আর দীর্ঘ জীবন লাভ আর মৃত্যুর পরে বেহেশত, আর আমার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও অবিলম্বিত বেহেশত, এই দুইয়ের মধ্যে বেছে নেবার কথা। সঙ্গী তাঁকে বলেন প্রথমটি গ্রহণ করতে, কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন দ্বিতীয়টি। তার পর তিনি মৃতদের জন্য প্রার্থনা করেন ও সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

হযরত আয়েশা বলেছেন: সমাধিক্ষেত্র থেকে ফিরে হযরত দেখলেন আমি মাথার বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি। তখন আমি বলছিলাম, হায় আমার মাথা। হযরত (তামাশা করে) বল্লেন: না আয়েশা, আমি বরং বলতে পারি—হায় আমার মাথা। তিনি বল্লেন: তুমি যদি আমার সামনে মারা যাও আর আমি তোমার দাফন করি ও জানাজা পড়ি তাহলে কি তুমি অখুশী হবে? হযরত আয়েশা বল্লেন: আমি দেখছি—সেই জানাজা পড়ার পরে আমার কামরায় এসে আপনার কোনো স্ত্রীকে নিয়ে রাত্রি যাপন করছেন। এই কথা শুনে হযরত হাসলেন। তার পর তাঁর মাথার বেদনা অত্যন্ত বেড়ে গেল। পালাক্রমে বিভিন্ন স্ত্রীর গৃহে রাত্রি যাপন বন্ধ করে' শুশ্রূষার জন্য হযরত আয়েশার গৃহে তিনি স্থান নিলেন।

হযরতের পীড়া বেড়েই চললো আর তাঁর খুব যন্ত্রণা হতে লাগল। খয়বরে তাঁর খাদ্যে যে বিষ দেওয়া হয়েছিল তার ক্রিয়া এই সময়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়—তাঁর একটি উক্তিতে সে-কথা আছে। তিনি অত্যন্ত জ্বালা বোধ করেন। তিনি বলেন: বিভিন্ন কুয়ো থেকে এনে সাত মশক পানী আমার মাথায় ঢালো যেন আমি লোকদের কাছে গিয়ে তাদের উপদেশ দিতে পারি। হযরত হাফসার একটি টবে হযরতকে বসিয়ে তাঁর মাথায় পানী ঢালা হলো। শেষে তিনি বল্লেন: হয়েছে হয়েছে।

এর পর হযরত মাথায় একটি কাপড় বেঁধে নামাযের স্থানে গিয়ে বসলেন। প্রথমে তিনি ওহোদে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, তাদের জন্য দীর্ঘসময় প্রার্থনা করলেন; তার পব বল্লেনঃ আল্লাহ্ তাঁর এক ভৃত্যকে বেছে নিতে বল্লেন সংসারের জীবন, আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে এই দুটির মধ্যে থেকে—সেই ভৃত্য বেছে নিল শেষেরটি। আবু বকর তাঁর কথার অর্থ বুঝলেন ও অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেনঃ না, আপনার পরিবর্তে আমাদের ও আমাদের সন্তানসন্ততিদের আল্লাহ্ গ্রহণ করুন। হযরত বল্লেনঃ ধীরে হে আবু বকর। তিনি আরো বল্লেনঃ মসজিদের দিকে যেসব দরজা খোলা সেসব বন্ধ করে দাও, কেবল আবু বকরের বাড়ীর দিকের দরজা খুলে রাখ, কেন না আবু বকরের চাইতে ভাল বন্ধু আমার আছে তা আমি জানি না।

ওসামা বিন্ যায়েদের মতো একজন তরুণের নেতৃত্বে লোকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করছিল ও তারা প্রচুর সংখ্যায় সৈন্যদলে যোগ দিচ্ছিল না। হযরত আল্লাহ্‌র প্রশংসার পরে বল্লেনঃ হে জনগণ, ওসামার সৈন্যদলকে রওনা হতে দাও; তার নেতৃত্ব তোমাদের সমালোচনার বিষয় হয়েছে যেমন এক সময়ে তার পিতার নেতৃত্ব তোমাদের সমালোচনার বিষয় হয়েছিল; সে তার পিতার মতই নেতৃত্বের ভার পাবার যোগ্য। তাঁর কথা শুনে লোকেরা যুদ্ধযাত্রার জন্য সত্বর হল। কিন্তু হযরতের পীড়া বৃদ্ধির জন্য ওসামার অধীন সৈন্যদল আল্ জুরফেই রয়ে গেল।

হযরত তাঁর অসুখের সময় যেদিন ওহোদের শহীদ্দের জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন সেদিন আরো বলেছিলেনঃ হে মোহজিরগণ, আনসারদের প্রতি সদয় ব্যবহার কোরো; কেন না অন্য লোকেরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু আনসারদের তেমন সংখ্যা-বৃদ্ধি হতে পারে না; তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে দৃষ্টি রেখেছে আমার সুখসুবিধার দিকে, আর আমার সহায় হয়েছে, কাজেই তাদের মধ্যে যারা ভাল লোক তাদের

সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো আর যারা তেমন নয় তাদের ক্ষমা করো। এই কথা বলে তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন আর তাঁর গৃহে ফিরলেন। পীড়ার প্রকোপে তিনি সম্বিৎহারা হয়ে পড়লেন। তাঁর পরিজনেরা জোর করে তাঁকে আবিসিনিয়ায় প্রচলিত প্লুরিসি'র একটি ওষুধ খাইয়ে দেন। হযরত সম্বিৎ লাভ করে তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ও যাঁরা জোর করে তাঁকে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের সেই ওষুধ খাইয়ে দেন—কেবল তাঁর চাচা আব্বাসকে রেহাই দেওয়া হয়।

হযরত আয়েশা বলেছেন: যখন রসুলুল্লাহ্ আবু্ বকরকে নামাযে নেতৃত্ব করবার নির্দেশ দেন তখন তিনি হযরতকে বলেন: আবু্ বকর তেমন শক্ত সবল লোক নন্, তাঁর কণ্ঠও দুর্বল, আর কোরআন্ পাঠকালে তিনি খুব অশ্রু বিসর্জন করেন। কিন্তু হযরত তাঁর নির্দেশ বহাল রাখেন আর হযরত আয়েশাও তাঁর আপত্তি জানিয়ে যান। তাতে হযরত বলেন: তুমি দেখছি ইউসুফের সঙ্গীদের মতো; তাকে নামাযে নেতৃত্ব করতে বলো। হযরত আয়েশা চাচ্ছিলেন না যে হযরতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর পিতা নানা ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য নিন্দাভাজন হন।

বর্ণিত হয়েছে, এই কালে একদিন ওমর নামাযে নেতৃত্ব করছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে হযরত আবু্ বকরকে ডেকে পাঠান ও তাঁকে নেতৃত্ব করতে বলেন।

হযরত রোগভোগ করেন দিন পনেরো। তার শেষের পাচ দিন রোগের তীব্রতা—দাহ ও যন্ত্রণা—খুব বাড়ে। তাঁর অবস্থা দেখে হযরত ফাতেমা আকুল হয়ে রোদন করেন। আলি তাঁকে নিবৃত্ত হতে বলেন। হযরত বলেন: আলি, আপন পিতার জন্য তাকে কাঁদতে দাও।

সোমবারের দিন—হযরতের পরলোক গমনের দিন—হযরত ফজরের নামাযে যোগ দিতে এলেন—তাঁর মাথা ছিল কাপড়ে জড়ানো, আর আবু্ বকর নেতৃত্ব করছিলেন। হযরত এলে লোকদের মনযোগ স্বতঃই সেইদিকে গেল। আবু্ বকর বুঝলেন হযরত এসেছেন, আর তিনি

নেতৃত্বের স্থান থেকে সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু হযরত তাঁর পিঠে হাত দিয়ে বল্লেন ঃ লোকদের নামায পড়াও, আর আবু বকরের পাশে বসে' তিনি নামায পড়লেন। নামায শেষ হলে তিনি উচ্চকণ্ঠে বল্লেন ঃ হে জনগণ, আগুন জ্বালানো হয়েছে, বিদ্রোহ আসছে রাত্রির আঁধারের মতো, আল্লাহ্‌র শপথ, আমাকে তোমরা কোনো দোষ দিতে পারো না, আমি তাই বৈধ বলি যা কোরআন্ বৈধ বলে, আর তাই নিষেধ করি যা কোরআন্ নিষেধ করে। তাঁর কথা শেষ হলে আবু বকর হযরতকে বল্লেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসুল, দেখছি আজকের সকালে আপনি আল্লাহ্‌র করুণা ও কল্যাণ ভোগ করছেন। এই বলে তিনি মদিনার সুন্‌হ্ পল্লীতে তাঁর স্ত্রীকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। হযরত স্বীকৃত হলেন ও নিজের ঘরে গেলেন।

কিন্তু আব্বাস বল্লেন ঃ তিনি হযরতের মুখে মৃত্যুর লক্ষণ দেখছেন, যেমন পূর্বে আব্দুল মোত্তালেবের সন্তানদের মুখে দেখেছিলেন। হযরতের পরে পরিচালনার ভার কে বা কারা পাবে সে কথা তাঁর কাছ থেকে তিনি জানতে চাইলেন ; কিন্তু আলি তাতে স্বীকৃত হলেন না।

বর্ণিত হয়েছে এই সময় একদিন হযরত কালি কলম আনতে বলেন তাঁর পরে কি ব্যবস্থা হবে তার স্পষ্ট নির্দেশ দেবার জন্য। তাতে ওমর বলেন ঃ তাঁর মতি স্থির নয়—কোরআন কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? কিন্তু শেষ পর্যন্ত হযরত কোনো নির্দেশ দিয়ে যান নি।

হযরত আয়েশার কাছে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। হযরত নির্দেশ দেন কয়েকটি দরিদ্র পরিবারকে তা দিয়ে দিতে। তিনি বলেন ঃ এগুলো হাতে রেখে আমার প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়া আমার জন্য সঙ্গত হবে না।

হযরতের অন্তিমকাল সম্বন্ধে হযরত আয়েশা বলেছেন ঃ হযরত সেইদিন মসজিদ থেকে ফিরে আমারই বক্ষে হেলান দিয়ে শুলেন। আবু বকরের পরিবারের একটি লোক আমার কাছে একটি দাঁতন নিয়ে এলো, হযরত তার দিকে এমনভাবে তাকালেন যাতে মনে হল তিনি তা চাচ্ছেন।

তিনি তা চাচ্ছেন কি না জিজ্ঞাসা করলে তিনি বল্লেন ঃ হাঁ। তাই, আমি সেটি নিয়ে চিবিয়ে নরম করে তাঁকে দিলাম। তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে দাঁতন করলেন। তেমন আগ্রহের সঙ্গে তিনি পূর্বে দাঁতন করেন নি। তারপর তিনি তা রেখে দিলেন। আমার বক্ষে তাঁকে ভারী বোধ করলাম, আর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চোখদুটি নিস্পন্দ হয়েছে, আর তিনি বলছেন ঃ না, মহামহিম সঙ্গী হচ্ছেন বেহেশতের সঙ্গী। হযরত আয়েশা বল্লেন ঃ আপনাকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল আর যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁর শপথ, আপনি বেছে নিয়েছেন।

এইভাবে রসুলকে নিয়ে যাওয়া হল।

বর্ণিত হয়েছে, অন্তিমকালে হযরত বলেছিলেন ঃ আমার কবর সেজদার জায়গায় পরিণত কোরো না।

আরবে দুই ধর্ম থাকবে না।

নামায, নামায—সাবধান।

দাসদাসীদের প্রতি—সাবধান।

ইবনে ইসহাকে বলা হয়েছে সোমবারের দিন দুপুরে হযরত পরলোক গমন করেন। কিন্তু অন্য মতে তিনি পরলোক গমন করেন সেইদিন সন্ধ্যার পূর্বে।

হযরতের পরলোক গমনের তারিখ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। প্রচলিত মতে ১২ই রবিয়ল আউয়ল তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। মতান্তরে তিনি পরলোক গমন করেন ১লা বা ২রা রবিয়ল আউয়ল তারিখে।

হযরতের মৃত্যু হলে ওমর উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন ঃ যারা বিক্ষোভকারী তাদের কেউ কেউ রটাচ্ছে রসুলের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ, তাঁর মৃত্যু হয় নি, তিনি তাঁর প্রভুর কাছে গেছেন যেমন মূসা গিয়েছিলেন তাঁর লোকদের থেকে—চল্লিশ দিন আড়ালে ছিলেন—তখন বলা হচ্ছিল তিনি মারা গেছেন, তারপর তিনি এলেন। আল্লাহর

শপথ, রসুল তেমনি আসবেন যেমন মূসা এসেছিলেন, আর তাদের হাত ও পা কাটবেন যারা রটাচ্ছে তিনি মারা গেছেন। আবু বকর এসে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে সব শুনলেন। এদিকে মনোযোগ না দিয়ে তিনি আয়েশার ঘরে গেলেন—সেখানে হযরতকে একটি এমনী বস্ত্রে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি গিয়ে তাঁর মুখ খুলে চুম্বন করলেন আর বল্লেন ঃ আপনি আমার পিতামাতার চাইতে প্রিয়তর, আল্লাহর যা বিধান সেই মৃত্যুর স্বাদ আপনি গ্রহণ করেছেন, দ্বিতীয়বার মৃত্যু আপনার হবে না। তার পর তিনি হযরতের মুখ ঢেকে দিলেন ও বাইরে গেলেন। ওমর তখনও বলে চলেছিলেন। তিনি এসে বল্লেন ঃ ধীরে, হে ওমর, শান্ত হও। কিন্তু ওমর সে কথা না শুনে বলেই চল্লেন। তাঁকে থামানো যাবে না দেখে আবু বকর লোকদের কাছে গেলেন। তারা ওমরকে ছেড়ে তাঁর কাছে এলো। আল্লাহকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা জানিয়ে তিনি বল্লেন ঃ হে জনগণ, যদি কেউ মোহম্মদের পূজক থাকে তবে মোহম্মদের মৃত্যু হয়েছে, যদি কেউ আল্লাহর পূজক থাকে—আল্লাহ জীবন্ত ও অমর। এরপরে তিনি আবৃত্তি করলেন কোরআনের এই বাণী ঃ

আর মোহম্মদ একজন বাণীবাহক বৈ নন। নিঃসন্দেহ তাঁর পূর্বে পয়গাম্বররা গত হয়ে গেছেন ; যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পশ্চাৎপদ হবে ? আর যে কেউ পশ্চাৎপদ হয় সে আল্লাহকে কোনো আঘাত দেয় না আদৌ। আর আল্লাহ পুরস্কার দেবেন কৃতজ্ঞদের। (৩ ঃ ১৪৩)।

আবু বকরের মুখে কোরআনের এই বাণী শুনে লোকদের মনে হলো এই বাণী যে রসুল সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে আজ এটি শোনার আগে তা তারা জানতো না। তাঁর কাছ থেকে এই বাণী পেয়ে তারা বারবার এটি আবৃত্তি করতে লাগল। ওমর বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ, যখন আমি আবুবকরকে এসব কথা আবৃত্তি করতে শুনলাম তখন আমার মুখে আর কথা সরলো না ; আমার পা দুটি যেন আমাকে আর

বহন করতে পারবে না ; আর আমি মাটিতে বসে পড়লাম এইটি জেনে যে রসুল সত্যই পরলোক গমন করেছেন।

হযরতের পরলোক গমনের পরে আনসাররা সা'দ বিন্ উবাদার চারপাশে বনি সায়দার ঘরে সমবেত হলো, আর আলী, আল্ যুবের বিন্ আল্ আওয়াম এবং তাল্হা বিন্ উবায়দুল্লাহ্ আলাদাভাবে ফাতেমার গৃহে সমবেত হলেন, আর অবশিষ্ট মোহাজির উসায়েদ বিন্ হুদায়ের ও বানু আবদুল আশ্হালকে সঙ্গে নিয়ে আবুবকরের চারপাশে সমবেত হলো। তখন কেউ এসে আবুবকর ও ওমরকে বল্লেঃ আনসাররা সা'দের চারদিকে বনি সায়দার গৃহে একত্রিত হয়েছে, যদি লোকদের হাতে আনতে চান হবে এখনি তা করা উচিত, নইলে তাদের সিদ্ধান্ত গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। তখনও হযরতের কাফন দাফন হয়নি। ওমর আবুবকরকে বল্লেনঃ চলুন আমাদের আনসার ভাইদের কাছে যাই কি তারা করছে তা দেখবার জন্য।

গিয়ে তাঁরা দেখলেন আনসাররা সা'দকে তাদের নেতা মনোনীত করেছে—সা'দ এই সময় অসুস্থ ছিলেন, ঘরের এক কোণে কাপড় মুড়ি দিয়ে তিনি শুয়েছিলেন। ওমর তাড়াতাড়ি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবুবকর তাঁকে থামতে বল্লেন। আবুবকরকে ওমর নিজের চাইতে বিজ্ঞতর জ্ঞান করতেন, তাই তিনি তাঁর কথা মানলেন। আবুবকর আনসারদের বল্লেনঃ তোমরা যে বলেছ, "আমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী আর আল্লাহ্র সেনাদল" এসবই সত্য, কিন্তু আরবরা কেবল কোরেশের কর্তৃত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত কেননা তাদের বংশমর্য্যাদা বেশি; আমি তোমাদের সামনে এই দুই জনকে দাঁড় করছি—এই বলে তিনি ওমরের এবং আবু উবায়দা বিন্ জার্রাহ্-র হাত ধরলেন। ওমর বলেছেন তিনি এই প্রস্তাব খুব অপছন্দ করেন কেন না তিনি আবুবকরের সামনে কর্তৃত্বের ভার নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু আনসাররা বলতে লাগলো, দুইজন নেতা হোক, একজন কোরেশদের অপর জন আনসার-দের। বাদ প্রতিবাদ ও উত্তেজনা বেড়েই চললো। এমন আশঙ্কা হলো

যে সমূহ বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। তখন ওমর বল্লেন: আবুবকর, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলে তার উপরে নিজের হাত রেখে ওমর আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। মোহাজিররা তাঁর অনুবর্তী হলো এবং আনসাররাও।

বানু সায়েদার গৃহে আবুবকরের কাছে আনুগত্য স্বীকারের পরের দিন নামাযের সময় ওমর উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন:.........আমাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর উপরে আল্লাহ্ আপনাদের শাসনভার দিয়েছেন; তিনি রসুলের সঙ্গী—গিরিগুহায় তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি (কোরআনের বর্ণনা অনুসারে), কাজেই আপনারা উঠে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করুন। তাঁর কথা শুনে লোকেরা একযোগে আবুবকরের আনুগত্য স্বীকার করলো —পূর্বদিনের আনুগত্য স্বীকারের পরে।

আবুবকর আল্লাহ্র প্রশংসা করে বল্লেন: আমাকে আপনাদের উপরে কর্তৃত্ব-ভার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। আমি যদি ভাল কাজ করি তবে আমাকে সাহায্য করবেন, আর যদি মন্দ কাজ করি তবে আমাকে সংশোধন করবেন। • সত্য আনুগত্যে আর মিথ্যা বিশ্বাসঘাতকতায়। আপনাদের মধ্যে যে দুর্বল সে হবে আমার চোখে সবল যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র ইচ্ছাক্রমে তার অধিকার আমি আদায় করি, আর আপনাদের মধ্যে যে সবল সে হবে আমার চোখে দুর্বল যে পর্যন্ত না আমি তার কাছ থেকে অধিকার কেড়ে নিই। যদি কোনো জাতি আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করতে বিরত হয় তবে আল্লাহ্ তাদের লাঞ্ছিত করবেন। অধর্ম কোনো জাতির ভিতরে ব্যাপক হলে আল্লাহ্ তাদের সবার উপরে দুর্বিপাক আনেন। আপনারা আমার অনুসরণ করুন যে পর্যন্ত আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুসরণ করি, আর আমি যদি তাঁদের অবাধ্য হই তবে আমার প্রতি বশ্যতা স্বীকার আপনাদের জন্য কর্তব্য হবে না। এইবার নামাযে দাঁড়ান, আল্লাহ্ আপনাদের উপর করুণা করুন।

আবুবকরকে নেতা নির্বাচনের পরে লোকেরা মঙ্গলবার দিন হযরতের

কাফন দাফনের জন্য এলো। তাঁর গায়ের জামা খুলে তাঁকে গোছল দেওয়া হয়নি, সেই জামার উপরেই পানী ঢালা হয়েছিল ; আর তিনি যেখানে শেষ নিঃশ্বাস মোচন করেন সেখানেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। আবু বকর বলেন ; হযরতকে তিনি বলতে শুনেছিলেন, নবীরা যেখানে প্রাণ ত্যাগ করেন সেখানেই সমাহিত হন।

বুধবারের রাত্রে, অর্থাৎ মঙ্গলবারের দিন গত রাত্রি দুপুরে; হযরতের সমাধি দেওয়া শেষ হয়।

হযরতের পরলোক গমনের পরে কবি হাস্‌সান তাঁর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ শোকগাথা রচনা করেন—তার দুটি চরণ এই ঃ

তিনি ছিলেন সেই আলোক ও দীপ্তি যা আমরা অনুসরণ করতাম।

তিনি ছিলেন দর্শন ও শ্রবণ, আল্লাহর পরেই ॥

মুসলিম মণ্ডলীর খলিফা মনোনীত হয়ে আবু বকরের প্রথম কাজ হলো ওসামার নেতৃত্বে সিরিয়া অভিযানকারীদের রওনা করে' দেওয়া, কেন না এইটি ছিল রসুলের বিশেষ ইচ্ছা। এ সময়ে নব-গঠিত মুসলিম রাজ্যের নানাস্থানে অশান্তি ও বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল। অনেকে ইচ্ছা করেছিলেন এ সময়ে বিশ্বাসীদের দূরে পাঠানো সঙ্গত হবে না, বরং তাদের মদিনা রক্ষার জন্য কাছে রাখাই দরকার। কিন্তু আবু বকর কিছুতেই তাতে সম্মত হলেন না, কেন না রসুল ওসামাকে সিরিয়া অভিযানের নেতা নিযুক্ত করে গেছেন। অশেষ সম্মান দেখিয়ে ওসামাকে তিনি রওনা করিয়ে দিলেন। প্রধানদের মধ্যে কেবল ওমর তাঁকে উপদেশ দেবার জন্য রয়ে গেলেন।

আশ্চর্য বীরত্ব দেখিয়ে ওসামা শত্রুপক্ষকে পরাভূত করলেন, আর মদিনায় ফিরলেন পূর্ণ বিজয়-গৌরবে তাঁর পিতার অশ্বে আরোহণ করে'।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনুবৃত্তি

আরবের প্রাচীন ঐতিহ্য

আরবের ও আরবের লোকদের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একালে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। বিখ্যাত আরব-তত্ত্ববিদ হিটটির History of the Arabs গ্রন্থে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে। কিন্তু আমরা আরবের সুপরিচিত ঐতিহ্যের কথাই যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করেছি, তার কারণ, আমাদের মুখ্য বিষয়, কোরআনের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত আরব ও আরবের জনজীবন। হিট্‌টি বলেছেন, বেদুইনদের মধ্যে যেসব শক্তি সুপ্ত ছিল প্রাথমিক ইসলামের দ্রুত ও প্রায় তুলনাহীন বিকাশে তার বিশেষ পরিচয় রয়েছে। স্বনামধন্য আরব মনীষী ইবনে খলদুনও মরুচারী বেদুইন জাতির অনেক অমূল্য গুণপনার উল্লেখ করেছেন। অনেক ভাল গুণ তাদের যে ছিল গবেষণা না করেও তা স্বীকার করে' নেওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় তাদের অনেক দোষেরও কথা—যার জন্য তাদের অসাধারণ কীর্তি তেমন স্থায়ী হতে পারে নি। আরবদের প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধানী তেমন না হয়ে আমরা বরং তাদের পরবর্তী, অর্থাৎ ইসলামীয় যুগের, সাফল্য ও বিফলতার দিকেই বেশি তাকিয়েছি। বলা বাহুল্য তাদের সেই বড় রকমের সাফল্য আর বড় রকমের বিফলতার দিকটাই এ পর্যন্ত বেশি অর্থপূর্ণ হয়েছে।

হযরতের প্রত্যাদেশ লাভ

হযরত আয়েশা বলেছেন ঃ

যখন আল্লাহ মোহম্মদকে সম্মানিত করতে চাইলেন, আর তাঁর সাহায্যে তাঁর (আল্লাহর) দাসদের উপরে করুণা প্রদর্শন

করতে চাইলেন, তখন পয়গাম্বরের কাছে প্রথম প্রত্যাদেশের লক্ষণ ব্যক্ত হয়েছিল সত্য স্বপ্নসমূহের দ্বারা; সেইসব স্বপ্ন ছিল প্রভাতের মতো উজ্জ্বল। আল্লাহ্ তাঁকে নির্জনতাপ্রিয় করেছিলেন—নির্জনে সময় কাটাতেই তিনি সব চাইতে বেশি ভালবাসতেন।

হযরত হেরা গিরিগুহায় প্রথম যে প্রত্যাদেশ লাভ করলেন সেটি নিদ্রিত অবস্থায়। অন্য কথায়, সেটিও স্বপ্নের ব্যাপার—কিছুদিন থেকে যার অভিজ্ঞতা তাঁর হচ্ছিল। তবে এবার তাঁর যে অভিজ্ঞতা হলো তা রূঢ়, আর আল্লাহর দূত জিব্রিলকে তিনি দেখলেন।

প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে অন্য রকমের অভিজ্ঞতাও হযরতের হ'ত, যেমন, বুখারির একটি হাদিসে আছে:

> কখনো কখনো এই ওহি আমার কাছে আসে ঘণ্টার ধ্বনির মতো, তাতে আমার খুব কষ্ট হয়। যখন এই ঘণ্টার ধ্বনি থেমে যায় তখন আমার মনে থেকে যায় যা বলা হয়েছিল। অন্য সময়ে ফেরেশতা আমার কাছে আসে মানুষের রূপে আর আমার মনে থেকে যায় যা সে বলে।

অপর একটি হাদিসে আছে: খুব শীতের দিনে তিনি ওহি লাভ করতেন। হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন ইব্‌নে খলদুন।

প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে ইবনে খলদুন আরো বলেছেন: দেখা যায় যাঁরা প্রত্যাদেশ পান তাঁরা স্বভাবতঃ মহৎ প্রকৃতির আর পবিত্রহৃদয়, আর অলৌকিক ব্যাপার তাঁদের জীবনে ঘটে।

সুফীরাও অলৌকিকতায় বিশেষভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।

অন্য কথায়, প্রাচীন মুসলিম মনীষীরা ওহি, প্রত্যাদেশ, এসব বলতে এক অলৌকিক ব্যাপারই প্রধানত বুঝেছিলেন। এর ব্যাখ্যা দিতে তাঁরা চেষ্টা করেন নি।

সুবিখ্যাত মোতাযেলা সম্প্রদায় অবশ্য কোরআনের ভাষা আর

ভাব এই দুইকে বিভিন্ন করে' দেখতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁরা বলতে চেষ্টা করেছিলেন, কোরআনের ভাব প্রত্যাদেশের, অর্থাৎ অলৌকিক প্রেরণার, ব্যাপার, কিন্তু কোরআনের ভাব আর ভাষা দুইকেই যদি তুল্যরূপে দিব্য ও শাশ্বত জ্ঞান করা হয় তবে যা বস্তু, যাকে ধরা ছোঁওয়া বা দেখা যায়, তাকেও দিব্য ও শাশ্বত জ্ঞান করা হয়।

মোতাযেলাদের এই চিন্তা মুসলমান-জগতে গৃহীত হয় নি। সেই জগতের স্বীকৃত মত এই যে শুধু কোরআনের ভাব নয়, তার শব্দ, তার অক্ষর, সবই কোনো বিশেষ সময়ে সৃষ্ট নয়—সেসব চিরন্তন।

আমরা জানি ভাব প্রকাশ পায় ভাষার সাহায্যে। শ্রেষ্ঠ প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা ও ভাবের যোগ যেন অঙ্গাঙ্গী। তাই যাঁরা কোরআনের ভাব আর ভাষাকে পৃথক করে' দেখতে রাজী হন নি তাঁদের কথা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু তবু ভাব আর ভাষা এই দুইকে পৃথক করে' দেখবার প্রয়োজন আছে। কালে কালে সেই প্রয়োজন বড় হয়েই দেখা দিয়েছে।

যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ এটি আরবী কোরআন; আরবদের কাছে আরবীতে কোরআন না এলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হতো।—কিন্তু কালে কালে কোরআন যখন এমন সমস্ত লোকের ধর্মগ্রন্থ হয়েছে যাদের ভাষা আরবী নয়, তাদের কাছে নিশ্চয়ই আরবী কোরআন আরবদের কাছে যেমন অর্থপূর্ণ, অর্থাৎ সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক, তেমন অর্থপূর্ণ হতে পারে না; অন্য কথায়, এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে কোরআনের ভাব ও ভাষা এই দুইয়ের তুল্য গুরুত্ব দেবার উপায় নেই; এমন ক্ষেত্রে ভাবকে বেশি গুরুত্ব দিতেই হবে।

আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তায় যখন বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দেয় তখন ভাবের মধ্যেও কোন্‌টি প্রধান কোন্‌টি অপ্রধান, কোনটি পরিবর্তিত কালে বেশি অর্থপূর্ণ হয়েছে, কোন্‌টি তা হয় নি, এসবের বিচার করতে হয়। কাজেই সেকালের মোতাযেলাদের আর সুফীদের মধ্যে যাঁরা কোরআনের ভাবের উপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন,

কোরআনের আক্ষরিকতা-বাদীদের চাইতে তাঁদের মর্যাদা একালে স্বভাবতই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন কালের এই নতুন দাবি যদি স্বীকৃত হয় তবে কোরআন মূলতঃ যে প্রেরণার ব্যাপার—inspiration, instinct, intuition—ওহি-র মূল অর্থ তাই †—আর সেই প্রেরণা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কল্যাণের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত, স্বতঃই এই বড় সত্যের উপরে জোর বেশি পড়ে।

মারমাডিউক পিক্‌থল বলেছেন: প্রত্যাদেশ লাভের পূর্বে হযরত ছিলেন একজন যুক্তিবাদী 'হানিফ'; কাজেই ফেরেশ্‌তা, দৈববাণী, এসবের যে নতুন অভিজ্ঞতা তাঁর হলো তাতে তাঁর মনে হয়েছিল, মনের উৎকর্ষের দিক দিয়ে তাঁর পতন ঘটেছে, তিনি কবিদের মতো খেয়ালী হয়েছেন, তাই তিনি নিজেকে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দেবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ক্রমে তিনি তাঁর নতুন অভিজ্ঞতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর পত্নী খদিজার আর খদিজার আত্মীয় ভাবুক ওরাকার বাণী তাঁকে তাঁর নতুন অভিজ্ঞতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে।

কিন্তু কোরআনের বাণী এক অতিপ্রাকৃত পদ্ধতিতে লাভ হলেও মূলতঃ তা যুক্তি, কাণ্ডজ্ঞান, মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, এসবের সঙ্গেই বিশেষভাবে যুক্ত। মোতাযেলারা বলেছিলেন: ধর্মশাস্ত্রের বাণীর সুসঙ্গত হওয়া চাই যুক্তি-বিচারের সঙ্গে। কোরআনে বার বার বলা হয়েছে, কোনো অলৌকিক ব্যাপার ঘটাবার জন্য নবী আসেন নি, তিনি এসেছেন মানুষদের তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন্‌টি সুপথ আর কোন্‌টি বিপথ তা জানিয়ে দিতে, আর এই কথা মানুষদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে মানুষের মর্ত্য জীবনই একমাত্র জীবন নয়, সেটি তার অনন্ত জীবনের একটা অংশ মাত্র।—কিন্তু অলৌকিক ব্যাপার ঘটানোর প্রতি হযরতের অপ্রবণতা কোরআনে দেখা গেলেও তাঁর প্রাচীন চরিত-

† দ্রষ্টব্য: ২০: ৩৮-৩৯ [যখন আমি তোমার (মূসার) মাতাকে ওহি দিয়েছিলাম…]; ১৬: ৬৮ (আর তোমার পালয়িতা মৌমাছিকে ওহি দিলেন……)।

কথায় ও হাদিসে তাঁর দ্বারা সম্পাদিত, অথবা তাঁর সম্পর্কে, বহু অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে। কিন্তু কোরআনের শিক্ষার সঙ্গে সেসব মূলতঃ যখন সুসঙ্গত নয়, তখন সেকালের লোকদের মতো সেসবের মূল্য দিতে একালে আমরা বাধ্য নই, বিশেষ ক'রে একালে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ আমাদের সামনে যখন সত্য ও কল্যাণের এক নতুন রূপ উন্মুক্ত করেছে। পর্যবেক্ষণ ও অভিনিবেশ এই দুয়ের উপরে কোরআনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মুসলমানেরা একদিন বিজ্ঞানের অগ্রগতির বাহন হতে পেরেছিলেন পর্যবেক্ষণ ও অভিনিবেশের উপরে জোর দিয়েই। কোরআনের শিক্ষার এই দিকটার কথা আমাদের নতুন ক'রে ভাববার দিন এসেছে।

সেকালের নবীদের সম্পর্ক অনেক অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ অবশ্য কোরআনে আছে। সেসব সম্বন্ধে একটু পরেই আমরা আলোচনা করবো।

হযরতের অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে হাদিসে আছেঃ ঝড়ের আয়োজন দেখলে তিনি শঙ্কিত হতেন এই ভেবে যে সেই ঝড় আল্লাহ্‌র শাস্তি বয়ে আনতে পারে—পূর্বে যেমন অন্যায়কারী জাতিদের জন্য এনেছিল। মানুষের পাপ, অন্যায়, এসব সম্বন্ধে অতি-প্রখর চেতনা হয় তো ছিল হযরতের এমন ধারণার মূলে। প্রতিভাবানদের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেতনার অতিপ্রাখর্য দেখা যায়।

শয়তানের আরোপ-করা কথা

শয়তান, অর্থাৎ মানুষের জন্য যা মন্দ সেই প্রবণতা, মানুষকে যে তার জীবনের কল্যাণ-পথ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে প্রবলভাবে চেষ্টা করে তার বড় দৃষ্টান্ত বুদ্ধ ও খৃষ্টের জীবন-কথায় আছে। কিন্তু সেসব তাঁদের জীবন-কথায় প্রধানত রূপক রূপেই স্থান পেয়েছে। হযরতের জীবনে শয়তানের যে বড় প্রলোভন দেখা দিল তা বাস্তবের বেশি কাছাকাছি। তাঁকে যে তাঁর দেশের লোকেরা বিত্ত ও মান-প্রতিপত্তির প্রলোভন দেখিয়েছিল তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। কিন্তু তার

চাইতে সূক্ষ্ম ও অনেক শক্তিশালী এই প্রলোভন যে, তাঁর যে মুখ্য উপলব্ধি—অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বিশ্বনিয়ামক চিরজীবন্ত আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার—সেটি কিঞ্চিৎ বিশেষিত করা হোক দেশ-প্রচলিত বহু-দেববাদের সঙ্গে তার আংশিক যোগ ঘটিয়ে—তাতে তাঁর আশু সাফল্য লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

উচ্চ অর্থপূর্ণ চিন্তার সঙ্গে প্রচলিত দুর্বল ও অকার্যকর চিন্তার মিশ্রণ কালে কালে সব ধর্মেই ঘটেছে। কিন্তু জগতের বড় ধর্মগুলোর প্রধান গৌরব এই যে, যে সব চিন্তা সর্বকালে মানুষকে শক্তি ও সার্থকতা দেবে সেসবে তেমন চিন্তার স্থান লাভ হয়েছে। হযরত মোহম্মদের দ্বারা প্রচারিত নির্ভেজাল একেশ্বরবাদ মানুষের জন্য তেমনি একটি নির্ভরযোগ্য জীবন-বর্ধক চিন্তা। তার কিছু ইতর বিশেষ করলেই হযরতের দেশের লোকদের ও তাঁর মধ্যে যে কঠিন বিরোধ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তার থেকে উদ্ধারের একটা উপায় দেখা যাচ্ছিল। এই নিদারুণ প্রয়োজনবোধ হযরতের সত্যনিষ্ঠ সবল মনকেও যে ক্ষণকালের জন্য বিভ্রান্ত করবে এটি মানবিক। তাঁর গৌরব, এবং মানুষের জন্য সৌভাগ্যের, কথা এই যে তিনি এমন প্রলোভনে বন্দী হয়ে পড়েন নি—বরং অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন ক্ষণকালের জন্য তাঁর যে মতিভ্রম ঘটেছিল তার কথা।

হযরত মোহম্মদের চেতনার সবল দিক আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল দিক এই দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষের চিত্র কোরআনে আরো কয়েক জায়গায় আমাদের চোখে পড়ে। যেমন, ওহোদের যুদ্ধে, শত্রুপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হয়ে যখন তিনি বলছিলেন : "কেমন করে সেই জাতির ভালো হতে পারে যারা তাদের পয়গাম্বরের মুখ রক্তরঞ্জিত করেছে, যখন তিনি তাদের আহ্বান করছেন তাদের প্রতিপালকের দিকে ?" তখন তাঁর লাভ হয় এই বাণী : "এটি তোমার ব্যাপার আদৌ নয় যে তিনি তাদের দিকে (সদয়ভাবে) ফিরবেন, না, শাস্তি দেবেন, যদিও নিঃসন্দেহ তারা অন্যায়কারী (৩ : ১২৭)"। অথবা সেই যুদ্ধেরই পরে হামযার দেহকে

কিভাবে বিকলাঙ্গ করা হয়েছে তা দেখে তিনি যখন অধীর হয়ে বলছেন ঃ "ভবিষ্যতে আল্লাহ্ সুযোগ দিলে বিপক্ষের ত্রিশ জনকে আমি বিকলাঙ্গ করবো", তখন তিনি পাচ্ছেন এই বাণী ঃ "আর যদি তোমরা প্রতিঘাত করো তবে তোমাদের যতটা আঘাত দিয়েছিল তার মতো দাও; আর যদি ধৈর্য ধরো, নিঃসন্দেহ তা ভাল যারা ধৈর্যবান তাদের জন্য; আর ধৈর্য ধরো, আর তোমার ধৈর্য আল্লাহ্ থেকে বৈ নয় (৩ ঃ ১২৬-৭)"। সুবিখ্যাত Forgive thy enemy-বাণীর সঙ্গে কোরআনের এই বাণী মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। কোরআনে Forgive thy enemy, তোমার শত্রুকে ক্ষমা করো, এই মহৎ চিন্তাকে স্বল্পমূল্য জ্ঞান করা হয় নি। তবে সেই চিন্তার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বাস্তবের ক্ষেত্রে যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয় তার উল্লেখ কোরআনে স্পষ্টতর। বাস্তবের ও আদর্শের এই সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের চিত্র কোরআনে যা আছে মানুষের প্রতিদিনের জীবনে তা খুব অর্থপূর্ণ।

বিবি যয়নাবের সঙ্গে বিবাহ

আমরা জেনেছি বিবি যয়নাবের নিজের ইচ্ছা ছিল হযরতের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁর ও তার ভাইয়ের ইচ্ছার উপরে স্থান লাভ হলো আল্লাহর তরফ থেকে আসা এই আদেশের ঃ

> আর এটি সঙ্গত নয় একটি বিশ্বাসী পুরুষের অথবা একজন বিশ্বাসিনী নারীর জন্য যে যখন আল্লাহ আর তাঁর রসুল (তাদের জন্য) একটি ব্যাপারের মীমাংসা করেছেন (তার পর) তাদের সে বিষয়ে কিছু বলবার থাকবে; আর যে কেউ আল্লাহ আর তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচারী হয়, সে নিঃসন্দেহ বিপথে যায় স্পষ্ট বিপথে যাওয়ায়। (৩৩ ঃ ৩৬)।

এর পর যায়েদের সঙ্গে বিবি যয়নাবের বিবাহ হয়; আর সে-বিবাহ সুখের হয় না; আর তার ফলে যায়েদ বিবি যয়নাবকে

তালাক দেন—সেসব কথাও আমরা জেনেছি। এর পর হযরতের সঙ্গে বিবি যয়নাবের বিবাহ সম্বন্ধে এই বাণী অবতীর্ণ হয়ঃ

আর যখন তুমি তাকে বলেছিলে যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন আর তুমিও অনুগ্রহ করেছঃ তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো, আর আল্লাহর সীমা রক্ষা করো; আর তুমি তোমার মনে লুকিয়ে রেখেছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করবেন; আর তুমি মানুষদের ভয় করেছিলে কিন্তু আল্লাহর বেশি হক আছে যে তুমি তাঁকে ভয় করবে। কিন্তু যখন যায়েদ তার সম্বন্ধে মীমাংসা করেছে (তালাক দিয়েছে), তখন আমি তাকে তোমাকে দিয়েছি পত্নীরূপে, যেন বিশ্বাসীদের তাদের পালিত পুত্রদের সম্বন্ধে কোনো বাধা না হয় যখন তারা তাদের সম্পর্কে মীমাংসা করেছে। আর আল্লাহর আদেশ পালিত হবে। (৩৩ঃ ৩৭)।

এই আয়াতের যে কথাটি "আর তুমি তোমার মনে লুকিয়ে রেখেছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করবেন" সেই লুকোনো ব্যাপারটি কি তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। ঐতিহাসিক তাবারি-র গ্রন্থে আছেঃ

একদিন হযরত যায়েদের গৃহে যান; কিন্তু তখন যায়েদ বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি দরজায় আঘাত করতে তাঁর স্ত্রী যয়নাব দরজা খুলে দেন ও হযরতকে ভিতরে আসতে বলেন। বিবি যয়নাবের বেশবাস ছিল কিছু অসংবৃত—তাঁর রূপলাবণ্য দেখে হযরত বলে' ওঠেনঃ আল্লাহর প্রশংসা কীর্তিত হোক...তুমি কেমন করে মানুষের মনকে ফেরাও (অথবা তিনি মানুষের মনের নিয়ামক)। † অনুচ্চ কণ্ঠে হযরত এই কথা বলেছিলেন, কিন্তু কথাটি বিবি যয়নাবের কানে যায়, আর তিনি যায়েদকে সেকথা বলেন। যায়েদ যয়নাবকে তালাক দেবার প্রস্তাব হযরতের কাছে করেন। কিন্তু হযরত তাঁকে

† মূয়র ২৯০ পৃঃ ও Spirit of Islam ২৩৫-পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বলেন : তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো আর আল্লাহর সীমা রক্ষা করো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবি যয়নাবের সঙ্গে যায়েদের বনিবনাও হয় না, আর তিনি তাঁকে তালাক দেন—উপরে উদ্ধৃত আয়াতে তার উল্লেখ আছে।—তাবারির মতে—এবং তাঁর অনুবর্তীদেরও মতে—হযরতের মনে লুকিয়ে-রাখা চিন্তা হচ্ছে বিবি যয়নাবকে পত্নীরূপে লাভ করার জন্য তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সহজেই বোঝা যায় এটি এক কবিত্বময় উপাখ্যান। এই লুকিয়ে রাখা চিন্তার বরং অন্য অর্থ বেশি সঙ্গত, সেটি হচ্ছে—এই বিবাহে যয়নাব যে অসুখী হয়েছেন হযরতের তরফে তার স্বীকৃতি, আর এই সংকটের একটা সুরাহা করা। হযরতের সঙ্গে বিবাহিত হওয়া বিবি যয়নাবের জীবনে কত আকাঙ্ক্ষিত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে এই ব্যাপারে যে, যে দাসী তাঁর কাছে হযরতের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল তাকে তিনি তাঁর গায়ের সমস্ত গহনা দিয়ে দিয়েছিলেন।—বিবি যয়নাবের সঙ্গে হযরতের বিবাহের পরে হযরতের কর্মব্যস্ত জীবনে ও তাঁর অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় নি। আর বিবি যয়নাব হয়েছিলেন বিশেষ ভাবে ধর্মানুরাগিণী, আর দানশীলতার জন্য তিনি পেয়েছিলেন "দরিদ্রদের মাতা" এই নাম।

আরবের প্রচলিত নিয়ম ছিল যে পালিতপুত্রের পরিত্যক্ত স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ হতে পারবে না। এই প্রচলিত রীতিকে কোরআনে মান্য করা হয় নি।

> আল্লাহ্ কোনো মানুষের জন্য তার ধড়ের মধ্যে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি ; তোমাদের স্ত্রীদেরও যাদের (তোমরা মা বলে') প্রকাশ করো তাদের তোমাদের মা করেন নি, যাদের তোমরা পুত্র বলে' ঘোষণা করো তাদের তোমাদের আসল পুত্র করেন নি। এসব তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহ্ সত্য বলেন, আর তিনি সেই পথে চালিত করেন (৩৩ : ৪)।

পরিখার যুদ্ধ ও বনি কোরেযার বিচার

পরিখার যুদ্ধে গতফান গোত্রের নুয়াইম্ বিন্ মাস্উদ মুসলমানদের হয়ে ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল আর তার এমন ক্ষেত্রে ছলনার আশ্রয় নেওয়ায় হযরতের সম্মতি ছিল, এ কথা আমরা জেনেছি। হাদিসে এমন ক্ষেত্রে ছলনার আশ্রয় নেওয়া বৈধ বিবেচনা করা হয়েছে। কোরআনেও বলা হয়েছে ঃ

আর তুমি যদি কোনো দল থেকে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় করো তবে (সন্ধি) তাদের দিকে ফেলে দাও তুল্যভাবে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ভালবাসেন না। (৮ ঃ ৫৮)

কাজেই মৌলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁ কেন যে এই ব্যাপারকে অবিশ্বাস্য জ্ঞান করেছেন তা বোঝা গেল না।

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ এই নীতি সুপ্রসিদ্ধ। তবে কথা হচ্ছে একজন নবীর পক্ষে এই নীতির আশ্রয় নেওয়া সঙ্গত কিনা। এর উত্তরে বলা যায়, সাধারণতঃ একজন নবীর জন্য এই নীতি অপ্রশস্ত। কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে অনেক শ্রেষ্ঠ মানবকে এই নীতির আশ্রয় নিতে দেখা গেছে। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা স্মরণীয়। পরিখার যুদ্ধে হযরতকে ও তাঁর সমস্ত অনুবর্তীদের যে এক বিষম সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। হযরত এক বড় আদর্শবাদী, কিন্তু বাস্তবের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি প্রখর। মোট কথা এমন সংকটাপন্ন ক্ষেত্রে একজন মহামানবও কেমন ব্যবহার করবেন তা আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না।

পরিখার যুদ্ধের শেষে বনি কোরেযার যে দণ্ড লাভ হল, স্বীকার করতে হবে তা কঠোর। সেই দণ্ডের সমর্থনে বলা যায়—হযরত নিজে বনি কোরেযাকে এই দণ্ড দেন নি, তাদের উপরে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন তাদেরই নির্বাচিত বিচারক, আর সেই দিনে যুদ্ধকালে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য এমন কঠোর দণ্ডই ছিল সুপ্রচলিত। কিন্তু প্রচলিত রীতি, অনুসারে এমন দণ্ড দান বৈধ ছিল কিনা সেইটি বড় প্রশ্ন নয়, বড় প্রশ্ন

হচ্ছে—হযরতকে যে কোরআনে বলা হয়েছে 'বিশ্বজগতের জন্য করুণা' এমন দণ্ড দানে, অথবা এমন দণ্ডের সমর্থনে, তাঁর সেই করুণা প্রকাশ পেয়েছে কিনা। হযরতের ইয়োরোপীয় সমালোচকরা অনেকেই এমন দণ্ডদানে ইহুদীদের প্রতি হযরতের নৃশংসতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছু পান নি, যদিও হযরতের জীবনে একটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনা এই যে এর পরে খয়বরে একটি ইহুদী স্ত্রীলোক তাঁর খাদ্যে বিষ দিয়ে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার সেই অপরাধ তিনি ক্ষমা করেছিলেন।

বনি কোরেযার বিচারে হযরতের করুণার দিকটার বিশেষ প্রকাশ ঘটে আল্-যাবিরের প্রতি তাঁর আচরণে। হযরতের অনুবর্তী সাবিতের অনুরোধে হযরত যাবিরকে প্রাণ ভিক্ষা দেন, শুধু যাবিরকে মুক্তি দান নয়, সাবিতের অনুরোধে যাবিরের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, জমিজমা, এসবও ফিরিয়ে দিতে তিনি স্বীকৃত হন। কিন্তু যাবিরের গোত্রের অনেকে নিহত হয়েছিল বলে' যাবির জীবনধারণ করার চাইতে মৃত্যুবরণ শ্রেয় জ্ঞান করে।

যাবিরের এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় বনি কোরেযার সপক্ষে যদি কেউ সুপারিশ করতেন তবে সম্ভবতঃ হযরত তাদের দণ্ড হ্রাস করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেউ তাদের সপক্ষে তেমন সুপারিশ করেন নি।

প্রশ্ন হতে পারে: বনি কোরেযার বিরুদ্ধে যে দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হলো তা কঠোর, সে ক্ষেত্রে হযরতের নিজের থেকেই তা হ্রাস করা উচিত ছিল।

কিন্তু সেক্ষেত্রে বাধা এই ছিল যে যিনি দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন সেই সা'দ বিন্ মোয়ায পূর্বেই মুসলমান-পক্ষ (মুসলমান-পক্ষের মধ্যে ছিল বনি কোরেযার মিত্র আউস গোত্রের লোকেরা) ইহুদী পক্ষ ও হযরত এই তিন পক্ষের কাছ থেকেই এই স্বীকৃতি নিয়েছিলেন যে তাঁর দেওয়া রায় তাঁরা সবাই মেনে নেবেন।

হযরতের চিন্তায় দেখা যায়, আল্লাহ্‌র অনন্ত করুণায় তিনি একান্ত বিশ্বাসী, সেজন্য মানুষরা পরস্পরের প্রতি করুণাপূর্ণ আচরণ করবে এইই

তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন ; সেই সঙ্গে এই প্রত্যয়ও তাঁর ভিতরে প্রবল ছিল যে অন্যায়ের জন্য ব্যক্তিরা ও জাতিরা আল্লাহ্‌র বিধানে অতীতে কঠোর শাস্তি ভোগ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। বনি কোরেযার এমন কঠোর শাস্তি ভোগ হয় তো তাঁর বিবেচনায় ছিল তেমন এক ঐশ্বরিক বিধান।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের মুখেও এমন প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছিল—পাপাচারী হওয়ার জন্য কৌরবদের তিনি জ্ঞান করেছিলেন মৃত, কাজেই তাদের বধের ব্যাপারে অর্জুন ছিলেন নিমিত্তমাত্র।

আনক রকমের চিন্তার ভিতর দিয়ে মানুষ তার ইতিহাসের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে। পরে পরে সেই চিন্তাধারার সবটাই পরবর্তীদের গ্রহণীয় হয় নি। অতীতের এই এক-ধরনের নিয়তিবাদ একালে আমাদের মনঃপূত নয়। এই নিয়তিবাদের চাইতে আমরা বেশি মূল্য দিই মাত্রা-বোধকে আর সদয়তা ও করুণা প্রদর্শনকেই। হযরত যদি কোনো উপায়ে বনি কোরেযার প্রতি এমন কঠোর দণ্ড হ্রাস করতে পারতেন তবে নিশ্চয়ই আমরা বেশি খুশী হতাম। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, শ্রেষ্ঠ মানবদেরও চিন্তা সর্বকালে একই ধারা অনুসরণ করে নি।

বিপক্ষের প্রতি হযরতের আচরণ

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে হযরত এক অতিশয় স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এতে তাঁর ব্যক্তিত্বের এক অসাধারণ প্রকাশ তো ঘটেই—কেন না অনুবর্ত্তীদের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কর্মধারাকে জয়ী করতে পেরেছিলেন—তার সঙ্গে তুল্য গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটি যে এতে তাঁর শান্তিকামিতাও উজ্জল হয়ে প্রকাশ পায়।

বিপক্ষের প্রতি আচরণে হযরতের চিন্তায় এইসব স্তর লক্ষ্য করা যায়ঃ তাঁর অনুবর্ত্তীদের উপরে বিপক্ষের অত্যাচার যখন প্রবল হয়ে উঠলো তখন তিনি তাঁদের অনেককে দেশত্যাগ করে' মিত্রভাবাপন্ন আবিসিনিয়া রাজ্যে আশ্রয় নিতে বল্লেন ; আর বিপক্ষ সম্বন্ধে এই বাণী তাঁর লাভ হয়ঃ

আর নিঃসন্দেহ আমরা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবো আমাদের উপরে তোমাদের আঘাত, আর আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করবে নির্ভরকারীরা। (১৪: ১২)

আর সেই সঙ্গে তিনি এই অভয়-বাণীও লাভ করেন:

আর অবিশ্বাসীরা তাদের পয়গাম্বরদের বলেছিল: নিশ্চয় আমরা তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব, অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। সেজন্য তাঁদের পালয়িতা তাঁদের প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন: নিঃসন্দেহ আমি ধ্বংস করবো অন্যায়কারীদের;

আর নিঃসন্দেহ তাদের পরে আমি তোমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবো। এটি তার জন্য যে ভয় করে আমার সামনে দাঁড়াতে, আর ভয় করে আমার শাস্তি। (১৪: ১৩—১৪)।

কিন্তু বিপক্ষের অত্যাচার কঠোর হতে কঠোরতর হয়ে চললো। শেষে তারা সংকল্প গ্রহণ করলো সব গোত্রের লোক মিলে এক যোগে হযরতকে আঘাত হানবে। তখন হযরতেরও লাভ হল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার এই অনুমতি:

যারা যুদ্ধ করে তাদের অনুমতি দেওয়া গেল, কেন না তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, আর আল্লাহ্‌ নিঃসন্দেহ সক্ষম তাদের সাহায্য করতে—যারা তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে অন্যায়ভাবে; এইজন্য ভিন্ন নয় যে তারা বলে: আমাদের পালয়িতা আল্লাহ্‌। আর যদি না থাকতো আল্লাহ্‌র প্রতিরোধ মানুষের একদলের দ্বারা অন্য দলের, তবে নিঃসন্দেহ ভেঙে ফেলা হতো মঠ গির্জা ইহুদীভজনালয় ও মসজিদ্‌ যাতে আল্লাহ্‌র নাম প্রচুরভাবে নেওয়া হয়, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাকে সাহায্য করবেন যে তাঁকে সাহায্য করে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ সবল, মহাশক্তি—(২২: ৩৯—৪০)।

আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত পীড়ন আর না থাকে আর ধর্ম হবে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য। কিন্তু তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ দেখেন তারা যা করে।

আর যদি তারা ফিরে আসে তবে জেনো যে আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু ;—অমূল্য বন্ধু, আর অমূল্য সহায়। (৮ঃ ৩৯—৪০)

কিন্তু এর পরও দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করা থেকে তিনি বিরত থাকেন ; আর সেই কালে মদিনায় ইহুদী, মুসলমান, আর বহুদেববাদীদের নিয়ে মদিনার নিরাপত্তা বিধানের জন্য এক সমঝোথায় উপনীত হন। বলা যেতে পারে সেই চেষ্টা জগতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথম বিশিষ্ট পদক্ষেপ। আর সেই সঙ্গে বিপক্ষের গতিবিধিরও প্রতি তিনি দৃষ্টি রেখে চলেন।

কিন্তু বিপক্ষ একটা আপোষে পৌঁছবার কোনো চেষ্টাই করে না, বরং তার বিপরীত মনোভাবেরই পরিচয় দেয়। তাতে তাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বিপক্ষের সৈন্যদল ছিল মুসলমানদের তিন গুণ, অস্ত্রশস্ত্রেও তারা ছিল বেশি শক্তিশালী। কিন্তু এক অপূর্ব মনোবলের গুণে মুসলমানদল বিজয় লাভ করেন। কিন্তু বিজয় লাভের পরে হযরত এই বাণী পান ঃ

(হে কোরেশ) যদি তোমরা বিচার চেয়ে থাকো তবে নিঃসন্দেহ সেই বিচার তোমাদের জন্য এসেছে : আর যদি তোমরা বিরত হও তবে তা হবে তোমাদের জন্য ভালো ; আর যদি তোমরা ফিরে আসো (যুদ্ধ করতে) আমরাও তবে ফিরে আসবো, আর তোমাদের সৈন্যদল তোমাদের কোনো কাজে আসবে না সংখ্যায় তারা যতই হোক—আর (জেনো) আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের সঙ্গে। (৮ঃ ১৯)

কিন্তু অল্প দিনেই মদিনার ইহুদিরা হযরতের ও মুসলমানদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হলো। তার ফলে বনি কাইনুকা গোত্রের ইহুদিরা মদিনা থেকে নির্বাসিত হলো। কোরেশও শান্তি ও সমঝোথার পথে পদচারণার চাইতে সংঘর্ষের পথ বেছে নিলে। অচিরে ঘটলো ওহোদের যুদ্ধ। তাতে কোরেশদের সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার আর মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল সাত শ’।

এই যুদ্ধেও প্রথমে মুসলমানদেরই বিজয় লাভের সম্ভবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই কালে মুসলমানপক্ষের একদল তীরন্দাজ তাঁদের

নির্দিষ্ট করণীয় অবহেলা করে' বিপক্ষের শিবির লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হলো, ফলে মুসলমানদের সেই প্রায়-নিশ্চিত বিজয় পরিণত হলো বিপর্যয়ে। কিন্তু এই অবস্থায়ও হযরত ও তাঁর অনুবর্তীরা অসাধারণ মনোবলের পরিচয় দিলেন। তাতে কোরেশপক্ষ মুসলমানদের আরো ক্ষতি করার সংকল্প ত্যাগ করে' মক্কায় ফিরে গেল।

মুসলমানদের এই বিপর্যয় লাভের ফলে কোনো কোনো আরব গোত্র মুসলমানদের উপরে আক্রমণ চালাতে তৎপর হল। ইহুদিরাও তৎপর হলো। আরব গোত্রদের আক্রমণ হযরত সামলে নিতে পারলেন। আর বনি নাযির গোত্রের ইহুদিদের তিনি মদিনা থেকে নির্বাসিত করলেন। কিন্তু এর ফলে ইহুদিরা হযরতের প্রতি আরো শত্রুতা করতে বদ্ধ-পরিকর হলো।

ফলে ঘটলো খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীতে। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে কোরেশ ও তাদের মিত্ররা মদিনা অবরোধ করলো। মুসলমানরা আত্মরক্ষার বিশেষ চেষ্টা করলেন মদিনাকে প্রায় বেষ্টন করে' এক দীর্ঘ পরিখা খনন করে'। এই সংকটকালে মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ কোরেযা গোত্রের ইহুদিরাও মৈত্রীর শর্ত ভঙ্গ করলো। এই সমূহ বিপদ থেকে মুসলমানরা কেমন করে' রক্ষা পেলেন অনেকটা দৈবানুকূল্যে, আর কোরেযা-গোত্রের ইহুদিদের কি ধরনের শাস্তি লাভ হলো, তা আমরা জেনেছি।

খন্দকের যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির আর বনি কোরেযার ভাগ্য-বিপর্যয়ের অল্প দিন পরেই ঘটে হুদায়বিয়ার সন্ধি। সেই সন্ধিতে হযরত তাঁর অনুবর্তীদের প্রবল অনিচ্ছা'র বিরুদ্ধে আর অনেকখানি অবমাননা স্বীকার করে' কেমন করে' কোরেশদের সঙ্গে দশ বৎসরের জন্য সন্ধি করেন, তার সঙ্গেও আমরা পরিচিত হয়েছি। যুদ্ধ নয় শান্তিই যে ছিল তাঁর অন্তরের একান্ত কাম্য তার পরিচয় এই হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অত্যন্ত স্পষ্ট।

কিন্তু কোরেশ সেই সন্ধি ও শান্তিও ভঙ্গ করলো। তার ফলে

ঘটলো মক্কা-বিজয়—প্রায় বিনা রক্তপাতে—আর মক্কা-বিজয়ের পরে হযরতের অপূর্ব ক্ষমা ঘোষণা।

এর অব্যবহিত পরেই ঘটে খয়বর বিজয়। ইহুদিদের প্রতি হযরত অকরুণ ছিলেন এই তাঁর সমালোচকেরা বলেছেন। কিন্তু খয়বরে যে ইহুদিদের তরফ থেকে বিষ প্রয়োগে তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টা হয়েছিল আর সেই অপরাধ তিনি ক্ষমা করেছিলেন, তার দিকে মনোযোগ তাঁরা সাধারণত দেন না।

এরপর নবম-হিজরীতে অবতীর্ণ হয় স্থরা আল্-বরাআত অথবা আত্-তওবাহ্ (অব্যাহতি অথবা অনুশোচনা), তাতে বহুদেববাদীদের তাদের পদ্ধতিতে হজ কর্বার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই স্থরার অবতরণের পরে আরবে বহুদেববাদীদের প্রায় কোনো অধিকার থাকলো না, আর ইহুদি ও খৃষ্টানরা আরবে বাসের অনুমতি পায় মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান্য স্বীকার করে' ও জেযিয়া দিয়ে এই কারো করো মত—যেমন হিট্টি মন্তব্য করেছেন All Arabians who remained heathen were outside the pale, almost outlaws। কোনো কোনো মুসলমান ধর্মাচার্যেরও এই মত। কিন্তু কোরআনের সত্যকার মত এইই কি না সেইটি বিচার্য।

স্থরা আল-বরাআতে ঘোষণা করা হল ঃ

আল্লাহ্ ও তাঁর রস্থলের তরফ থেকে সব লোকের প্রতি ঘোষণা বড় হজের দিনে এই মর্মে যে, আল্লাহ্ বহুদেববাদীদের কাছে দায় থেকে নির্মুক্ত, আর তাঁর রস্থলও। সেজন্য তোমরা যদি অনুশোচনা করো—সেটি হবে তোমাদের জন্য ভালো, কিন্তু যদি তোমরা ফিরে আসো, তবে জেনো, তোমারা আল্লাহকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। আর সংবাদ দাও (হে মোহম্মদ) তাদের জন্য কঠিন শাস্তির যারা অবিশ্বাস করে।—সেইসব বহুদেববাদী ব্যতীত যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি আছে আর যারা তখন থেকে কোনো বিষয়ে তোমাদের ক্ষতি করে নি আর

কাউকে তোমাদের বিরুদ্ধে সমর্থন দেয় নি, সেজন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি পালন করো নির্ধারিত কাল পর্যন্ত, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা সীমা রক্ষা করে।

সেজন্য পবিত্র মাসগুলো যখন গত হয়ে যাবে তারপর বহুদেববাদীদের সংহার করো, যেখানে তাদের পাও, আর তাদের বন্দী করো আর তাদের ঘেরাও করো, আর তাদের জন্য লুকিয়ে থাকো প্রত্যেক লুকোবার স্থানে, তারপর যদি তারা অনুতাপ করে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ তাদের জন্য মুক্ত করে দাও, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ফলদাতা। (৯ ঃ ৩-৫)

কিন্তু সেই সঙ্গে এও ঘোষণা করা হলো ঃ

আর যদি বহুদেববাদীদের কেউ তোমাদের আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দাও যেন সে আল্লাহ্‌র বাণী শোনে, তারপর তাকে তার নিরাপত্তার স্থানে পৌঁছে দাও, এটি এই জন্য যে তারা হচ্ছে একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়।(৯ঃ ৬)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সেল (Sale) বলেছেন ঃ

(বহুদেববাদীকে) নিরাপদে তার স্থানে পৌঁছে দিতে হবে যদি সে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করতে না চায়।

এই জটিল ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই ঃ

ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ—এটিকে গ্রহণ করতে হবে কোরআনের একটি বড় স্বীকৃত নীতি হিসাবেই। এর সমর্থন-সূচক বাণী কোরআনে অন্যত্রও আছে। যেমন সূরা 'হুদে' বলা হয়েছে ঃ

আর এটি তোমার পালয়িতার যোগ্য ছিল না যে তিনি বসতিগুলো ধ্বংস করবেন সেখানকার লোকদের ভুল বিশ্বাসের জন্য, যখন সেসবের লোকেরা ছিল সৎকর্মশীল।

(১১ ঃ ১১৭)।

কিন্তু কোরআনের এই ঘোষিত নীতি কিছু বিশেষিত হলো সূরা আল্-বরাআতের দ্বারা—তার বড় কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখা গেল,

বিপক্ষ দল সন্ধির শর্ত মান্য করার জন্য প্রস্তুত নয় আদৌ। সূরা আল-বরাআতেই বলা হয়েছে ঃ

কেমন কোরে (এটি হবে) যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে উপরহাত হতে পারলে তারা তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অথবা সন্ধির কথা ভাববে না ? তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করে তাদের মুখ দিয়ে কিন্তু তাদের হৃদয় অস্বীকার করে, আর তাদের অনেকে দুষ্কৃতিকারী।

তারা আল্লাহর নির্দেশসমূহ দিয়ে সামান্য লাভই কিনেছে, সেজন্য তারা (লোকদের) তাঁর পথ থেকে বাধা দেয়, নিঃসন্দেহ তারা যা করে তা গর্হিত।

একজন বিশ্বাসীর বেলায় তারা আত্মীয়তার বন্ধন অথবা সন্ধির দিকে দৃষ্টি দেয় না, এরাই তারা যারা সীমা লঙ্ঘনকারী। (৯ ঃ ৮-১০)

অবশ্য সহজভাবে সূরা আল-বরাআতের দিকে তাকিয়ে বলা যায়, এই সূরা অবতীর্ণ হবার পরে বহুদেববাদীদের মুসলমানমণ্ডলীভুক্ত না হয়ে আরবে বসবাসের অধিকার রইল না, আর ইহুদি ও খৃষ্টানদের সম্বন্ধে বলা হলো, তারা জেযিয়া দিয়ে আরবে বসবাসের অধিকার পাবে, নইলে নয়, যেমন ঃ

যুদ্ধ করো তাদের সঙ্গে—যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না, শেষদিনেও না, যারা নিষেধ করে না যা আল্লাহ আর তাঁর রসুল নিষিদ্ধ করেছেন, সত্যধর্মও অনুসরণ করে না—তাদের মধ্যে থেকে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে—যে পর্যন্ত না তারা জেযিয়া দেয় প্রাধান্য মেনে আর অধীন হোয়ে (৯ ঃ ২৯)···

ইবনে খলদুন এই বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত মুকাদ্দিমা-র প্রথম খণ্ডের শেষের দিকে স্পষ্টই বলেছেন ঃ

মুসলমানসমাজে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ একটি ধর্মীয় কর্তব্য, কেন না ইসলাম-প্রচার একটি বিধান। সে জন্য মুসলমানদের অবশ্য-কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেককে সেই ধর্মে দীক্ষিত করা—তা যুক্তিতর্কের দ্বারা হোক, অথবা বলপ্রয়োগের দ্বারা হোক।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

(খৃষ্টানদের) সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করার ভার আমাদের উপরে নয়। তাদেরই বেছে নিতে হবে তারা কি চায়—ইসলাম-গ্রহণ, অথবা জেযিয়া দান, অথবা মৃত্যু... ;

কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্ত শুধু যে কোরআনের বহুঘোষিত 'ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ' নীতির পরিপন্থী তাই নয়, 'ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ' এই নীতির ভিত্তিস্থানীয় যে শিক্ষা তারও পরিপন্থী।

সেই শিক্ষাটি রয়েছে কোরআনের এই বিখ্যাত বাণীতে 'তোমাদের পালয়িতা নিজের উপরে বিধান করেছেন করুণা (৬ ঃ ৫৪।' অবশ্য আল্লাহর করুণার সঙ্গে তাঁর শাস্তি দান সুসঙ্গত। কিন্তু সেই শাস্তি হওয়া চাই সংশোধনাত্মক—চিরশাস্তি নয়। কিন্তু সূরা আল-বরাআতের এই ধরনের ব্যাখ্যায় বহুদেববাদীদের ও 'গ্রন্থধারীদের' মুসলমানদের সঙ্গে সহ-অবস্থানের অধিকার যেভাবে বিলুপ্ত করার কথা ভাবা হলো তার সঙ্গে আল্লাহর সর্বব্যাপী করুণা সুসঙ্গত নয়।

কাজেই আমাদের নিবেদন ঃ সূরা আল-বরাআতের বিধানকে গণ্য করতে হবে অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি সাময়িক বিধান—ইসলাম-প্রচারের একটি বিশেষ স্তরে যার প্রয়োজন হয়েছিল।

মুসলমান চিন্তাশীলদের মধ্যে মোতাযেলারা ও সুফীরা কেউ কেউ ইসলামের এমন উদার বা প্রীতিধর্মী ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমান চিন্তাশীলেরা এর প্রয়োজন অনুভব করেন নি—বোধ হয় তার কারণ, ইসলামের দিগ্‌বিজয়ের পটভূমিকায় তাঁদের মত রূপ পেয়েছিল। কয়েক শতাব্দী পরে ইব্‌নে খলদুনের মতো চিন্তাশীলও যে এর প্রয়োজন অনুভব করেন নি, মনে হয়, তারও কারণ, তাঁর সমসাময়িক ইতিহাসের বিশেষ প্রভাব। তখন বাগদাদ্‌ মোঙ্গোলদের হাতে ধ্বংস হয়েছে, স্পেন মুসলমানরা ছেড়ে এসেছে, কিন্তু এই দিনেও ইসলামীয় শাসন ও প্রভাব বিস্তৃত ছিল এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশের উপরে। তাই ইব্‌নে খলদুন

বাহুবলেই ইসলামের নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনার কথা ভাবছিলেন।

কিন্তু কোরআনের—অথবা যে কোনো শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের—সত্যকার শিক্ষা নিরূপণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অথবা কোনো বিশেষ যুগের মতামত মুখ্য বিবেচনার বিষয় নয়, তা সেই ব্যক্তি বা যুগ যত মর্যাদাবান হোক, বড় ব্যাপার কোরআনের—বা ধর্মগ্রন্থের—মুখ্য শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন করে' অবহিত হওয়া—মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব নব সম্ভাবনার আলোকে। সত্যের চিরন্তন মূল্য যাচাই হতে পারে সেই পথেই। "তোমাদের পালয়িতা নিজের উপরে বিধান করেছেন করুণা" (অন্য কথায়, আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টির শেরা মানুষের জন্য চান শ্রেষ্ঠতম সার্থকতা)—কোরআনের এই মহতী বাণীর অর্থ যুগে যুগে নতুন করে' স্মরণ করতে হবে। একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহাত্মা গান্ধী বলেছেনঃ Religion is eternal human conscience—ধর্ম চিরন্তন মানব-বিবেক। *

অলৌকিক কাহিনী

প্রাচীন কালের নবীদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ কোরআনে আছে—যদিও কোরআনেই বার বার ঘোষণা করা হয়েছে যে অলৌকিক-কিছু ঘটাবার জন্য বা প্রদর্শন করবার জন্য হযরত মোহম্মদের আগমন হয় নি।

এই সব থেকে আমাদের ধারণা হয়েছেঃ সেকালের নবীদের সম্বন্ধে যেসব কাহিনী প্রচলিত ছিল তার কিছু কিছু কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোরআনের বক্তব্য এই নয় যে সেই পুরাতন জনপ্রিয় কাহিনীগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেই ভাবেই সেসব সেকালে ঘটেছিল। সূরা কাসাসে বলা হয়েছেঃ

আর তুমি (হে মোহম্মদ) (পর্ব্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে ছিলে না

* এই সম্পর্কে স্মরণীয় স্যর সৈয়দ আহ্‌মদের এই অমূল্য বাণীটিও: যা সত্য নয় তা ইসলাম নয়।

যখন আমি মুসাকে আদেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আর তুমি ছিলে না যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে।

আর তুমি পাহাড়ের এই পার্শ্বে ছিলে না যখন আমি আহ্বান করেছিলাম, (কিন্তু তার জ্ঞান) তোমার পালয়িতার কাছ থেকে এক করুণা, যেন তুমি সাবধান করতে পারো তাদের যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসে নি, যেন তারা স্মরণ করতে পারে। (২৮ঃ ৪৪, ৪৬)।

অন্য কথায়, নবীদের সম্বন্ধে প্রাচীন জনপ্রিয় কাহিনীগুলো থেকে হযরত মোহম্মদ প্রেরণা পাচ্ছেন—বিপদে ধৈর্য ও আশা অবলম্বন করতে পারছেন,—এই সেসব সম্বন্ধে বড় কথা, কাহিনীগুলোর সত্যকার সার্থকতা এইখানেই। সূরা 'হুদে' স্পষ্টই বলা হয়েছে ঃ

আর আমি রসুলদের কাহিনী যা সব তোমার কাছে বর্ননা করছি সে-সবের সাহায্যে তোমার অন্তর দৃঢ় করার জন্য, আর এতে তোমার কাছে এসেছে সত্য, আর উপদেশ, আর বিশ্বাসীদের জন্য স্মারক।

(১১ ঃ ১২০)

সূরা আল্-ই-ইমরানের একটি বিখ্যাত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ কোর-আনের কতকগুলো আয়াত নির্দেশাত্মক, আর কতকগুলো রূপক ; আর কোরআনে জোর দেওয়া হয়েছে নির্দেশাত্মক আয়াত গুলোর উপরে, রূপকগুলোর উপরে নয়।

এই ব্যাপারটা ভাল করে বুঝলে সেকালের অলৌকিক কাহিনী, যেমন, হযরত মুসা ও তাঁর অনুবর্তীদের জন্য সমুদ্র দু-ভাগ হওয়া, তার হাতের লাঠির সাপ হওয়া, ইত্যাদি ব্যাপারের একালে "যুক্তিযুক্ত" ব্যাখ্যা দেবার জন্য গলদ্ঘর্ম হবার প্রয়োজন হয় না—সহজভাবেই আমরা বুঝতে পারি, এসব বিশ্বাসীদের জন্য বড় রকমের সান্ত্বনার কথা—যুগে যুগে আল্লাহতে বিশ্বাসী মহদাশয় কর্মীদের সামনে সব বিপদ, সব বাধা এমনি যেন অবলীলাক্রমে দূর হয়ে গেছে। হযরতের নিজের জীবনে যে ধরনের সাফল্য লাভ হলো সেটি অলৌকিক-কিছুর মতোই নয় কি?

অবশ্য নবীদের জীবনে, আল্লাহতে বিশ্বাসীদের জীবনে, বিপর্যয়-ভোগ যে না হয়েছে তা নয়। কোনো কোনো নবীকে তাঁর দেশের লোকেরা হত্যা করেছিল তারও উল্লেখ কোরআনে আছে। হযরতের নিজের জীবনেও লাঞ্ছনা ভোগ কম হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন বিশ্বাসীদের জীবনে শেষ পর্যন্ত সার্থকতা লাভ হয়েছে—আল্লাহর ক্ষমা তাঁরা লাভ করতে পেরেছেন—এই ভাবা যেতে পারে। এই আস্তিক্য-বোধ যুক্তি-তর্কের দ্বারা পুরোপুরি সমাথত না হতে পারে ; অন্যায়, অত্যাচার, ভালো লোকদেরও দৃশ্যতঃ ব্যর্থতা-ভোগ, এসবের দৃষ্টান্ত জগতে কোনো কালেই কম নেই—জগৎ ও জীবন ব্যাপারটা সহজবোধ্য নয়—কিন্তু আল্লাহ্‌তে, অর্থাৎ মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতায়, নিবেদিতচিত্ত হয়ে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করা, এর চাইতে ভালো ভাবে জীবন যাপনের কথা মানুষের জন্য ভাবা যায় না, আর এমন আস্তিক্য-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে না পারলে জীবনে দিশাহারা হবার সম্ভাবনাই বেশি। কাজেই এই আস্তিক্য-বুদ্ধি সাধারণ যুক্তিতর্কের দ্বারা সমর্থিত না হলেও এটি এক বড় মানবিক সত্য—মানুষের সার্থক জীবন যাপনের জন্য এর সমূহ প্রয়োজন। কোর-আনের একটি বাণীতে বলা হয়েছেঃ হে বিশ্বাসিগন, যদি তোমরা আল্লাহর সীমা রক্ষা কর, তিনি তোমাদের দেবেন বিচারের ক্ষমতা (ভালো ও মন্দের মধ্যে), আর দূর করে দেবেন তোমাদের মন্দ (চিন্তা ও কাজ), আর তোমাদের ক্ষমা করবেন ; আর আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যের রাজাধিরাজ। (৮ ঃ ২৯)।

অথবা—যারা পথে চলে তিনি বাড়িয়ে দেন তাদের সুগতি আর তাদের দেন তাদের সীমারক্ষা (৪৬ ঃ ১৭)।

প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধি

প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধির সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা পূর্বে কিছু আলোচনা করেছি। এবার একটি ঘটনার বিচার থেকে সে-সম্বন্ধে আরো আলোক লাভ করবার চেষ্টা করব। বিবি যয়নাবের ও তাঁর ভাইয়ের অসম্মতি

সত্ত্বেও যায়েদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় যে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির ফলে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে।

কিন্তু বিবি যয়নাব যায়েদের প্রতি তাঁর অনভিরুচি কাটিয়ে উঠতে পারলেন না; ফলে যায়েদের ও তাঁর বিবাহিত জীবন অচল হল—যায়েদ তাঁকে তালাক দিলেন। তখন হযরত বিবি যয়নাবকে বিবাহ করার নির্দেশ পেলেন যে প্রত্যাদেশের দ্বারা তারও সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে।

একটি বড় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই হযরত কোরেশ-কন্যা বিবি যয়নাবের সঙ্গে দাসত্ব-মুক্ত যায়েদের বিবাহ সমীচীন মনে করেছিলেন, আর সে-সম্বন্ধে প্রত্যাদেশও পেয়েছিলেন; কিন্তু আদর্শের আনুগত্যই মানব-জীবনে একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়, মানুষের দৃঢ়মূল ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অরুচি এসবেরও বিচার করে দেখতে হয়। হযরত বিবি যয়নাবকে বিবাহ করার যে নির্দেশ পেলেন তাতে মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার প্রতি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করা হয়নি, বরং যথেষ্ট সহানুভূতি দেখানো হয়েছে। অন্য কথায়, মানুষের প্রতিদিনের জীবনে যা শোভন ও কার্যকর তা যেমন কাম্য বিচার-বুদ্ধির তেমনি কাম্য প্রত্যাদেশেরও। আর প্রত্যাদেশের দ্বারা এও ঘোষিত হয়েছে যে আল্লাহ্ মানুষের দোষ, ত্রুটি, দুর্বলতা, এসব বার বার ক্ষমা করেন—অবশ্য যদি মানুষ আগ্রহ দেখায় কল্যাণের পথে চলতে।—অন্য কথায়, বিচারবুদ্ধিই আমাদের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন প্রত্যাদেশের অর্থ ও মূল্য নিরূপণের ব্যাপারে।—তাই যাঁরা মত দিয়েছিলেন: প্রত্যাদেশের অনুবর্তী হতে হবে সেসম্বন্ধে 'কেন' 'কিভাবে' এসব প্রশ্ন না করে' তাঁদের মত একটা গোঁজামিল। এই সম্পর্কে কোরআনের দুইটি আয়াত আমরা উদ্ধৃত করছি:

> তিনি জ্ঞান দেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর যে জ্ঞান পায় সে মহাসম্পদ পায়; জ্ঞানী ভিন্ন আর কেউ বিচার করে' দেখে না। (২ : ২৬৯)
>
> যারা বাণী শ্রবণ করে, আর অনুবর্তী হয় যা তার শ্রেষ্ঠ তার, এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ চালিত করছেন, আর এরাই তারা যারা বিচারবান। (৩৯ : ১৮)

হযরতের বহুবিবাহ

হযরতের বহুবিবাহ নিয়ে কিছু কিছু রূঢ় মন্তব্য তাঁর সমালোচকেরা করেছেন। কিন্তু কোনো মানুষকে বুঝতে হয় তার সমগ্র জীবনধারার দিকে তাকিয়ে, তার জীবনের কোনো একটি কাজের দিকে তাকিয়ে নয়। হযরতের সমগ্র জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, যে-সত্যের উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল চিরকাল তিনি ছিলেন তাতে একান্ত নিবেদিতচিত্ত, আর সারা জীবন তিনি ছিলেন কর্মনিষ্ঠ। তাঁর সম্বন্ধে এই সামগ্রিক দৃষ্টি থেকে ভ্রষ্ট না হয়ে তাঁর বহুবিবাহের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা সহজেই বুঝবো, তাঁর এমন বহুবিবাহের মূলে প্রধানত ছিল আত্মীয়তার বন্ধন সম্প্রসারিত করার বাসনা ও প্রয়োজন, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসহায় নারীদের যোগ্য আশ্রয় দান। এর সঙ্গে এই বড় কথাটিও মনে রাখতে হবে যে পুরুষের বহুবিবাহ আরবে আদৌ নিন্দনীয় ছিল না—হযরতের সম্মানিত পিতামহ আব্দুল মোত্তালেব আনুমানিক সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র বিবাহ-কালে এক তরুণীকে বিবাহ করেন। হযরতের বহুবিবাহ সম্পর্কে খুব লক্ষণীয় এই ব্যাপারটিও যে তাঁর পত্নীরা সবাই তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন—তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন যথেষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বশালিনী।

বহুবিবাহ কোরআনে নিষিদ্ধ না হলেও তাকে সীমিত করাই কোরআনের নির্দেশ।

একালে অবশ্য বহুবিবাহ সর্বত্রই অপ্রশস্ত বিবেচিত হয়েছে—একালের মুসলমানদেরও মনোভাব তাই।

এই প্রসঙ্গ আমরা শেষ করছি বিবি আয়েশা থেকে পাওয়া দুইটি হাদিস দিয়ে। একটিতে তিনি বলছেন: রসুল তিনটি জিনিস ভালবাসতেন—নারী, সুগন্ধ এবং (ভালো) খাদ্য···।

অপরটিতে তিনি বলছেন: অনেক সময় রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে তিনি হাতড়িয়ে দেখতেন নবী বিছানায় আছেন কিনা। বিছানায় না পেলে তিনি তাঁকে খুঁজতে বেরুতেন; কিন্তু কামরা থেকে বাইরে যাবার

পূর্বেই দেখতেন নবী মেঝেতে সেজদায় মাথা লুটিয়ে আছেন। তাঁকে ঘরে না পেলে বাইরে বেরিয়ে তিনি দেখতেন তিনি মসজিদে ধ্যানমগ্ন। কখনো পার্শ্ববর্তী কবরস্থানে গিয়ে দেখতেন নবী সেখানে মৃতদের জন্য প্রার্থনা করছেন।

হযরতের সমগ্র জীবনের উপরে প্রচুর আলোকপাত করছে এই দুইটি হাদিস।

হযরতের জীবন-কথার মানবিকতা

মুখ্যতঃ হযরত মোহম্মদের প্রাচীন জীবন-কাহিনী থেকে তাঁর—তাঁর সমসাময়িকদেরও—যে চরিত্র-চিত্র দাঁড় করানো হয়েছে আশা করি সহজেই পাঠকদের চোখে পড়েছে তা কত মানবিক। হযরত সম্বন্ধে প্রাচীন বিবরণগুলোতে অনেক অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ অবশ্য আছে; সেসবের কিছু কিছু আমরা উদ্ধৃত করেছি প্রধানতঃ দৃষ্টান্ত হিসাবে; কিন্তু সেসব বাদ দিলে তাঁর জীবনকথার কোনো সত্যকার অঙ্গহানি যে হয় না তাও বোঝা যায় সহজেই। হযরত তাঁর অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ও অপরিসীম স্নেহ প্রেম ক্ষমা, চারদিকের লোকদের উন্মার্গগামিতার জন্য তাঁর সুগভীর বেদনা, তাদের সঙ্গে সময় সময় তাঁর কঠিন সংঘর্ষ, তাঁর বিস্ময়কর গঠনশক্তি—এসব নিয়ে তো উজ্জ্বলভাবে মানবিক, তাঁর সমসাময়িকরাও কেউ কেউ তাদের একান্ত আনুগত্য ও অবিস্মরণীয় চারিত্র-শক্তি নিয়ে, কেউ কেউ তাদের উৎকট বিরোধিতা নিয়ে, আর প্রায় সবাই আশ্চর্য অকৃত্রিমতার গুণে এমন স্বভাবিক মানুষরূপে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায় যে তাদের ভোলা সম্ভবপর নয়। হযরতের ও তাঁর সমসাময়িকদের চরিত-কথার এই বিস্ময়কর বাস্তবতায় সত্যই রয়েছে এক অপূর্ব মহাকাব্যের সম্পদ। সেজন্য যুগে যুগে নতুন নতুন চরিতকার সেসব চিত্রিত করতে গিয়ে নতুন নতুন আনন্দের ও বিস্ময়ের সন্ধান পাবেন।

চতুর্থ খণ্ড

পরিণতি

হযরতের নির্দেশ

কোরআন শরীফের অন্ত্য-মক্কীয় সূরা ইউনুস-এ নবী তাঁর দেশের লোকদের বলছেন ঃ

······নিঃসন্দেহ এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি তবে তোমরা কি বোঝো না (১০ ঃ ১৬) ?

হযরত মোহম্মদ তাঁর পরবর্তীদের জন্য যা রেখে গেলেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে কোরআন আর তাঁর জীবনকালের দৃষ্টান্ত।

ভালো আরো যা তিনি রেখে গেলেন তার পরিচয় রয়েছে এই বিখ্যাত হাদিসে। ইয়ামনের শাসক হয়ে মুআয ইব্‌নে জবল্ যখন রওনা হলেন তখন হযরত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যখন কোনো প্রশ্ন তোমার সামনে আসবে তখন কি ভাবে তার মীমাংসা করবে ? মুআয উত্তর দেন ঃ আল্লাহর গ্রন্থ অনুসারে। হযরত বলেন ঃ যদি সেখানে কিছু (কোনো নির্দেশ) না পাও ? মুআয বলেন ঃ আল্লাহ্‌র রসুলের সুন্নাহ্‌ (আচরণ) অনুসারে। হযরত বলেন ঃ যদি সেখানেও কিছু না পাও ? মুআয বলেন ঃ তখন আমি আমার বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করবো। মুআযের কথা শুনে হযরত এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে মুআয ঠিক পথে চলেছে।

কোরআন, হযরতের আচরণ, আর প্রত্যেক মুসলমানের বিচার-বুদ্ধি, এই তিনের অনুসরণ করার জন্য হযরত যে নির্দেশ রেখে গেলেন, বলা বাহুল্য, তাঁর অনুবর্তীদের জন্য সর্বকালে তা শ্রেষ্ঠ নির্দেশ। সেই নির্দেশের পরিণতি পরবর্তী মুসলিম ইতিহাসে কি হলো সেটি এক বিরাট বিষয়। জটিলও সেই ব্যাপারটি। আমরা তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

হযরতের পরলোক গমনের পরে মুসলিম মণ্ডলীর ও রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার কাকে দেওয়া হবে এই নিয়ে বাদানুবাদ হয়। সেই সময়ের জন্য যে মীমাংসা হয়, অর্থাৎ হযরত আবু বকরকে হযরতের খলিফার পদে বরণ, তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। পরের ইতিহাস থেকে দেখা যায় এই প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে মুসলিম জগতে ভীষণ রক্তারক্তি হয়ে গেছে, আর বাদানুবাদ যেন অন্তহীন হয়েছে।

আরব-বিদ্রোহ

হযরত আবু বকরকে প্রথমেই সম্মুখীন হতে হয় আরবের বিভিন্ন গোত্রের ও অঞ্চলের ব্যাপক বিদ্রোহের। আরবরা ছিল এক অতিশয় স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় জাতি। ইসলাম তাদের জন্য যে বিধান করলে নিয়ম-শৃঙ্খলার, সর্বোপরি এক কেন্দ্রীয় শাসনের অনুগত হবার জন্য, আর সেই কেন্দ্রকে নিয়মিত ভাবে অর্থ (যাকাত) দানের জন্য—তা সহজেই সেই জাতির জন্য হলো দুঃসহ। —হযরতের জীবদ্দশাতেই আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে নবীত্বের তিনজন মিথ্যাদাবিদার দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু এমন সংকটকালেও হযরত আবু বকর দমলেন না, আর এক অমূল্য সহায়রূপে তিনি পেলেন নিপুণ যোদ্ধা খালেদ বিন্ ওলিদকে। তাঁর বাহুবলে বিদ্রোহী আরবরা শেষ পর্যন্ত বশে এলো। হিট্টি বলেছেন: Arabia had to conquer itself before it could conquer the world—আরবের নিজেকে জয় করতে হয়েছিল বিশ্ব জয় করার পূর্বে। কিন্তু এই যে মুখ্যতঃ অস্ত্রের বলে ইসলামী রাষ্ট্রের নতুন করে' পত্তন হল, অচিরে এর একটা বড় প্রভাব মুসলমানদের মধ্যে লক্ষণীয় হলো।

খলিফাদের যুগ

রোমানের সঙ্গে ও পারসিকদের সঙ্গে হযরতের জীবদ্দশাতেই এই নব-গঠিত রাষ্ট্রের সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। আরবের ব্যাপক বিদ্রোহকে শায়েস্তা করে' হযরত আবু বকর বেদুইনদের আহ্‌বান জানালেন রোমানদের সঙ্গে

জেহাদ করার জন্য। এই কালে শুধু খালেদ বিন্ ওলিদ নন, আরো কয়েকজন রণনিপুণ যোদ্ধার অভ্যুদয় মুসলমানদের মধ্যে হল—তাঁদের মধ্যে আম্‌র্ বিন্ আল্ আস্ সমধিক প্রসিদ্ধ। এঁদের সহায়তায় অচিরে মুসলিম বাহিনী সিরিয়া ও পারসিক সীমান্তে উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করলো। সেকালের সুসভ্য মধ্যপ্রাচ্য অখ্যাত আরব জাতির এমন আশ্চর্য বীরত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিস্ময় মানলো।

হযরত আবু বকরের স্বল্পকালীন (৬৩২-৩৪) শাসনের পরে মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধার মনোনীত হন হযরত ওমর (৬৩৪--৬৪৪)। শুধু বিজয়ের কথা না ভেবে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে শান্তিতে বসবাসের কথাও তিনি ভাবেন—পারস্য সীমান্তে যতটা নতুন অঞ্চল মুসলমানদের এ পর্যন্ত লাভ হয়েছিল তিনি নির্দেশ দেন মুসলমানেরা সেই সীমা অতিক্রম করবে না। সৈয়দ আমীর আলীর History of the Saracens-এ বলা হয়েছে মুসলমানেরা সীমা অতিক্রম না করবার সংকল্প গ্রহণ করলেও পারসিকদের তরফ থেকে মুসলমানদের হটিয়ে দেবার প্রচেষ্টা ক্রমাগত চলতে থাকে। ফলে হযরত ওমর নতুন করে' আদেশ দেন মুসলমান বাহিনীর অগ্রগতির জন্য।

আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হল ; রোমান সাম্রাজ্যেরও একটা বড় অংশ তাদের দখলে এলো।

হিট্টি বলেছেন : অল্প সময়ে আরবদের এমন অভাবিত বিজয়-লাভের মূলে ছিল একদিকে তাদের কষ্ট সহ্য করবার অসাধারণ ক্ষমতা—তাদের মরুভূমির জীবন তাদের এই ক্ষমতা দিয়েছিল ; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাদের মৃত্যুভয়-রাহিত্য—তাদের নতুন ধর্মবিশ্বাস তাদের এই শক্তি যুগিয়েছিল ; আর এই দুইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাদের নতুন রণকৌশল—তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর আর উষ্ট্রারোহী-বাহিনীর দ্রুততর গতিও ছিল তাদের এই বিজয়ের একটা বড় হেতু।

রোমক ও পারসিক এই দুই সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও এই দ্রুত মুসলিম-বিজয়ের সহায় হয়েছিল। এক শ্রেণীর ইয়োরোপীয় ইসলাম

তত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত : প্রধানত ধর্মান্ধতা ও তরবারির জোর ছিল এই বিজয়ের মূলে। কিন্তু হিট্‌টি দেখিয়েছেন : মুসলিম বিজয়ের সূচনা থেকে দুই শত বৎসর কি তারও বেশি সময় পর্যন্ত বিজিতদের নতুন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ব্যাপক হয় নি। তাঁর, এবং আরো অনেকের, মতে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে রোমক ও পারসিক সাম্রাজ্যে প্রজাদের উপরে করভার দুর্বহ হয়েছিল, বিজয়ী মুসলমানেরা তাদের কাছ থেকে যে ভূমিকর ও জেযিয়া আদায় করতো তা ছিল তাদের পূর্বের প্রভুদের তারা যে কর দিত তার চাইতে পরিমাণে কম, আর রোমক সাম্রাজ্যে ও পারস্য সাম্রাজ্যে ধর্মাচরণে প্রজাদের বাধা ছিল গুরুতর—তার সঙ্গে তুলনায় মুসলমান বিজয়ীদের অধীনে তারা জেযিয়া দিয়ে অনেক বেশি ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতো। মুসলিম বিজয়ের দুই শত বৎসরেরও বেশি সময় পরে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ এই বিজিতদের মধ্যে ব্যাপক হয়, তার প্রধান কারণ, এমন ধর্মান্তরিত হবার ফলে তাদের করভার আরো লঘু হয়, আর তাদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে। সভ্যজগতে তখন মুসলমানদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছে।

হিট্‌টি বলেছেন একটা নতুন বিশ্বাসের উদ্দীপনা ইসলাম আরবদের মধ্যে এনে দিয়েছিল মিথ্যা নয়, কিন্তু তাদের এই দিগ্‌বিজয়ের ব্যাপারে সেই উদ্দীপনার সঙ্গে যোগ ঘটেছিল অর্থনৈতিক কারণেরও। সিরিয়া ও পারস্যের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো দখল করার ফলে এই বিজয়ী আরবদের যে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ হচ্ছিল তা তাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল এক প্রবল প্রলোভনরূপেই। —এই প্রলোভনের অবাঞ্ছিত পরিণতি সম্বন্ধে এই বিজয়ীদের বরেণ্য নেতা হযরত ওমর সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কথিত আছে পারস্যের জালুলা ও মাদায়েনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিজয়ী বাহিনী যখন প্রচুর ধনসম্পদ মদিনায় নিয়ে আসে সে সব দেখে হযরত ওমর অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। তাঁর এমন অশ্রু বিসর্জনের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : আমি দেখছি এই লুণ্ঠিত ধনসম্পদ ভবিষ্যতে আরবদের ধ্বংসের কারণ হবে। —বিজিত অঞ্চলগুলোতে হযরত ওমর অবশ্য যোগ্য

শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করতে বিশেষ চেষ্টা করেন, আর তিনি নিজে অতি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে চলেন। কিন্তু যুদ্ধে লব্ধ যে প্রচুর ধনসম্পদ ও দাসদাসী মুসলমানদের লাভ হতে থাকে তাতে সহজেই ভোগ-বিলাসের দিকে তাদের মন ঝুঁকে পড়ে।

শুধু ভোগ বিলাসের দিকে নয়—ক্ষমতার লোভও তাদের মধ্যে প্রবল হতে থাকে। ঐতিহাসিকরা বলেছেন ঃ তৃতীয় খলিফা ওসমানের স্বজন-তোষণ-নীতি অচিরে উমাইয়া গোত্রের লোকদের (হযরত ওসমান ছিলেন উমাইয়া গোত্রের) সমৃদ্ধিসম্পন্ন করে, আর তার ফলে মুসলনান মণ্ডলীতে অসন্তোষ তীব্র হয়ে চলে। উমাইয়া গোত্র ইসলামের আওতায় আসে অনেক পরে।

শেষে অসন্তুষ্ট বিদ্রোহীদের হাতে বর্ষীয়ান খলিফা ওসমান নিহত হন —৬৫৬ খৃষ্টাব্দে—যদিও অনেক ভাল গুণ তাঁতে ছিল।

ওসমানের পরে খলিফা মনোনীত হন আলী (৬৫৬-৬৬১)—হযরতের জামাতা। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে শীগ্‌গিরই উমাইয়া গোত্রের লোকেরা বিদ্রোহের ধ্বজা তোলে—ওসমানের হত্যাকারীদের বিচার হচ্ছে না এই অজুহাতে। তাদের সঙ্গে যোগ ঘটে তাল্‌হা ও যুবেরের মতো হযরতের বিখ্যাত সঙ্গীদেরও—তাঁদের আশার অনুরূপ পদমর্যাদা লাভ না হবার ফলে, এই কেউ কেউ বলেছেন। হযরত আয়েশাও আলীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান—তাঁর নামে যখন বদনাম রটেছিল তখন আলী যে তাঁকে ত্যাগ করার পরামর্শ হযরতকে দিয়েছিলেন সম্ভবত সেইটি ছিল আলীর প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার মুখ্য কারণ। যা হোক এই বিদ্রোহ আলী দমন করতে পারেন। কিন্তু উমাইয়া গোত্রের আবুস্থফিয়ানের পুত্র মোয়াবিয়া ছিলেন সিরিয়ার শাসনকর্তা, বহু বেতনভুক্ সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করে' তিনি যে হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন, তাঁকে দমন করা হযরত আলীর পক্ষে কঠিন হলো। মোয়াবিয়ার সহায় হন বিখ্যাত যোদ্ধা ও কূটনীতিক আমর ইবন্ আল্ আস।

একদল মুসলমান—খারিজী সম্প্রদায়—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে

মুসলিম মণ্ডলীর ও মুসলিম রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক আল্লাহ্, অন্য কথায়, মুসলিম মণ্ডলীর দ্বারা বৈধভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি,—আলী ও মোয়াবিয়ার মধ্যে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছে এর জন্য এই দুইজনকেই সরিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছে। এই দলের সঙ্গে আলীর কঠোর যুদ্ধ হয়। শেষে এই দলের একজন কুফা-র মসজিদে (এই সময়ে রাজধানী মদিনা থেকে ইরাকের কুফায় স্থানান্তরিত হয়েছিল) আলীকে বিষাক্ত তরবারি দিয়ে আঘাত করে—তাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

উমাইয়া শাসন

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আল্-হাসান কুফায় খলিফা মনোনীত হন। কিন্তু প্রতাপশালী মোয়াবিয়াকে মুসলমান মণ্ডলীর শাসনভার দিয়ে তিনি মদিনায় গিয়ে নিরুপদ্রব জীবন যাপনে রত হন। সৈয়দ আমীর আলী বলেছেনঃ মোয়াবিয়ার সঙ্গে আল্-হাসানের এই চুক্তি হয়েছিল যে মোয়াবিয়ার পরে আল-হাসানের সহোদর আল-হুসেন খলিফার পদ পাবেন। কিন্তু মোয়াবিয়া তাঁর পুত্র এযিদকে তাঁর পরে খলিফা মনোনীত করেন আর মদিনার ও মক্কার মুসলমান মণ্ডলীর কাছ থেকে বলে তাঁর এই মনোয়নের সমর্থন আদায় করেন।

মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পরে এযিদ খলিফা হলে আল্-হুসেন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সেই বিদ্রোহের যে শোকাবহ পরিণতি ঘটে মুসলিম ইতিহাসে তা সুপরিচিত।

হযরতের পরলোক গমনের পরে পর পর যে চারজন খলিফা বা প্রতিনিধি হন—আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী—এঁদের সাধারণত বলা হয় খুলাফা-ই-রাশেদুন, অর্থাৎ সত্য খলিফা। এর পর মোয়াবিয়া থেকে উমাইয়া বংশের শাসন শুরু হয়—৬৬১ খৃষ্টাব্দে। একশত বৎসর তাঁরা মুসলিম জগতে শাসন পরিচালনা করেন। এঁদের শাসনকালে ইসলামের সাম্রাজ্য খুব বিস্তৃত হয়। কিন্তু তাঁদের শাসনকে অনেকে নাম দিয়েছেন রাজত্ব—খলিফাত্ব নয়—তার কারণ এই বংশের শাসকরা প্রায় সবাই

ইসলামের বিধি-নিষেধের অনুবর্তী হওয়ার চাইতে প্রাচীন আরব স্বেচ্ছাচারের দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন।

আব্বাসীয় শাসন

শেষে এঁদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়, আর তার ফলে এঁদের শাসনের অবসান ঘটে, আর আব্বাস-বংশীয়দের শাসন আরম্ভ হয়। আব্বাস-বংশীয়েরা, অর্থাৎ হযরতের পিতৃব্য আল-আব্বাসের সন্তানরা, নিজেদের ইসলামের বিধি-বিধানের অনুবর্তী বলেই জ্ঞান করতেন, অনেকে তাঁদের সেই চোখেই দেখতো, কিন্তু এঁরাও মোটের উপরে ছিলেন স্বৈরতন্ত্রী। আব্বাস-বংশীয়দের শাসন চলে দীর্ঘদিন—৭৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১২৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইসলামীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুবর্ণ যুগ এটি, বিশেষ করে' এর প্রথম ভাগ। —১২৬৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গোল হালাকুর সৈন্যবাহিনী আব্বাসীয়দের রাজধানী বোগদাদ নগর আর আব্বাসীয় শাসন ও বংশ সবই ধ্বংস করে।

স্পেনে মুসলমান শাসন

মধ্য প্রাচ্যে উমাইয়া বংশের যখন ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে তখন সেই বিপর্যয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন সেই বংশের আব্দুর রহমান। তাঁর বয়স তখন বিশ বৎসর। পাঁচ বৎসর নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে' ও বহু দেশ ভ্রমণ করে' অবশেষে দূর স্পেনে গিয়ে তিনি রাজাসন পান। উমাইয়া বংশ সেখানে গৌরবে শাসন পরিচালনা করে ১০৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপরেও মুসলমানেরা স্পেনে রাজত্ব করেন—শেষে তাঁদের ইয়োরোপ ত্যাগ করে আসতে হয় ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে।

ফাতেমীয় বংশ

হযরত আলী ও ফাতেমার সন্তানরাও মুসলমান জগতের খলিফা হবার বিশেষ দাবিদার ছিলেন। তাঁদের অনেক নির্যাতন ভোগ করতে

হয়। শেষে আফ্রিকায় তাঁরা নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন—৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। সেখানে তাঁরা শাসন পরিচালনা করেন ১১৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রতাপ বনাম সৃষ্টিধর্মিতা

প্রথম চার খলিফা, উমাইয়া বংশ, আব্বাসীয় বংশ, ফাতেমীয় বংশ, তুর্কী সম্রাটগণ—এঁরা ভিন্ন মুসলিম জগতে খ্যাতনামা হন আরো কয়েকটি বংশ। ভারতবর্ষের পাঠান এবং মোগলরাও বিখ্যাত। মুসলমান খলিফাদের ও রাজাবাদশাদের রণনৈপুণ্য, ইয়োরোপের ক্রুজেডারদের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ সংগ্রাম, সুবিস্তৃত রাজ্যের উপরে তাঁদের আধিপত্য, এসব ইতিহাসে কীর্তিত হয়েছে। কিন্তু একালে আমাদের জন্য বেশি অর্থপূর্ণ তাঁদের রণনৈপুণ্য ও দিগ্‌বিজয় তেমন নয় যেমন নানা জাতির লোকদের নিয়ে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে তাঁরা যে শুভবুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন—সেই ব্যাপারটি। মানব-সভতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা যে সব সৃষ্টিধর্মী চিন্তার ও কাজের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন—সেই সবেরই সমাদর কালের কাছে। সেই সবেরই পরিচয় নিতে আমরা চেষ্ট করব।

সূরা আল-বরাআত অবতীর্ণ হবার পরে অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্বন্ধ যা দাঁড়ালো তার সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় হয়েছে। এই সম্বন্ধ স্বভাবতঃ আরো স্পষ্ট রূপ লাভ করে চললো ইসলামের নতুন নতুন বিজয় লাভের সঙ্গে। হযরত ওমর খলিফা হবার অল্পদিন পরেই খয়বরের ইহুদীদের ও নাজরানের খৃষ্টানদের আরবের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন (হিট্‌টির মতে তাদের সঙ্গে যে সব চুক্তি ছিল তা লঙ্ঘন করে) কেন না, আরবে অমুসলমানদের বসবাস চলবে না এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন। তিনি আরবদের গঠন করতে চাচ্ছিলেন ইসলাম-অনুবর্তী একটি সামরিক-শৃঙ্খলা-যুক্ত জাতি হিসাবে—তাদের তিনি ভেবেছিলেন নতুন ইসলামীয় সৃষ্টির জন্য এক যোগ্য

উপকরণ। তিনি চাইলেন আরবরা নিজেদের স্বতন্ত্র রাখবে অনারবদের থেকে, সেজন্য নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হবে আরবরাই, অনারবরা তার নাগরিক অধিকার পাবে না। আরবরা বিজিত অঞ্চলসমূহের জমি-জমার মালিক হয়ে সে সব জায়গায় বসতি স্থাপন করবে না—সেসব জায়গায় জমির মালিকানা থাকবে অনারবদেরই। মুসলিম রাষ্ট্র রক্ষা ও বিস্তারের দাযিত্ব আরবদেরই, তাব উপরে তারা যাকাত (মোটামুটি বার্ষিক আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ) রাষ্ট্রকে দেবে আর অনারবরা দেবে জমির খাজনা ও জেযিয়া (জেযিয়া প্রথমে ছিল বৎসরে মাথা পিছু এক দিনার হিসাবে ও কিছু খাদ্যশস্য, পরে এর পরিমাণ করদাতাদের সামর্থ্য অনুসারে বাড়ে।) অনারব ও অমুসলমান বলতে সাধারণত বোঝা হ'ত, আরবের বাইরের অমুসলমান, যেসব অনারব মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতো তারা সাধারণ আরবদের তুল্য অধিকার পেত—তবে অনেক সময়ে পেতও না। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করার পরে রাষ্ট্রের সরকারী ভাণ্ডারে যে ধন-সম্পদ অবশিষ্ট থাকত তা বিতরণ করা হতো মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে তাঁদের মর্যাদা অনুসারে। হযরত আয়েশা পেতেন সব চাইতে বেশি বৃত্তি (বৎসরে বারো হাজার দিরহাম)। সাধারণ আরব নারী, শিশু, নবদীক্ষিত অনারব, এদেরও এই বৃত্তি দেওয়া হতো। নিম্নতন বৃত্তির হার ছিল বার্ষিক দুইশত থেকে ছয়শত দিরহাম।*

হযরত ওমরের এই ব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে ইসলামীয় রাষ্ট্র-শাসনের প্রাথমিক ব্যবস্থা।

অচিরে অবশ্য এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আরব ও অনারবদের মধ্যে এমন পার্থক্য দীর্ঘদিন অটুট রাখা সম্ভবপর হয় না। পরে পরে আরবী-ভাষী ও ইসলাম-অবলম্বী প্রায় প্রত্যেকেই আরবরূপে নিজেদের পরিচিত করতে থাকে। আরবের বাইরে আরবদের জমির মালিকানা লাভ ও বসতি স্থাপনও চলতে থাকে।

তবে হযরত ওমর ও সাধারণভাবে খলিফাদের সম্বন্ধে বলা যায় যে

*হিট্টি দ্রষ্টব্য।

তাঁদের সময়ে স্বীকৃত ইসলামীয় বিধান রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রণে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হতো। বর্ণিত হয়েছে, মদ্যপান ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য হযরত ওমর তাঁর আপন পুত্রকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন—তাতে তার মৃত্যু হয়।

তাহলে আমরা দেখছি : প্রথমে মুসলিম রাষ্ট্রকে দাঁড় করানো হয় এক ধর্মরাষ্ট্র হিসাবেই—ধর্মের বিধি-নিষেধের দ্বারা যার সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণ অবশ্য-কাম্য ছিল। কিন্তু সেই ধর্মরাষ্ট্র একই সঙ্গে হয়ে দাঁড়াল যেমন একটি ধর্মনীতি-নিষ্ঠ রাষ্ট্র তেমনি একটি সাম্রাজ্যও। কিন্তু সাম্রাজ্য বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোকের অধীনতা স্বীকার প্রভুস্থানীয়দের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য, সেটি যাতে না হয় সেদিকে এই ধর্মরাষ্ট্রের নেতাদের, বিশেষ করে হযরত ওমরের, সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কেন না সেই নবগঠিত রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন তিনি করতে চেয়েছিলেন নীতি-নিষ্ঠ ও অনাড়ম্বর, সঙ্গে সঙ্গে এই নবগঠিত রাষ্ট্রের বিস্তারও তিনি সীমিত করতে চেয়েছিলেন। পারশ্য সীমান্তে তাঁর সেই চেষ্টার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি, মিশর জয়ের প্রাক্কালেও সেই মনোভাব তাঁতে লক্ষ্য করা যায়, কেন না, সেনাপতি আমর ইবন আল-আসকে তিনি নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন নতুন দেশবিজয়ে অগ্রসর না হবার জন্য, কিন্তু আমর-ইবন্-আল্ আস্ খলিফার নির্দেশ প্রতিকূল হবে আশঙ্কা করে সেই নির্দেশ-পত্র না পড়েই নতুন বিজয়ে অগ্রসর হন। অবশ্য সেই বিজয়কে ওমর পরে স্বীকৃতি দিতে পশ্চাৎপদ হন নি, হয় ত তিনি মনে করেছিলেন এ ছিল আল্লাহর ইচ্ছা।

এর সঙ্গে আরো লক্ষ্য করবার আছে বিজিত অঞ্চলসমূহে প্রজাদের সুশৃঙ্খল ও সুসমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য তাঁর ও তাঁর পরামর্শদাতাদের প্রযত্ন; বিজিত অঞ্চলে দীর্ঘদিনের অবহেলিত কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা তাঁরা করেন। হযরত ওমর নতুন ইসলামী রাষ্ট্রে—অথবা সাম্রাজ্যে—আরব ও অনারদের মধ্যে সমতা বিধানের চেষ্টা করেন নি, স্বীকার করতে হবে, তবে আরব এবং অনারব উভয় শ্রেণীর লোকদেরই সাংসারিক ও

নৈতিক উন্নতির জন্য তিনি যে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন—অনারবদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ভার ছিল তাদেরই ধর্মব্যবস্থার উপরে—ইতিহাসে এরও মূল্য কম নয়।

আর তাঁদের এই প্রচেষ্টা অনেকটা সফলও হয়েছিল। মুসলিম বিজয়কে বহু দেশের জনগণ যে স্বাগত জানিয়েছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে।

কিন্তু মুসলিম সাম্রাজ্যের এই অপেক্ষাকৃত ভাল দিকটা সব সময়ে যে কার্যকর থাকতো তা বলা যায় না। তবে এটি অমুসলিম বিচারবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো হয়েছিল। কোনো কোনো ইয়োরোপীয় ইতিহাসবেত্তা এই মন্তব্য করেছেন: Emancipation of the intellect বা "বুদ্ধির মুক্তি" ইয়োরোপে সক্রিয় হয়েছিল মুখ্যতঃ গ্রীক-দর্শনের প্রভাবে নয়, সেই প্রেরণা বরং এসেছিল মুসলমানেরা তাদের রাজ্যে অমুসলমানদের প্রতি যেমন উদার ব্যবহার করতো তার দৃষ্টান্ত থেকে।—অবশ্য যখন সভ্যতার ক্ষেত্রে মুসলমানদের নতুন প্রয়াস চলেছিল তখন ইয়োরোপ মোটের উপরে ছিল বর্বরতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

আর সাম্রাজ্য-প্রথার মতো প্রাচীন দাসত্ব-প্রথাও মুসলমানেরা রহিত করতে পারে নি। বরং কালে কালে দাসত্ব-প্রথা মুসলিম জগতে অত্যন্ত ব্যাপক হয়। তবে দাসত্ব যে মুসলমানদের মধ্যে অনেকটা সুসহ রূপ পায়—দাসকে মুক্তি দেওয়া মুসলমানেরা চিরদিনই পুণ্যকর্ম বলে গণ্য করতো—এটিও একটি স্বীকৃত সত্য।

স্বৈরাচার বনাম স্বষ্টিধর্মিতা

উমাইয়া বংশের শাসনকাল থেকে মুসলিম রাষ্ট্রে ধর্মের বিধানের প্রভাব যে সীমিত হলো—রাজ্য-শাসনে নিয়মতান্ত্রিকতার স্থান অনেক পরিমাণে যে জবরদখল করল স্বৈরাচার—তার কথা আমরা বলেছি। কালে কালে ধর্ম-বিধানের অনুবর্তিতা আর শাসকদের স্বৈরাচার এই

দুইয়ের মধ্যে একটি আপোস হলো। শাসকরা খোলাখুলিভাবে নিজেদের স্বৈরাচারী প্রতিপন্ন করতে বিরত হলেন, আর ধর্মশাসনের ব্যাখ্যাতারাও শাসকদের স্বৈরাচারের কাছে অনেকটা নতি স্বীকার করলেন। অবশ্য এর ব্যত্যয় যে কখনো কখনো দেখা না দিল তা নয়। তবে মোটের উপরে এই আপোস মুসলিম জগতে স্থায়ী হলো। এর ফল যে মুসলমান সভ্যতার জন্য শুভকর হলো না তা আমরা দেখবো।

কিন্তু ধর্মের বিধি-নিষেধ আর শাসকদের স্বৈরাচার এই দুই ব্যাপার নিয়েই মুসলমানেরা যে ব্যাপৃত থাকতে পারলো তা নয়। নতুন নতুন দেশ জয়ের বা তাদের সম্পর্কে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের পরিচিত হতে হলো সেইসব দেশের ধর্মানুষ্ঠানাদির সঙ্গে, বিশেষ করে তাদের দীর্ঘদিনের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে। এইভাবে গ্রীকদের, পারসিকদের, রোমানদের, প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীদের, খৃষ্টানদের, আর ভারতীয়দের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মুসলমানদের নিবিড় পরিচয় হলো। আরবদের বাস্তবের বোধ ছিল প্রখর—তাদের প্রাচীন কবিতায় তার পরিচয় রয়েছে ; তাদের যে নতুন মহাসম্পদ কোরআন লাভ হলো তাতেও বাস্তবের প্রতি তাদের দৃষ্টি প্রবলভাবেই আকৃষ্ট হলো। এই বাস্তব-চেতনা ও বাস্তব-প্রীতি তাদের বিশেষভাবে সচেতন করলো যেসব নতুন চিন্তা ও আচার-আচরণের সম্মুখীন তারা হলো সে-সবের মূল্য সম্বন্ধে। এর ফল নানা দিক দিয়েই শুভ হলো। মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে পণ্ডিতেরা বোঝেন শুধু কোরআন ও হযরত মোহম্মদের জীবনযাপন পদ্ধতি মুসলমানদের জন্য যে সম্পদ বহন করে আনলো তাইই নয়, মুসলমানেরা তাদের পূর্ববর্তী সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে যেসব সম্পদ আহরণ করতে পারলো আর সেসব আত্মস্থ করে' মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যেসব নতুন সমৃদ্ধি তারা যোগ করতে পারলো—সেই সমস্তই। এক বিরাট ব্যাপার এটি, কেননা মুসলমানেরা জীবনের বহু প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল। আধুনিক সভ্যতা বলতে যে বাস্তবনিষ্ঠ বিরাট ও জটিল ব্যাপার বোঝায় তার প্রবর্তনা মুসলমানদের দ্বারাই।

মুসলমানদের এই বিরাট কীর্তির পরিচয় দিতে পণ্ডিতেরা চেষ্টা করেছেন। তাঁদের অনুসরণ করে' আমরা চেষ্টা করব এর দুই একটি বিশিষ্ট ব্যাপারের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে। বলা বাহুল্য আমরা অনুসন্ধিৎসু বিশেষজ্ঞ রূপে নয়—বিনীত জীবন-জিজ্ঞাসুরূপে। অতীতের বহু আশ্চর্য উপকরণও আজ হয় মূল্যহীন না হয় পুরাতন—কিন্তু জীবন-জিজ্ঞাসার মতো ব্যাপার পুরাতন হবার নয়।

হযরত যত দিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর মুখ থেকে আসা বাণীই ছিল বিধান—সেইসব বাণীর মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য আছে কি না সে-প্রশ্ন সাধারণতঃ কারো মনে উদয় হতো না। কিন্তু তাঁর পরলোক গমনের পরে কোরআনের কোনো কোনো বাণীর ভিতরে যে আপাত-বিরোধ আছে তার দিকে মুসলমান চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, সব কিছুর উপরে সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহর ; নিশ্চয় আল্লাহ্ বিপথে চালিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন আর তাঁর নিজের দিকে চালিত করেন তাদের যারা তাঁর দিকে ফেরে ; যে কেউ পাপ করে সে তা করে তার নিজের বিরুদ্ধে—যে কেউ ঠিক পথে চলে সে ঠিক পথে চলে তার অন্তরাত্মার, ভালোর জন্য—ইত্যাদি। এই সব কথার অর্থ ভাবতে গিয়ে মুসলমান চিন্তাশীলদের মধ্যে মোটামুটি দুই দল দাঁড়িয়ে গেল—এক দলের ধারণা হলো ঃ কোরআনের মতে মানুষের স্বাধীন কর্তৃত্ব বলে' কিছু নেই, মানুষের জীবনের ভাল-মন্দ তার ইহকাল-পরকাল, সবই নিয়ন্ত্রিত হয় আল্লাহ্র ইচ্ছার দ্বারা ; অন্য দলের সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো ঃ না তা নয়, মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, সে ভাল কাজ করবে কি মন্দ কাজ করবে তার মীমাংসা করবার ক্ষমতা তার আছে।

বলা বাহুল্য এসব মানুষের সামনে চিরকালের প্রশ্ন, এবং আজো এসব প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি। কিন্তু মুসলমানদের জগতে এসব প্রশ্ন বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করলো তাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও জন্য। আমরা দেখেছি উমাইয়া-বংশ ক্ষমতায় আসীন হলো চক্রান্ত ও বাহুবলের

দ্বারা। তারা অনেকেই ইসলামের অনুবর্তী ছিল না, বরং ছিল প্রাচীন আরব জীবনধারার অনুবর্তী, আর সেই সঙ্গে প্রাচীন আরবের নিয়তি-বাদেরও। কিন্তু এই সময়ে মুসলমানদের নানা জাতির চিন্তার সঙ্গে, বিশেষ করে' গ্রীকদের চিন্তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, আর তার ফলে যেসব মুসলমান চিন্তাশীলের সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়েছিল যে মানুষ তার জীবনের সুপরিণতি বা কুপরিণতির জন্য নিজেই দায়ী তাদের দল সম্প্রসারিত হচ্ছিল। কিন্তু এই মতের সম্প্রসারণ সেই দিনের রাজশক্তির স্বার্থের বিরোধী ছিল। রাজার যেমন কারো কাছে জবাবদিহি করবার নেই তেমনি বিশ্বজগতের রাজারও কারো কাছে জবাবদিহি করবার নেই—এই ধরনের মত সেই দিনে স্বতঃই শাসকদের সমাদর পাচ্ছিল।

নিয়তিবাদ অন্য কারণেও বল সঞ্চয় করে চলেছিল ঃ উমাইয়া-বংশের প্রাধান্য-লাভ ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক অনিশ্চয়তা দেখে—উমাইয়াদের পরেও সেই ধারা চলে—স্বভাবতঃ মানুষের মন পুরুষকারে বিশ্বাস হারাচ্ছিল আর নিয়তি-বাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। তেমনি ঝুঁকে পড়েই যেন কিছু শান্তি ও সান্ত্বনা পাচ্ছিল। এমন রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সুফীদের বৈরাগ্যবাদের যোগও বোঝা যায় সহজে।

কিন্তু শুধু দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা নয়, নানা জাতির নানা পণ্যদ্রব্য, বিচিত্র নির্মাণ-কৌশল, বিজ্ঞান, ইত্যাদির সঙ্গেও মুসলমানরা দিন দিন বেশি করে পরিচিত হতে লাগলো, আর তার ফলে তাদের মধ্যেও নানা ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবন-কৌশল সক্রিয় হলো। এসবও তাদের ভিতরকার উদার জীবন-বর্ধক ভাবনা সম্প্রসারিত করে চললো। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং নতুন নতুন নির্মাণ-কৌশল যে এমন ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিল এর প্রভাব জগতের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইয়োরাপ তখন বিদ্যাচর্চা ও চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে ছিল অতি অনুন্নত। জ্ঞানের ও নব-সৃষ্টির আলোক-বর্তিকা সেদিন জগতে তুলে ধরবার ভার পড়েছিল মুসলমানদেরই উপরে। ইয়োরোপ যে তার মধ্যযুগের অজ্ঞানঅন্ধকার কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল

মুসলমানদের জ্বালা উজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে সেকথা অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত অকুণ্ঠিতকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। মুসলমানদের প্রভাব যে এমন ভাবে জগতে ছড়িয়ে পড়ছিল এটি তাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বৈরাচারের কুফল কিছু পরিমাণে কাটাতে পারছিল। তবে স্বৈরাচারী শাসকদের সমর্থন পেয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে বিচার ও প্রগতি-বিরোধী চিন্তা সমাজের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক হয়েই চলেছিল। বিচার-বুদ্ধির মর্যাদা হযরতের চোখে যথেষ্ট ছিল, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি; কিন্তু কালে কালে মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞরা সেই বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত করে আনলেন।

বিপর্যয়

শেষে মুসলমান-জগতের উপরে প্রায় একই অঙ্গে আপতিত হলো দুইটি বিপর্যয়ঃ একটি ইয়োরোপীয় ধর্মান্ধ ক্রুজেডারদের বিরামহীন আক্রমণ, অন্যটি, মোঙ্গোল হালাকুর দ্বারা আনীত ব্যাপক ধ্বংস-বন্যা। বাইরের এই দুই ধ্বংস-বন্যা আর ভিতরের বিচার ও প্রগতি-বিরোধী চিন্তা মুসলমান-জগতকে কালে কালে করে' তুললো মুখ্যতঃ উদ্যমহীন, আচার-অনুষ্ঠান-পরায়ণ, আর বিচার-বিরোধী। অতীতে অনেক বিখ্যাত দেশের ও জাতির জীবনে নানা কারণে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী মুসলমানদের উপরেও তেমনি অনেকগুলো কারণে বিপর্যয় নেমে এলো।

এই বিপর্যয়ের রূপ অনেক পণ্ডিত এঁকেছেন। কিন্তু শুধু দক্ষতার সঙ্গে নয়, বেদনার সঙ্গে এর রূপ এঁকেছেন সৈয়দ আমীর আলী, বিশেষ করে' তাঁর The Spirit of Islam গ্রন্থে। পাণ্ডিত্য ও বেদনার এমন সংযোগ শুভ হয়েছে—পাণ্ডিত্য তাঁকে দিয়েছে ব্যাধির জটিলতার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি, আর বেদনা তাঁকে দিয়েছে সেই ব্যাধির অবসান ঘটাবার জন্য উদ্যম। শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা এই কাজটি হতে পারতো না।

বিপর্যয়ের পরে নবসৃষ্টি

সৈয়দ আমীর আলী অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতা পুরোপুরি চোখ চেয়ে দেখতে চান নি। অকরুণ সমালোচনার আধিক্য তাঁকে স্বভাবতই কিছু বিব্রত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অবিচলিত সত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পেরেছেন মুসলমানদের বিপর্যয় ও পতনের মুখ্য কারণের উপরে। সেই কারণটি ঃ বিচার-বুদ্ধিতে ও ব্যাপক-মনুষ্যত্ব-সাধনায় তাদের অবিশ্বাস. আর তার পরিবর্তে সংকীর্ণদৃষ্টি ও প্রধানত আচরধর্মী হয়ে চলতে তাদের প্রবণতা।

এরই প্রচলিত নাম নিয়তির আনুগত্য স্বীকার আর পুরুষকারের প্রতি বিমুখতা। প্রগতি-বিমুখ আর পিছিয়ে-পড়া জাতির বা সমাজের সর্বকালের এই সাধারণ পরিচয়।

বিচার-বুদ্ধি বনাম অনুবর্তিতা

অবশ্য এত বড় একটা জটিল বিষয়ের এমন একটা মীমাংসা মনে হতে পারে অতি সহজ, আর সেইজন্য অবিশ্বাস্য। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় ব্যাপারটা তা নয়।

মানুষের দুর্গতির নানা রূপ—নানা ধরনের অভাবে অভিযোগে আর মূঢ়তায় ও গ্লানিতে সেই দুর্গতির পরিচয় পরিব্যাপ্ত দেখতে পাওয়া যায়, মিথ্যা নয়। কিন্তু আসলে মানুষের ব্যাধি হচ্ছে মানুষরূপে তার যে মুখ্য অবলম্বন—বিচার-বুদ্ধি—তার নিষ্ক্রিয়তা। এই নিষ্ক্রিয়তা থেকেই নিয়তি-পরবশতা, আচার-পরায়ণতা, লক্ষ্যহীনতা, ইত্যাদি। আর এই বিচার-বুদ্ধির আনুগত্য থেকেই মানুষের সবল কৌতূহলের সক্রিয়তা, মানুষের নব নব উদ্যম, অনন্ত-কল্যাণ-স্বরূপ বিশ্ববিধাতায়, অথবা অশেষ কল্যাণের উৎস বিশ্ববিধানে, তার আস্থা,—ইত্যাদি।

এই সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে একালের মুসলমানদের জন্য তাদের লক্ষ্যের সন্ধান অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ে—তবে, মুসলমানের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে, বিশেষ করে' অতীতে মুসলমান ভাবুকরা শ্রেয়ের

পন্থা হিসাবে যেসব উল্লেখযোগ্য পথ বেছে নিয়েছিলেন সেসব সম্বন্ধে, পণ্ডিতদের মতো শুধু কৌতূহল বোধ নয়, সেসবের মূল্য সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা তাদের জন্য অবশ্যকরণীয় হয়ে দাঁড়ায়,—কেন না সেসব চিন্তা আজো পুরোপুরি অকার্যকর হয়নি তাদের মধ্যে। বিচার-বুদ্ধি আজো যেখানে যতটা কার্যকর আছে তাকে আরো সক্রিয় করাই প্রথম কাজ।

তেমন পুনর্বিবেচনা আরম্ভ করা যাক। তিনটি বড় চিন্তাধারার কথা ভাবা যাক: মোতাযেলাদের বিচার-প্রীতি, বিধি-নিষেধ-বাদীদের একান্ত-শাস্ত্রানুগত্য, আর ইমাম গায্যালির অন্তর্জ্যোতিবাদ। একান্ত-শাস্ত্রানুগত্যবাদীদের সিদ্ধান্তের মূলে প্রধানত ছিল—এখনো পুরোপুরি আছে—এই চিন্তা যে ধর্মের পথ জটিল ও দুর্বোধ্য, তাই ধর্মস্থাপয়িতা মহাপুরুষের আচরণের আনুগত্যই নির্ভরযোগ্য উপায়। কিন্তু তাঁদের চিন্তার গোড়ায় রয়েছে এই মস্ত গলদ যে, মানুষের জন্য সহজ পথ বলে' প্রকৃতই কিছু নেই—একালের বাধিত ভূয়োদর্শনের ফলে একথা আমরা অপেক্ষাকৃত সহজভাবে বলতে পারি। কাজেই মানুষকে সহজ পথের কথা বলার অর্থ তাকে বিভ্রান্ত করা মাত্র, কেন না, তার অন্তরাত্মা যদি বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আলোকিত না হয় ও সেই বিচার-বুদ্ধি তার ভিতরে যদি স্বাধীন কর্মশক্তির উদ্রেক না করে, তবে মানুষরূপে তার ব্যর্থতা ঘটে। একটি খুব পরিচিত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়: পশুকে ও পাখীকে নানা রকমের আচরণ ও বুলি শেখানো যায়, কিন্তু তাদের পশুত্বের ও পাখীত্বের কোনো উৎকর্ষই কি তাতে ঘটে? কোরআনের মতে মানুষের আদিপিতা আদম ফেরেশতাদের—দেবদূতদের—চাইতে উচ্চতর-মর্যাদা-সম্পন্ন হলেন কেন না আদমে দেখা দিল বিচার-বুদ্ধি, জ্ঞান, আর ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল শুধু আজ্ঞানুবর্তিতা বা নিয়মানুবর্তিতা।

এক শ্রেণীর শাস্ত্রানুগত্যবাদীরা বলে থাকেন: শাস্ত্রানুগত্যের অর্থ নিশ্চয়ই অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য নয়, আনুগত্যের সঙ্গে বুদ্ধি-বিবেচনার যোগ থাকা চাই বৈ কি, মানুষের কাজের সঙ্গে বুদ্ধি-বিবেচনার যোগ তো থাকবেই।—কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: শাস্ত্রানুগত্য-বাদে জোর কিসের উপরে

ভুলের সম্ভাবনা থাকবে না, তবে সে তাকে যে পথের উপরে দাঁড় করাবে তা কোনো মহৎ-সার্থকতার-অভিসারী পথ নয়, তা বিচারহীন আচার-অনুষ্ঠানেরই পথ, বা শুধু ঘুরপাক খাওয়ার একটি অন্ধ গলি। সুফী-পন্থা অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষকে আনন্দ দিয়েছে, সার্থকতা দিযেছে—আমরা জানি ; কিন্তু সেই পন্থা যে অনেককে অন্ধ গুরুভক্তিতে আর অন্ধ আচার-অনুষ্ঠানেও নিয়ে গেছে, তাও আমরা কম জানি না।

এতকালের ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা নিশ্চয়ই মানুষের হয়েছে যে জীবনের সার্থকতার পথ বিচিত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে এই শিক্ষাও তাদের হয়েছে যে বিচার-বুদ্ধিকে সবলভাবে সক্রিয় না রেখে সেই পথে চলতে চাইলে অনর্থ ভিন্ন আর কিছু তাদের লভ্য হবার নয়। স্রোতহীন বদ্ধ-জলার যা দশা বিচার-বুদ্ধিবিহীন আচার-অনুষ্ঠান-পরায়ণ জীবনেরও সেই দশা। শ্রেষ্ঠ সুফীদের জীবনেও বিচার-ক্ষমতা আদৌ কম লক্ষণীয় নয়।

মোতাযেলাদের চিন্তা

এইবার সেই বড় প্রশ্নটির সম্মুখীন হওয়া যাক : যুক্তি-বিচারের উপরে জোর দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোরআনের অনুবর্তিতার চাইতে যুক্তি-বিচারের অনুবর্তিতারই উপরে জোর পড়বে কি না। —প্রাচীন মুসলমান চিন্তাশীলদের মধ্যে মোতাযেলারা বলেছিলেন : ধর্মশাস্ত্রের বাণীর সুসংগত হওয়া চাই যুক্তি-বিচারের সঙ্গে। অন্য কথায়, তাঁদের মতে ধর্মশাস্ত্রের বাণী সার্থক হয় যদি তা মানুষের জন্য যুক্তিযুক্ত পথের নির্দেশ দেয়। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে কোরআনের বাণীর চাইতে যুক্তি-বিচারকে তাঁরা বেশি মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁরা সমাজ-জীবনকে দুই-ভাগে ভাগ করে দেখেছিলেন : সর্ব-সাধারণের জীবন, আর সুশিক্ষিতদের জীবন। সর্ব-সাধারণের জীবনের জন্য কোরআনের বাণীর বিশেষ কার্য-কারিতা তাঁরা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু উচ্চশিক্ষিতদের জন্য তাঁরা বিশেষ মূল্য দিয়েছিলেন দর্শনচর্চার, অর্থাৎ যুক্তি-বিচারের চর্চার। স্পেনীয় দার্শনিক ইবনে রুশ্‌দ-এর চিন্তা এই ধরনের ছিল কোনো কোনো পণ্ডিত এই মত দিয়েছেন।

একালের চিন্তা

কিন্তু একালে আমরা জানি, সমাজ-জীবনে উচ্চ ও নীচের অথবা শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান থাকলেও একালের চিন্তাশীলেরা সে-ব্যবধানকে অনতিক্রম্য বা কাম্য জ্ঞান করেন না। জন-জীবন তাঁদের জন্য আদৌ অবজ্ঞার ব্যাপার নয়। বরং সমাজের শ্রেষ্ঠদের চিন্তা নিয়োজিত হওয়া চাই জন-জীবনের উৎকর্ষ বিধানে—এই তাঁদের প্রধান চিন্তা। একালে তাই মুখ্য কাম্য ঃ সমাজ-জীবন ব্যাপক ভাবে উদার জ্ঞানবিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে, আর উদার-জ্ঞানবিজ্ঞান-অভিসারী হবে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মের যে যোগ আছে একালের এক শ্রেণীর চিন্তাশীলরা তা স্বীকার করেন না, বরং তাঁরা ধর্মকে মানুষের ইতিহাসের একটি বিশেষ স্তরের ব্যাপার বলেই জানেন। কিন্তু অন্যদের মত তা নয়। তাঁরা ধর্মকে মানুষের জীবনে অত্যাজ্য জানেন। তবে ধর্ম বলতে তাঁরা কি বোঝেন তা বুঝে দেখবার আছে।

বলা যায়, ধর্ম বলতে তাঁরা মুখ্যত ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন বোঝেন না, অন্ততঃ ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালনের উপরে তাঁরা ততটা জোর দেন না, যতটা জোর দেন ধর্ম-ভাবের উপরে—অন্য কথায়, ধর্মভাব বলতে যে আদর্শের আনুগত্য বোঝায়, যেমন সত্যে, কল্যাণে, অথবা কল্যাণ-বিধাতায় বা আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ, তাঁরা বিশেষ জোর দেন তার উপরে। বলা বাহুল্য, ধর্ম-শাস্ত্রেও এমন আনুগত্যের নির্দেশ বা ইঙ্গিত আছে। কিন্তু কালে কালে ধর্ম-পালন বলতে ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন বেশি করে বোঝা হয়েছে। এর কারণও রয়েছে। সেকালে ধর্ম-ব্যবস্থার লক্ষ্য শুধু আদর্শ-পালন ছিল না। ধর্ম বলতে সামাজিক রীতি-নীতি পালনও বোঝা হতো, বরং সেইটি বোঝা হতো বেশি করে' তার কারণ, সমাজশৃঙ্খলা পালন সর্বযুগেই মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য বলে' বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু একালে জীবন-ব্যবস্থা নানা ভাগে ভাগ ক'রে দেখা হয়। যেমন, আত্মরক্ষার দিক, শাসন-

শৃঙ্খলার দিক, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক, আর আদর্শের আনুগত্যের দিক। ইসলামের প্রাথমিক যুগে দেখা যায় যিনি নামাযে নেতৃত্ব করতেন তিনি সেনাপতিও হতেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু বর্তমানে এমন ব্যবস্থার কথা ভাবা যায় না, কেন না কালে কালে যুদ্ধ এক ব্যাপক-শিক্ষাসাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেমনি রাজনীতি আর সমাজ-শৃঙ্খলার দিকও—সেখানেও বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। কাজেই ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন সেকালে ব্যাপক জীবন-ক্ষেত্রে যেমন অর্থপূর্ণ ছিল একালে তেমন অর্থপূর্ণ নয়। একালে সামাজিক অনুষ্ঠান হিসাবেই ধর্মানুষ্ঠান কখনো কখনো খুব অর্থপূর্ণ হয়, যেমন মুসলমানদের ঈদের উৎসবে, অথবা হজব্রত পালনে। কিন্তু ধর্ম-ভাব বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ আদর্শের বা শ্রেষ্ঠ চিন্তার একান্ত আনুগত্য, তার প্রয়োজন আজো সব সময়ে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে, কেন না, তেমন আনুগত্যের অভাবে মানুষ দায়িত্বশীল ও সৃষ্টিধর্মী মানুষ হতে পারে না।

ধর্মের যে মূল কথা—আদর্শের বা শ্রেষ্ঠ চিন্তার আনুগত্য—তারই উপরে একালে যে বেশি জোর পড়েছে, তার ফলে কোরআন আবৃত্তির চাইতে কোরআনের ভাব উপলব্ধি, তা মূল আরবী বুঝে হোক বা তার অনুবাদের সাহায্যে হোক, সহজেই একালে বেশি মর্যাদা পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কোরআন তার ভাষা সমেত একটি "সৃষ্ট পদার্থ", না, "অসৃষ্ট ও চিরন্তন", সেকালের এই তর্ক একালে আমাদের জন্য তার আবেদন অনেক পরিমাণে হারিয়েছে--একালে কোরআন বলতে কোরআনের ভাব, শিক্ষা, এসবের উপরে যে আমরা বেশি জোর দিই তা অনস্বীকার্য। বহুদিন পূর্বেই অবশ্য মুসলমান চিন্তাশীলরা একথা বুঝেছিলেন, নইলে স্বনামধন্য কবি রুমি একথা বলতে পারতেন না:

আমি কোরআন্ থেকে তার মজ্জা বার করে নিয়েছি।
আর হাড়গুলো সংসারের কুকুরদের সামনে ফেলে দিয়েছি।

কোরআন বলতে যদি বোঝা হয় কোরআনের মজ্জা, তবে তার ইঙ্গিত অনেক দূর যায়—তাহলে কোরআন বলতে বুঝতে হয় উদার জ্ঞান ও

মনুষ্যত্ব-সাধনই। বলা যায়, প্রাচীনেরা যাকে আল্লাহ্‌র মরমী উপলব্ধি বলতেন তার বাহ্যরূপ সেইটিই।—এক সময়ে আমি আমার এক পুরাতন বন্ধুকে এই সমীকরণটি উপহার দিয়েছিলাম ঃ

নামায = কোরআন-পাঠ

কোরআন-পাঠ = জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব-সাধন

∴ জ্ঞান ও মানুষ্যত্ব-সাধন = নামায।

কিন্তু বন্ধু আমার এই সমীকরণটি খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি নামায বলতে বোঝেন জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব-সাধনের অরিরিক্ত আরো কিছু—অর্থাৎ নামাযের আনুষ্ঠানিক দিকেব বিশেষ অর্থ আছে এই তাঁর বক্তব্য। নামাযের আনুষ্ঠানিক দিকটাকে আমিও যে মূল্যহীন জ্ঞান করি তা নয়, তবে এই সমীকরণটিতে আমি এই কথার উপরে জোর দিতে চেয়েছিলাম যে, নামায—আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ নতি—সার্থক হয় যদি তা জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব-সাধনের সহায় হয়, নইলে তা আচার-পালনের চাইতে বেশি কিছু নয়।

মুখ্য ও গৌণের বিচার

তাহলে আমাদের নিবেদন ঃ একালে ধর্ম বলতে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সাধনই মুখ্যভাবে বুঝতে হবে—ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের দিক তার তুলনায় গৌণ। —জীবনে কোন্‌টি মুখ্য কোন্‌টি গৌণ এই বিচার আমাদের মধ্যে যেন কখনো শিথিল না হয়, বিশেষ করে' একালের জটিল জীবনায়োজনের দিনে।

কাজেই সেই যে বড় প্রশ্নটি তোলা হয়েছিল ঃ যুক্তি-বিচারের উপরে জোর দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোরআনের অনুবর্তিতার চাইতে যুক্তি বিচারের অনুবর্তিতাই প্রতিষ্ঠিত হবে—এর মীমাংসা এই ঃ যুক্তি-বিচারের অনুবর্তিতা ও কোরআনের অনুবর্তিতা এই দুইটি পৃথক করে দেখা অসঙ্গত ; কোরআনের অনুবর্তিতার সত্যকার অর্থ যুক্তি-বিচারেরই অনুবর্তিতা, যেখানে যুক্তি-বিচারের নির্দেশ ক্ষুণ্ণ হয় সেখানে কোরআনের নির্দেশও প্রকৃতই ক্ষুণ্ণ হয়।

নব নব শুভ প্রেরণা লাভ

মানুষের এই সৌভাগ্য হয়েছে যে সে চিরকাল তার অন্তরে নব নব শুভ প্রেরণা লাভ করে চলেছে। সেইসব শুভ প্রেরণারই পরিচয় মানুষের বিজ্ঞানে, দর্শনে, ধর্মে, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে। মানুষের অন্তরাত্মার অর্থ-পূর্ণ বিকাশ সূচিত হয় সেসবে—তেমন বিকাশ যদি সূচিত না হয় তবে সে-সবই হয় অর্থহীন। সেই অন্তহীন শুভ প্রেরণার ধারা থেকে মানুষ কখনো বঞ্চিত না হোক, আচার-অনুষ্ঠানের অথবা সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর দেওয়াল তার এই শুভ প্রেরণা লাভের পথে কখনো বাধা রচনা না করুক—এই তার জন্য মহত্তম কাম্য—মানুষের জন্য ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এইটি, বিশেষ করে একালে যখন জগৎ ছোট হয়ে পড়েছে আর জগৎব্যাপী সম-ঝোতার প্রয়োজন দিন দিন বেশী করে অনুভূত হচ্ছে।—মানুষের এই অন্তহীন শুভ প্রেরণা লাভ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটী গাছ (দিয়ে তৈরি) হ'ত কলম, আর সমুদ্র, তাকে সাহায্য করতে আর সাত সমুদ্র (হ'ত কালি), (তবু) আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষিত হতো না।

সমাপ্ত

নির্দেশিকা

(সংক্ষিপ্ত)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯	১৮	ওযর	ওমর
২২	১০	বস্তাবৃত	বস্ত্রাবৃত
২৫	২৫	কদ্দুদ	কদ্দুস
৩১	৩	মৃত্যুকেই	মৃত্যুতেই
৩৭	৫	হযরত	হয়ত
৪৮	৩০	বিফল	বিনষ্ট
৬৩	৬	কেরেশতা	ফেরেশতা
২১৪	২৬	সিম্মান	সিম্মা